ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্

মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা

অনুবাদ

শরীফ আবদুল্লাহ্ হারুন
অধ্যাপক গোলাম রসূল

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা ঃ ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ; অনুবাদে শরীফ আবদুল্লাহ হারুন ও অধ্যাপক গোলাম রসূল ; ই.ফা. প্রকাশনা ঃ ৯৯৩ ; ই. ফা. গ্রন্থাগার ১. রাষ্ট্র-সরকার-ইতিহাস ২. ইসলাম ও রাষ্ট্র ৩৫৩·৯০৯ ; প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ১৯৮১ ; কার্তিক, ১৩৮৮ ; মুহররম, ১৪০১ ; প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ ; প্রচ্ছদ অংকনে ঃ মামুন কায়সার চৌধুরী ; মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ ; দাম ঃ ৪০·০০ টাকা

MUSLIM RASHTRA PARICHALAN BABASTHA : The Muslim Conduct of State, written by Dr. Muhammad Hamidullah in English, translated by Sharif Abdullah Harun and Professor Gholam Rasul into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah. November, 1981

Price : Tk. **40.00** ; U.S. Dollar 5.00

প্রকাশকের কথা

আমরা দীর্ঘকাল যাবত এরূপ একখানা পুস্তকের অভাব অনুভব করেছিলাম। ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কয়েকখানা পুস্তক ও পুস্তিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সব নীতিকে ফলিত রূপ দেওয়ার কোন প্রামাণ্য নির্দেশ ইতিপুর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। এজন্য আমরা ডঃ হামিদুল্লাহর সুবিখ্যাত পুস্তক The Muslim Conduct of State-কে বাংলাতে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছি। এতে বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণ ইসলামী নীতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে বলে আমাদের ধারণা। বইখানা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের দীর্ঘকালের অভাব পূরণে সফল হলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

ভূমিকা

এ দুনিয়ায় ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল মানব জীবনে এক অভিনব বিপ্লব সাধনের জন্যে। মানুষকে পূর্বতন নানাবিধ সংস্কারের কবল থেকে মুক্ত করে, তারই স্বাভাবিক রূপের পরিচয় প্রদান করে, তাকে এমন এক ভাবধারায় ইসলাম অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল, যাতে মানুষ কেবল পুঁথিগতভাবে নয়—প্রকৃত অর্থেই আশরাফুল্ মাখলুকাত বলে দাবী করতে পারে।

এ অপূর্ব বিপ্লব মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যত হওয়ায় বহু-যুগ-পোষিত সংস্কারের উপাসকগণ নানাভাবে তার প্রতিকূলতায় অগ্রসর হন। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র ছিল—তাদের ভিন্নমুখী মতবাদগুলোকে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করা। তাতে তারা সফল হয়েছেন এবং তথাকথিত মুসলিমেরাই ইসলামী রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন।

মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র—হযরত রসূল-ই-আকরাম (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে খুলাফা-ই-রাশেদীনের জীবনকাল পর্যন্ত সে রাষ্ট্র নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও টিকে রয়েছিল, উমাইয়াদের অধিকার বিস্তারের সূচনা থেকে, সে রাষ্ট্র থেকে ইসলামী ভাবধারা ক্রমেই অন্তর্হিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম-মানসে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার রূপায়ণের আদর্শ শিথিল হতে থাকে—তবুও বাহুবলের দ্বারা মুসলিমেরা নানা দেশ জয় করে তাতে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে বলে মুসলিম-মানসে ইসলামী সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার নীতি গ্রহণ করা হয়নি। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর থেকে, মুসলমানদের বাহুবলের উপর তাদের আস্থা হারানোর ফলে—ক্রমেই মুসলিম-জীবনে অপরাপর জাতির জীবন

ব্যবস্থা উন্নততর বলে মনে হয়। যদিও এ দুর্ঘটনার পরেও মুসলিমেরা উসমানী তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে, তবুও মুসলিমদের বাহুবলের প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধা ছিল সেরূপ শ্রদ্ধা আর অটুট থাকেনি।

এ সব বিজয়ের ফলে মুসলিমেরা নানা দেশের ধন-দওলতে সমৃদ্ধ হয়েছিল সত্য, তবে নানা দেশের ভাবধারাও তাদের মানসে সংক্রমিত হয়ে তাদের ক্রমেই ইসলাম বিমুখ করে তুলেছিল।

একে একে সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের পতন হওয়ার পরেও তুর্কীদের সাম্রাজ্য অবশিষ্ট থাকায় তুর্কীরা মুসলিমদের কাছে আশার আলোকরূপে বিরাজিত ছিল। প্রথম মহাসমরে তুর্কী সুলতানের রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় মুসলিমদের আশার আলোক নির্বাপিত হয়ে যায়। এ বিশ্বে যে পুনরায় মুসলিমেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে—এ আশার কণামাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না।

ইউরোপের বিভিন্ন জাতি কর্তৃক একে একে মুসলিম দেশগুলো পদানত হওয়ায় সে সব দেশে প্রচলিত নানাবিধ চিন্তাধারা মুসলিম জীবনে প্রবেশ করে। ইউরোপ থেকে আগত প্রজাতন্ত্র, পুঁজিবাদ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ধারণার আলোকে জীবনের পুনর্গঠন করতে মুসলিমেরা ক্রমেই অভ্যস্ত হতে থাকে। এগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে তাদের মানসে কোন প্রশ্নই দেখা দেয়নি।

প্রথম মহাসমরের পরিণতিতে একই গণতন্ত্রের প্রজাতন্ত্রের ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ জাতিগুলোর শোচনীয় পরিণতির ফলে মুসলিম মানসে প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের প্রতি কোন আস্থা থাকেনি। ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমেরাও বুঝতে পারে, যাকে ইউরোপবাসী দেবতার আসনে বসিয়েছিল, তা'তেও মানব-জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান হয় না। কাজেই অন্য কোন রাষ্ট্রনীতির অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিপূর্বে আগ্রাসন-লোভী ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক ইসলামের অর্থনীতি ও রাজনীতিসংক্রান্ত পুঁথি-পুস্তকগুলো অন্ধকারে কোণঠাসা হয়ে রক্ষিত হলেও অনুসন্ধানী মুসলিমেরা তাদের উদ্ধার করার পরে তা থেকে ছিটেফোঁটার মত ইসলামের অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে গুটিকয়েক পুস্তিকা রচিত হলেও ইসলামী পরিবেশে তাদের স্থান ছিল না। ইউরোপের আবহাওয়ায় জাত ও বর্ধিত গণতন্ত্রের ব্যর্থতার ফলে

এ জগতের মানুষের জীবন আহবে টিকে থাকার জন্য ছিল দু'টো বিকল্প। একটা সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ, অপরটা সুবিখ্যাত কবি টি. এস. এলিয়টের নির্দেশমত প্রত্যেক জাতিকে তার ঐতিহ্যের অনুসরণ। প্রথম বিকল্প রাশিয়ার লোকেরা গ্রহণ করেছে এবং তাদের অনুসরণ করছে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জাতি। তবে কোন মুসলিম দেশ এখনও মনেপ্রাণে সমাজতন্ত্রবাদে প্রত্যয়শীল হয়নি। প্রথমদিকে অন্যান্য নানা জাতির মত তারাও দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। তবে ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্র অধ্যুষিত দেশগুলোতে নানাবিধ অনাচার-অবিচার দেখা দেওয়ায় মুসলিমেরা আবার ইসলামী জীবনধারার মধ্যে মানব জীবনের পূর্ণভাবে বিকাশের নীতির সন্ধান পাচ্ছে।

তবে দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিম জীবন থেকে ইসলামী অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির আলোচনা না হওয়ায়, মুসলিম জীবনে তারা অজ্ঞাতই ছিল। সম্প্রতি তাদের পুনরায় আবিষ্কারের ফলে, মুসলিমেরা তাদের পূর্ণাঙ্গতা সম্বন্ধে ক্রমেই প্রত্যয়শীল হচ্ছে। তবে ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আকারে লিখিত পুস্তকাদি না থাকায় মুসলিমদের এ পুনর্জাগরণের যুগে সে অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হচ্ছিল। অত্যন্ত সুখের বিষয়, অর্থনীতি[১] ও রাষ্ট্রনীতি[২] সম্বন্ধে ইতিপূর্বে দু'খানা পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় মুসলিম জীবনের সে অভাব দূরীভূত হয়েছে। তবে সে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিকে কিভাবে ফলিত রূপ দেওয়া যায়, তার জন্য একখানা নির্ভরযোগ্য পুস্তকের প্রয়োজন ছিল।

আলোচ্য পুস্তকখানাকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার এক ব্লু প্রিন্ট বলা যায়। এ খানাকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকরূপে গণ্য করা যায়। ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ডঃ হামিদুল্লাহর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক The Muslim Conduct of State-এর তরজমা করিয়ে নিয়ে মুসলিম সমাজের এক দীর্ঘকালের অভাব পূরণ করেছেন। এতে যে বক্তব্য রয়েছে, পরবর্তীকালে তার ভিত্তিতে আরও গবেষণার সুযোগ হবে বলে আমাদের ধারণা।

মোহাম্মদ আজরফ

---

১. ডঃ হাসান জামান, ইসলামী অর্থনীতি।

২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি

(১) সঠিকভাবে বলা হয়েছে যে ঃ

নগর রাষ্ট্র অথবা আধুনিক মানের রাষ্ট্রই হোক, যদি বিভিন্ন স্থিতিশীল সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে তাহলে প্রথাসমূহ কালের প্রবাহে আইনে রূপান্তরিত হয়ে এদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে কখনো ব্যর্থ হয় না। Ubi societas, ibi jus. যেখানেই উন্নত সম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে আসবে সেখানেই আইনগত সম্পর্ক কেবল লিখিত বা অলিখিত চুক্তির মাধ্যমেই নয় বরং বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠতে বাধ্য এবং আংশিকভাবে সে সব কারণেও যা আভ্যন্তরীণভাবে রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয়।[১]

(২) অন্য কথায়, আন্তর্জাতিক আইন বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুনকে বুঝায়। এ স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র একটি আন্তর্জাতিক আইন প্রণালী থাকতে হবে তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক আইন একই সঙ্গে বলবৎ ছিল। এমন কি আধুনিক, তথাকথিত ইউরোপীয়, আন্তর্জাতিক আইনও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের সংকলন নয়।

(৩) ইসলাম তার নিজস্ব সর্বজাতীয় (public) আন্তর্জাতিক আইন গড়ে তুলেছে। এর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বলতে কি বুঝানো হয়েছে এর একটি সংজ্ঞা

নির্ণয় করা সমীচীন হবে। লক্ষ্যণীয় যে, এ পুস্তকের সর্বত্র 'মুসলিম আইন', 'ইসলামী আইন' এবং 'ফিকাহ'কে আমি একই অর্থে ব্যবহার করেছি।

(৪) মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা এভাবে নির্ণয় করা যেতে পারেঃ দেশের আইন ও প্রথার বিশেষ অংশাবলী এবং সন্ধি-বাধ্যবাধকতা যা একটি বাস্তব (de facto) অথবা বৈধ (de jure) মুসলিম রাষ্ট্র অপর বাস্তব অথবা বৈধ রাষ্ট্রসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে পালন করে।

(৫) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা বলা, আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(৬) আমরা এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি যে একটি মুসলিম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনরূপে যা গ্রহণ করে তা-ই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন। প্রারম্ভেই একথা মনে রাখা উচিত মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সর্বতো ও একান্তভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন—পক্ষান্তরে মুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম আইন অর্থাৎ "শরীয়া" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেশের অন্য যে কোন মুসলিম আইনের ন্যায় মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের বৈধতা একইভাবে অর্জিত হয়। এমন কি দ্বিপাক্ষিক অথবা বহু দলভিত্তিক (আন্তর্জাতিক) চুক্তি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতার বেলায়ও এক নীতি প্রযোজ্য। যদি এ সকল সন্ধি-বাধ্যবাধকতা চুক্তি-বদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত এবং কার্যকরী না হয় সেক্ষেত্রে এসব পালনীয় নয়; এবং এগুলো অমান্য করা হলে মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য কোনরূপ দায়িত্বের উদ্ভাবন হয় না। অবশ্য, অনুমোদন উহ্য কি স্পষ্ট তাতে কিছু আসে যায় না।[১] একথাও বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ মানব ইতিহাসে বিশ্বের সর্বরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক আইন-প্রণয়নের আদর্শ ক্ষণকালের জন্যও বাস্তবায়িত হয়নি।

(৭) যাহোক, সংজ্ঞা নির্ণয়ে আমরা একথা স্বীকার করেছি যে, কেবল দেশের আইন ও প্রথা নয়, এমন কি চুক্তি ও মুসলিম রাষ্ট্রের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। চুক্তি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব; কিন্তু আইন কী?

(৮) প্রাচীন মুসলিম আইনবেত্তাগণ বিভিন্নভাবে আইনের (ফিকাহ্) সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। "প্রজ্ঞা, যা নিজের প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি নিজের কর্তব্যের দিশারী"। আইনের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি আবু হানিফার[৩] নামে প্রচলিত, যা অন্য কথায় 'মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত হতে পারে। প্রাচীন আইনবিশারদ মুহিবুল্লাহ আলবিহারী তাঁর পুস্তকে (১১০৯ হিঃ সম্বলিত) নিম্নোক্ত ভাষায়[৪] এ বিষয়টির অবতারণা করেনঃ (আইন হচ্ছে) বিশদ 'দিশারী'র সহায়তায় ধর্মীয় বিধি-নিষেধ (ব্যবহারিক জীবন সংক্রান্ত) যাচাই করার বিজ্ঞান। ('দিশারী' দ্বারা তিনি প্রামাণিক তথ্য অথবা এর উৎস বুঝিয়েছেন।)

(৯) 'ফিকাহ্' শাস্ত্রের পুস্তকাবলীর সূচীপত্রের দিকে নজর দিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিষয় নির্বিশেষে মানব জীবনের সকল বিষয়ই 'ফিকাহ্'র অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত আদর্শ সংজ্ঞার আলোকে এবং 'ফিকাহ্' শাস্ত্রীয় পুস্তকাবলীর বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই যে, আন্তর্জাতিক আইন তথা যুদ্ধ, শান্তি ও নিরপেক্ষতাকালীন রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলী দেশের সাধারণ (ordinary) আইন অর্থাৎ 'ফিকাহ্'র অংশবিশেষ। রাষ্ট্র পরিচালনার এসব নিয়ম সাধারণত সিয়ার অর্থাৎ আচরণ শিরোনামায় আলোচিত হয়ে থাকে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

(১০) আইনের উৎস সম্পর্কে মুসলিম আইনবেত্তাদের মতের একটি সংক্ষিপ্ত ফলপ্রসূ ব্যাখ্যা এখানে সংযোজিত হতে পারে। তাঁরা[৫] বলেনঃ মানুষ সর্বদাই ভাল কাজ করবে, মন্দ থেকে বিরত থাকবে এবং মাকরূহ, মুবাহ ও মুসতাহাব প্রভৃতির পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করবে। কিন্তু ভাল-মন্দের পার্থক্য করা সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষতঃ যখন কোন বিষয় সাধারণ গণ্ডিবহির্ভূত জটিল সভ্য জীবনের সূক্ষ্মতার সাথে জড়িত থাকে। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আইনবেত্তা হিসেবে অথবা সমষ্টিগত পর্যায়ে রাষ্ট্র হিসেবে আইন প্রণয়ন (অথবা প্রত্যেক বিষয়ে

ভাল-মন্দের স্তর নির্ণয়) করার ক্ষমতার প্রয়োজন হয়েছে। তবুও, একমাত্র যুক্তিকে ভাল-মন্দের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। কেননা মুসলিম আইনবেত্তাগণ এ যুক্তির অবতারণা করে থাকেন যে, একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিভিন্ন মত পোষণ খুবই সম্ভব এবং তা বাস্তব সত্যও বটে। আইন শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়েও আল্লাহের নবীদের প্রতি বিশ্বাস অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু নবীদের প্রতি ভীতি ও শ্রদ্ধার দরুন কতিপয় মূলনীতি তর্কাতীতভাবে সহজেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং বাকী খুঁটিনাটির বিস্তার এর থেকেই সম্ভব। মুসলিম মনীষিগণ সেজন্য আল্লাহের অনুগ্রহের কাছে ধন্যবাদার্হ যে তিনি মানুষকে জীবন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় মানবকে মনোনীত করেছেন দিশারীরূপে। ভালমন্দ সম্পর্কে প্রকৃত সার্বভৌম ও আইনদাতা আল্লাহ কি আদেশ করেছেন এর স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করেন এ সকল মনোনীত দিশারী। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) মুসলমানদের নিকট আল্লাহের নবী হিসেবে স্বীকৃত। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রেরক অর্থাৎ আল্লাহের নামে যে সকল অহী ও অনুশাসন প্রদান করেছিলেন মুসলমানগণ তার সব কিছুই অকাট্য ও চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছিল। কুরআন এবং হাদীস হিসেবে পরিচিত এ সকল ঐশী নির্দেশ—যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব—প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন মুসলিম সমাজের সব প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে মানুষ এত বেশী হারে বৃদ্ধি পায় যে সব কিছুর স্পষ্ট নির্দেশ হাদীস ও সুন্নাহের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। উপরন্তু, নবীর ইন্তিকালের দরুন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'অহীর' মাধ্যমে আল্লাহের নির্দেশ পাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হত এবং 'ফিকাহ'র কাঠামো সমূলে বিনষ্ট হয়ে যেত যদি না মুসলিম আইনের মধ্যেই ব্যাখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ থাকতো। এ ব্যাপারে মুসলিম আইনবেত্তাদের প্রশংসা করতে হয় যে, এরা নবীর ইন্তিকালের পর ঐশী আইনের স্থিতিস্থাপকতার দিকটি লক্ষ্য করেই কেবল ক্ষান্ত হননি বরং এর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন। এককালে মুসলিম আইন একটি

পূর্ণাঙ্গ আইন ব্যবস্থায় পরিগণিত হয়। এমন কি আটলান্টিক হতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার কালেও ইহা মুসলিম নরপতিদের সকল প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়।

(১১) এভাবে আল্লাহের প্রত্যক্ষ আদেশ হতে মুসলিম আইনের উৎপত্তি, কিন্তু মুসলমানদের প্রয়োজনবোধে 'কিয়াস' ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐশী আদেশের ব্যাখ্যা ও বিস্তার করার ক্ষমতা মানুষের আছে। এভাবে দুটি প্রয়োজন সাধিত হয়; একাধারে যারা আইন পালন করবে তাদের মনে আইন সম্পর্কে ভীতি ও শ্রদ্ধাবোধ উদ্রেক করার মত পবিত্রতার ও অন্যদিকে কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রয়োজনের মোকাবিলা করার জন্য আইনগত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা।

(১২) প্রথমে আমরা দেশীয় আইনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞা দিয়েছি। অতএব, দেশীয় আইনের পরিধি আন্তর্জাতিক আইনের পরিধির চেয়ে বিস্তৃত; এবং দেশীয় আইনের অংশবিশেষ যা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে আমাদের আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই।

(১৩) আন্তর্জাতিক আইনে প্রথার অবদানের কথাও আমরা স্বীকার করেছি। কোন আইন ব্যবস্থাই প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিতে পারে না। যেকোন আইন ব্যবস্থার পক্ষে কতিপয় অনুমোদিত বিষয়ের খুঁটিনাটিসহ আদেশ নিষেধের তালিকা প্রস্তুত বৈ আর কিছু করার নেই। স্বাভাবিকভাবে, এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা, সাধারণ আচার ব্যবহার, এমন কি কোন নতুন বিষয়ক সমাবেশ কালের প্রবাহে প্রচলিত রীতিতে রূপান্তরিত হয়ে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলিম আইনের উৎস শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা এ ব্যাপারে আরো আলোচনা করব।

(১৪) দেশীয় আইন এবং প্রথা ছাড়াও দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের চুক্তি বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোর এ বিশেষ সংযোজনটির স্থায়িত্বকাল রাষ্ট্র-স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। কোন চুক্তির শর্তাবলী অবমাননাকর হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত

কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তা যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ঐতিহাসিক হুদাইবার সন্ধি এর নজীর।

(১৫) অধিকন্তু বৈধ (de jure) ও বাস্তব (de facto) রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, প্রথমত কখনো কখনো বিশেষ বৈধ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হয় না; তথাপি তা বাস্তব রাষ্ট্র। ক্ষেত্রবিশেষে, কোন রাষ্ট্রের বৈধ ও বাস্তব উভয়বিধ গুণাবলী একই সঙ্গে না থাকাটা অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এ পার্থক্যকরণের উদ্দেশ্যে একথা উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের আলোচনা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয় যথা, উত্তরাধিকার, জাতীয়তা প্রভৃতি সংক্রান্ত নয় বরং বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কিত। এসব বিষয় জাতীয় আন্তর্জাতিক আইন অথবা দেশীয় আইন (conflict of laws) আওতাভুক্ত। এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে ইসলামী জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনও 'ফিকাহ'র অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা ইসলামী বহির্ভূত কোন উৎস থেকে নয় বরং পবিত্র কোরানিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের ইচ্ছা থেকেই ক্ষমতা লাভ করে। জাতীয় আন্তর্জাতিক আইন স্বয়ং এক ব্যাপক বিষয় এবং স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে আলোচনার যোগ্য; বিশেষ করে যখন সর্বজাতীয় এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনের (public and private International law) প্রয়োগ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসকমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। যাহোক, ইসলামী জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনের একটি মোটামুটি ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে আমি এ পুস্তকে এ বিষয়ের উপর একটি পরিশিষ্ট সংযোজনা করেছি। প্রাথমিক মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিশারদগণ এ দুটি বিষয়কে পৃথক না করে 'সিয়ার' শাস্ত্রের আওতায় দুটি বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এ পরিশিষ্ট সংযোজনা করতে আমি প্রলুব্ধ হয়েছি।

(১৬) আমাদের সংজ্ঞায় উল্লেখিত 'অন্যান্য বাস্তব ও বৈধ রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে' (dealings with other de facto or de Jure states) কথাগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। একথা দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বলে বিবেচিত হবে সেসব

আইন যা একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার বেলায় মুসলিম আইনের অনুসরণ করে। এসব অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলিম অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রও হতে পারে। অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসী সংক্রান্ত অথবা মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত অমুসলিম আইন ও রীতি-নীতি ছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রের অন্য কোন আইন ও রীতি নীতি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

(১৭) পরিলক্ষণীয় যে গোঁড়া প্রচলন থেকে বহু নজীর উদাহরণার্থে অবাধে উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো একমাত্র পালনীয়। যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র বিশেষ কোন অনুশাসন সাময়িকভাবে উপেক্ষা বা অপপ্রয়োগ করে তার দরুন এ সকল অনুশাসন বাতিল বলে গণ্য হতে পারে না।

(১৮) সংক্ষেপে বলতে গেলেঃ ধর্ম শাস্ত্রবেত্তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইসলাম যদি 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ' অথবা আরো বিস্তারিতভাবে 'এক আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবী-রসুল, পরকাল দিবস ও ভাল-মন্দের বিচারক হিসেবে আল্লাহ'-এর প্রতি বিশ্বাস ও অনুশীলন হয়, সেক্ষেত্রে এ বিশ্বাস, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, মুসলিম আইনের প্রতিও কম প্রযোজ্য নয়। রসুলের মারফত প্রাপ্ত আল্লাহের আদেশের উপর ভিত্তি করেই আমাদের রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। আরো বিশদভাবে বলতে গেলে মুসলিম আইনবেত্তাগণ বিশ্বাস করেন যে, সব আইনের উৎস আল্লাহ যিনি যুগে যুগে নবী মারফত মানুষকে এ ব্যাপারে জ্ঞান দান করেছেন এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত শেষ নবী যিনি বিভিন্ন নবীদের নিকট প্রকাশিত এ চিরন্তন ঐশী আইনের নবরূপদাতা ; এ আইনের অনুমোদনই পরকালের ঐশী বিচার, মানুষের জন্য কোন কাজ ভাল কি মন্দ এ নির্ধারণ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ, তার প্রভুকে মেনে চলা ছাড়া মানুষের কোন গত্যন্তর নেই। আর সব কিছুই এ মূলসূত্র হতেই উদ্ভূত এবং এটাই ইসলামের একমাত্র ভিত্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন পরিভাষা

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবদের নিজস্ব রীতিনীতি থাকলেও এগুলো সুবিন্যস্ত ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপিত হলে মুসলিম আইনবেত্তাগণ শান্তি ও নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইনের বিশেষ শাখাটিকে সিয়ার নামে আখ্যায়িত করেন বলে মনে হয়। সিয়ার সীরাত অর্থাৎ আচরণ বা ব্যবহার শব্দের বহুবচন। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

(ক) ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮ হিজরী) সিরাতে রসূলুল্লাহ্, পৃঃ ৯৯২ ঃ [এরপর নবী বেলালকে আদেশ দিলেন তার (আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হাতে পতাকা দিতে। তিনি তাই করলেন। অতঃপর নবী আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং নিজের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি বললেন, 'হে আউফের পুত্র, পতাকাটি ধর, সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ কর আল্লাহ্র রাস্তায় এবং যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাদের সাথে সংগ্রাম কর। তথাপি কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করো না, কপটতার আশ্রয় নিও না এবং মৃতদেহকে বিকৃত করো না ; শিশু ও নারীকে হত্যা করো না। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই আল্লাহ্র বিধান এবং নবীর আচরণ।]

(খ) ইবনে হাবীব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরী) তাঁর কিতাবুল মাহবার, পৃঃ ২৬৫ পুস্তকে উল্লেখ করেন ঃ
(তারা সেখানে সাধারণ ভোজের আয়োজন করত এবং দুমাতুল জানদালের রাজাদের আচরণ মাফিক চলাফেরা করত।)

(গ) ইবনে সাদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরী) তাঁর তাবাকাতে (দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৩২-৩৩) উল্লেখ করেন ঃ
(মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ দেবে, ন্যায় সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং সদাচারণ করবে। এ নির্দেশ পরিবর্তন করার ক্ষমতা চুক্তিবদ্ধ কোন দলেরই নেই।)

(ঘ) [ইবনে হাম্বাল (মসনদ, নূতন সংস্করণ, হাদীস নং ১০৫৫) ঃ (নবীর ইন্তিকালের পর) আবু বকর খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি কর্মে ও আচরণে নবীর অনুসরণ করেন। তারপর ওমর খলিফা নিযুক্ত হন এবং তিনি আচরণে উভয়কে অনুসরণ করেন।]

(ঙ) আল মাসুদী মরুজ আজ্-াহাব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৩-৭৮, ইউরোপীয় সংস্করণ'—এ এই একই 'সিয়ার' পরিভাষা বহুবার ব্যবহার ক'রে আর একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেন ঃ
[(খলিফা) মোয়াবীয়া প্রত্যহ পাঁচবার দরবারে বসতেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ তিনি আরবদের কাহিনী ও ইতিহাস, অন্-আরব ও তাদের রাজনীতি, এবং অতীত রাজাদের আচরণ (সিয়ার), যুদ্ধ, কুটনীতি ও প্রজা সংক্রান্ত রাজনীতি প্রভৃতির কথা শুনতেন। অতঃপর তিনি মহলে প্রবেশ করতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ রাত নিদ্রা যাপন করতেন। অতঃপর তিনি শয্যা ত্যাগ করে আসন গ্রহণ করতেন; রাজাদের আচরণ (সিয়ার), তাদের কাহিনী, যুদ্ধ ও কুটনীতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী তাঁর সামনে হাজির করা হত। 'গিলমান'রা এগুলো তাঁকে পড়ে শুনাতেন। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পঠনের জন্য 'গিলমান' নিযুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাতে কিছু কাহিনী, আচরণ (সিয়ার), ঘটনা ও রাজনৈতিক বিবরণ তাঁর শ্রুতিগোচর হত। অতঃপর, সভা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ সম্পন্ন করতেন। নামাজ সমাপনান্তে পূর্বোক্ত কার্যসূচী অনুযায়ী তিনি দিনপাত করতেন।]

(২০) উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে 'সিয়ার' পরিভাষাটি নবীর কালে এমন কি প্রাক-ইসলামী যুগেও যুদ্ধ ও শান্তি-কালীন অবস্থা নির্বিশেষে শাসকদের আচরণ অর্থে ব্যবহৃত হত। হিজরীর তৃতীয় শতকের গ্রন্থকারদেরও এ অভিমত। ন্যূনপক্ষে এক

শতাব্দীকাল পূর্বে এ পরিভাষা 'আন্তর্জাতিক আইন' অর্থে গৃহীত হয়। আবু হানিফাই (মৃত্যু ১৫০ হিঃ) প্রথম[১] যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত মুসলিম আইনের উপর তাঁর বিশেষ বক্তৃতাবলী 'সিয়ার' পরিভাষা দ্বারা নামকরণ করেন বলে পরবর্তীকালে আবু হানিফার এসব বক্তৃতাবলী তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত হয়। তন্মধ্যে শায়েবানীর (মৃত্যু ১৮৯ হিঃ) 'কিতাবুস সিয়ার আল-সগীর' এবং 'কিতাবুস সিয়ার আল কবীর' ও ইব্রাহীম আল-ফাজারীর কিতাবুস সিয়ার' যেভাবেই হোক আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আবু হানিফার একজন সমসাময়িক, সিরীয় ঈমাম আল-আওজায়ী[২] (মৃত্যু ১৫৭ হিঃ) ইরাকী ঈমাম আবু হানিফার মতামতগুলোর সমালোচনা করেছেন। আল-আওজায়ীর মূল রচনাটির কোন হদীস নেই; কিন্তু আবু হানিফার বিখ্যাত শিষ্য আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২ হিঃ) প্রদত্ত এর জবাবটি আল-রাদ্দ আলা সিয়ার আল-আওজায়ী শিরোনামায় সম্পাদিত হয়েছে। সাফী (জন্ম ১৫০ হিঃ) তাঁর 'কিতাবুল উম'- এ (৭ম খণ্ড পৃঃ ৩০৩-৩৬) আওজায়ীর সিয়ারের উল্লেখ করেন যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন ওয়াকিদী-(মৃত্যু ২০৭ হিঃ) সিয়ারের কথা। এর পর থেকেই মনে হয়, 'সিয়ার' সাধারণ পরিভাষা হিসেবে পরবর্তী আইনবেত্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। সুরখসীর (মৃত্যু ২০৭ হিঃ) একটি নমুনা অনুচ্ছেদ পাঠে ইহা সহজেই বোধগম্য হবে যে সিয়ার পরিভাষা দ্বারা তিনি কি বুঝেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত ইসলামী গ্রন্থে 'সিয়ার' পরিভাষার তাৎপর্যই বা কী :

জেনে] রাখুন, 'সিয়ার' শব্দটা সিয়াতের' বহুবচন। (ঈমাম মোহাম্মদ শায়বানী) এ গ্রন্থের (কিতাবুস সিয়ার আল সগীর ও কিতাবুস সিয়ার আল কবীর) নামকরণ 'সিয়ার' দ্বারা করেছেন। কারণ, এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে যুদ্ধভাবাপন্ন অংশীবাদী, মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ (মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে) বিদেশী বাসিন্দা অথবা অমুসলিম প্রজা; জিম্মী ও ধর্মত্যাগী তথা নিকৃষ্টতম কাফির এবং বিদ্রোহী তথা নিকৃষ্টতম মুশরীক, যদিও এরা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট, এদের প্রতি মুসলমানদের আচরণ সম্পর্কে।][৩]

(২১) উল্লেখযোগ্য যে নবীর জীবনচরিত বুঝাবার বেলায়ও

ঐতিহাসিকগণ 'সিরাত' পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। জীবনচরিত অর্থে 'সীরাত' পরিভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, রাজীউদ্দীন সরখসী তাঁর গ্রন্থে আন্তর্জাতিক আইন পরিচ্ছেদে বলেন, "সীরাত শব্দটি যদি বিশেষণবিহীন ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে নবীর আচরণ বুঝায় বিশেষ করে তাঁর যুদ্ধকালীন আচরণ। এজন্যেই নবী বলেছেন, "প্রত্যেক নবীরই পেশা (জীবিকার জন্য) ছিল, আমার পেশা 'জিহাদ'; প্রকৃতপক্ষে, আমার বর্শার ছায়াতলেই নির্ভর করে আমার জীবিকা।"[৪] অন্য কথায়, আরবী ভাষায় 'সীরাত' পরিভাষাটির অর্থ নবীর সার্বিক আচরণ; কিন্তু পরবর্তীকালে সীমিত অর্থে নবীর যুদ্ধনীতি বুঝাতো; আরও পরে মুসলিম শাসকদের বৈদেশিক নীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়

(২২) বিষয় বলতে মুসলিম আইনবেত্তাগণ বোঝেন এমন একটি জিনিষ যার মূল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার আওতাধীন। আন্ত-র্জাতিক আইনের বিষয় বলতে আমরা সে পর্যায়ভুক্ত লোকদের বুঝি যাদের বেলায় এ আইন প্রযোজ্য। এর আওতাভুক্ত ঃ প্রথমত প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র যার অন্য রাষ্ট্রের কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয়ত আংশিক সার্বভৌম রাষ্ট্র যার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমিত ক্ষমতার অধিকার রয়েছে। তৃতীয়ত যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন বিদ্রোহী যারা প্রতিরোধ বলে রাজ্য দখল করে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। চতুর্থত পথচারী দস্যু এবং জলদস্যু। পঞ্চমত ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশী বাসিন্দা। ষষ্ঠত প্রবাসী মুসলিম নাগরিক। সপ্তমত ধর্মদ্রোহী। অষ্টমত সুবিধাপ্রাপ্ত অমুসলিম অথবা জিম্মী অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক।

(২৩) স্পষ্টত, এদের কোনটির বেলায় বন্ধুত্ব ও শত্রুতা উভয় প্রকারের সম্পর্কই সম্ভব এবং অন্যান্যদের বেলায় কেবল দুটির একটি সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মূল ভূখণ্ডের সাথে বৈরীভাব থাকলেই বিদ্রোহ সম্ভব। যে মুহূর্তে বিদ্রোহিগণ ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। হয় তারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নতুবা মূল ভূখণ্ডের অনুগত নাগরিকে রূপান্তরিত হয়, যাদের বেলায় আন্তর্জাতিক আইন আর প্রযোজ্য নয়। বিদ্রোহীদের মূল ভূখণ্ড ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের

বেলায় বিদ্রোহী রাষ্ট্র সাধারণ রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ করে। তবে বিদ্রোহের স্বীকৃতি এবং বলপূর্বক অধিকার আদায়ের মধ্যে বিদ্রোহী রাষ্ট্র ও মূল-ভূখণ্ডের মধ্যে একটি যুদ্ধকালীন অবস্থার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যাহোক পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করব।

(২৪) একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অধুনা কিছু নতুন বিষয় মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত হয়েছে। যদিও এসব বিষয় এর কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি ; তবুও এ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সালে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ জাতিপুঞ্জে (League of Nations) যোগদান করে এবং পরবর্তীকালে এর উত্তরসূরী জাতিসঙ্ঘ (U.N.O.), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানেও যোগ দেন। বৃটিশ কমনওয়েলথ, রুশ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফরাসী কমিউনিটির সদস্যপদও উল্লেখযোগ্য। এর ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার সার্বভৌম ক্ষমতার কিছু কেবল এসব প্রতিষ্ঠানের কাছেই অর্পণ করতে হয়নি বরং রাষ্ট্রদূত ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষকেও কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছে। উপরন্তু, আরব রাষ্ট্রপুঞ্জও (The League of Arabs states) বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এর পর্যবেক্ষকগণ সরকারীভাবে জাতিসংঘে প্রবেশাধিকার পায়। পুনরায়, অনেক মুসলিম রাষ্ট্র যেমন মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান প্রভৃতি পোপকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি আদান প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

যদিও ইসলাম পার্থিব জীবনকে অনিত্য ও পরকালের মঙ্গল আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করে—এবং যেহেতু আল-বিহারী[১] মুসলিম আইনের জ্ঞানের উদ্দেশ্য বলতে চিরন্তন পরকালের মঙ্গলের উপর জোর দেন—তথাপি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বৈরাগ্যকে স্বীকার করেনি বরং ইহজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন বলে :

"এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।' তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"[২] পুনরায় বলে :

"আল্লাহ্ পারলৌকিক গৃহের যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তুমি তাহাতে (কল্যাণ) অন্বেষণ করিতে থাক ও সংসারের আপন অংশ ভুলিও না এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেমন হিত সাধন করিয়াছেন তুমি তদ্রূপ হিত সাধন কর..."[৩]

আরও বলে :

"বল, আল্লাহ্ স্বীয় দাসদিগের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে? বল, এই সমস্ত তাহাদিগেরই জন্য যাহারা পার্থিব জীবনে, বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে।' এইরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত কর।"[৪] এ দ্বারা বুঝায় সংসারের প্রতি অনীহা ইসলামসম্মত নয়। পার্থিব ভোগবিলাসের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে

তা হল আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে এবং অন্যের সম-অধিকারে হস্তক্ষেপ না করতে। অন্য কথায়, দুর্বল অথচ অধিকারবিশিষ্ট আগন্তুকের প্রতি অবিচার করে কারোর ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা উচিত নয়। কুরআনে বার বার বলা হয়েছে, ওয়াদা রক্ষা করা এবং চুক্তির শর্তাবলী সততার সাথে পূরণ করার জন্য। (কুরআন ঃ সূরা ১৭, ৩৪; সূরা ২, ৪০, ১৭৭; সূরা ৩, ৭৬; সূরা ৭, ১০২; সূরা ৮, ৫৬-৫৮; সূরা ৯, ৫-১৩; সূরা ২৩, ৮; সূরা ৭০, ৩২)। নবীর ভাষায়, মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা চুক্তির শর্তাবলী[৫] মেনে চলে। কিন্তু তাই সব নয়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য অবিরাম সংগ্রামের নির্দেশ দেয়। যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি কুরআন[৬] পছন্দ করে না এবং ধর্মপরায়ণতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য কুরআন মুসলমানদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেহেতু শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারই মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলে ঃ

"তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পরের সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে: আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"[৭]

(২৬) বলা বাহুল্য যে বিশ্ববাসীদের পার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গোটা মুসলিম আইন কাঠামোর বিন্যাস করা হয়েছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য যা-ই হোক এর আশু উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষের সদুপায়ে জীবন যাপনের যোগ্যতা বিধান। Mutatis Mutandis মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের যথাসম্ভব সর্বাধিক ন্যায়াচরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদন (Sanction)

(২৭) মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদন ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ মুসলিম আভ্যন্তরীণ আইনের অনুরূপ বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বেলায়। কারো প্রতি অন্যায় করা হলে সরকার বিচার সংস্থার মাধ্যমে এর সুবিচার করেন। এ অজানা নয়, মুসলিম আইনের প্রকৃত অনুমোদন রাষ্ট্র-প্রধানের, যেহেতু তিনি মানুষ, সীমালংঘন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়, একক ইচ্ছাই কেবল নয় বরং অধিক মাত্রায় পরকাল ও আল্লাহের বিচারে বিশ্বাসও। জাগতিক বিধি-নিষেধের তুলনায় আধ্যাত্মিক ও বিবেকধর্মী আবেদন ও নিবৃত্তিমূলক উপাদানসমূহ অধিক কার্যকরী। অতএব, শুধু চাপে পড়েই কেউ আইন পালন করে না বরং সেখানে প্রতিশোধ, দুর্নাম এবং অপবাদের ভয় ছাড়া তার ইচ্ছার উপর অন্য কোন বাধা নেই সেখানেও সে আইন মেনে চলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মূল এবং উৎস

(২৮) 'উৎস' বলতে আমরা এখানে সে সব বিষয়ের কথা বলছি যেখানে একটি শাস্ত্রের বিধিসমূহ প্রথমে খুঁজে পাওয়া যায়। মুসলিম আইন শাস্ত্র প্রণেতাগণ সব সময় ভাবব্যঞ্জক "মূল" (উসুল) পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। এর থেকেই প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ নির্গত হয়। আমরা একথা বলছি না যে গোড়াতেই কর্তৃত্বসম্পন্ন এ বিধিগুলোর অলংঘনীয় ক্ষমতার আবশ্যকতা ছিল। অন্যথায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিধিই আন্তর্জাতিক আইনের একমাত্র সম্ভাব্য উৎস হত। এ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করব ঃ

১। কুরআন।

২। সুন্নাহ।

৩। প্রাথমিক যুগের খলিফাদের গোঁড়া আচরণ।

৪। অন্যান্য মুসলিম শাসকদের আচরণ যা আইনবেত্তাগণ কর্তৃক বাতিল বলে গণ্য হয়নি।

৫। প্রখ্যাত মুসলিম আইনবেত্তাদের অভিমত ঃ

(ক) ইজমা

(খ) কিয়াস

৬। আপোষনামা।

৭। সন্ধি, চুক্তি ও অন্যান্য রীতি।

৮। সেনাপতি, নৌ-বাহিনী প্রধান, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি সরকারী নির্দেশ।

৯। বিদেশী ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন।

১০। প্রথা ও রীতিনীতি।

কুরআন ঃ

(২৯) কুরআন সকল মুসলমানের কাছে আল্লাহের বাণী বলে স্বীকৃত। অতএব, কুরআন তাদের সকল আইনের ভিত্তি। বস্তুত ইহা ঐশী বাণীর সংকলন—আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, জীবরাইল ফিরিস্তা মারফৎ মোহাম্মদের নিকট অবতীর্ণ তথাকথিত 'পঠিত অহীর' অহীমাতুল[১] সংকলন। সম্পূর্ণ কুরআন একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি। হযরতের নবুয়ত কালে প্রয়োজন বিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কুরআন অবতীর্ণ হয়। প্রথম 'অহী' প্রাপ্তির পর থেকে নবীর মৃত্যু পর্যন্ত নবুয়তের কাল প্রায় ২৩ বছর। যখন কোন 'অহী' অবতীর্ণ হত তিনি তা প্রথমে জনসমাবেশে এবং পরে বিশেষ নারী সমাবেশে আবৃত্তি করতেন (ইবনে ইসহাক কর্তৃক বিবৃত, মাগাজী) এবং তাঁর প্রতিলিপিকারদের একজনকে তা লিখে রাখার আদেশ দিতেন। কোন্ আয়াতটি কোন্ স্থানে প্রযোজ্য তাও তিনিই নির্দিষ্ট করতেন।[২] কুরআনের আয়াতসমূহ সময়ানুক্রমিকভাবে সংকলিত হয়নি। স্পষ্টত কুরআন নবীর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়নি ; বিক্ষিপ্ত কাগজ, অংশ ফলক (Shoulder blades), খেজুর পাতা এবং অন্যান্য সহজলভ্য দ্রব্যে লিপিবদ্ধ ছিল।[৩] এও উল্লেখিত আছে যে, যখন কোন অবতীর্ণ আয়াত নাকচ হয়ে যেত তা কেবল নবীর আদেশেই বাতিল করা হত।[৪] নিয়মানুসারে নবীর সাহাবাগণ (সঙ্গিগণ) প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী আয়াতসমূহ মুখস্থ করতেন এবং সুবিধার্থে এর অনুলিপিও নিজেদের কাছে রাখতেন। এমন কি নবীর নবুয়তের প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ কিছু আয়াতের বহু ব্যক্তিগত প্রতিলিপি মক্কায় বিদ্যমান ছিল।[৫] নবীর মৃত্যু অবধি এ ব্যবস্থা চালু ছিল। উপরোক্ত প্রামাণিক দলিল ছাড়া, মোহাজেরদের কথা না বললেও, কেবল আনসারদের মধ্যে

তৎকালে একজন মহিলাসহ কমপক্ষে চার কিংবা পাঁচজন কুরআনে হাফিজ ছিলেন।[৬] পরবর্তীকালে হাফিজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়,[৭] কারণ এটা তাদের জন্য সরকারী মর্যাদা, পদবী ও জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভে সহায়ক ছিল।[৮] অদ্যাবধি হাফিজ ও কারিগণ তাঁদের ছাত্রদের কুরআন কণ্ঠস্থ ও পাঠ করা শিক্ষান্তে সনদ দেবার বেলায় নবীর আমল থেকে কুরআনের আয়াত ও পারা যেভাবে সজ্জিত ছিল এবং যে সুরে পঠিত হত এবং শিক্ষক পরম্পরায় তারা যা অবগত হয়েছেন সে মাফিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন।

(৩০) নবীর প্রথম উত্তরাধিকারী খলিফা আবু বকর তাঁর খিলাফত স্বল্পকালীন হওয়া সত্ত্বেও (প্রায় দু বছর) নবী অনুমোদিত নিয়ম মাফিক আয়াতগুলো শৃঙ্খলা করে বিশুদ্ধ কুরআনের একখণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত কার্যের জন্য নিযুক্ত সংস্থাকে বিভিন্ন হাফিজের সঙ্গে আয়াতগুলো পরখ করে দেখা ছাড়াও প্রত্যেকটি আয়াতের জন্য দুটি করে প্রামাণিক অনুলিপি[৯] যাচাই করতে হয়। 'প্রাথমিক অনুলিপি' বলতে হাদীস সম্বন্ধীয় গ্রন্থকারগণ বুঝিয়েছেন সেসব অনুলিপি যা নবীর সম্মুখে সংশোধিত হয়। এ কাজ যথাসময়ে সফলতার সংগে সম্পন্ন হয়; মাত্র একটি কিংবা খুব সম্ভবত দুটি ছোট আয়াতের বেলায় একাধিক প্রামাণিক অনুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১০]

(৩১) সরকারী সংস্করণের একমাত্র কপিটি খলিফা আবু বকরের কাছেই ছিল। পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফা ওমর এটি ব্যবহার করেন। তিনি নিহত হওয়ার পর এটি তাঁর কন্যা[১১] ও নবীর স্ত্রী হযরত হাফসার জিম্মায় ছিল। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের আমলে কুরআনের নির্ভরযোগ্য কপির অভাবে বিভিন্ন প্রদেশে অসুবিধার সৃষ্টি হতে থাকে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য খলিফা কুরআনের একমাত্র সরকারী সংস্করণের সাতটি কপি প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। কপিগুলো বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী দফতরে পাঠানো হয় এবং মূল কপিটি হযরত হাফসাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। খলিফা ওসমান নির্দেশ দেন যে সরকারী কপি অবশ্য অনুসরণীয় এমন কি বানানের[১২] ক্ষেত্রেও এবং যেসব ব্যক্তিগত কপি সরকারী কপির সাথে অমিল পাওয়া যাবে

সেগুলো সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।[১৩] বর্তমান কুরআন উপরোল্লিখিত হযরত ওসমান কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনের কপি। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রন্থকারের কুরআনের ফারসী অনুবাদ, Le Coran, প্যারিস, ১৯৫৯, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৬৬ দ্রষ্টব্য।)

সুন্নাহ ঃ

(৩২) ক্রম ও গুরুত্বের দিক দিয়ে 'সুন্নাহ' বা 'হাদীস' অর্থাৎ নবীর কথা, কাজ ও সম্মতি, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের দ্বিতীয় উৎস। পরিমাণের দিক দিয়ে সুন্নাহে প্রাপ্ত মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সংখ্যা কুরআনে প্রাপ্ত আইনের চেয়ে অধিক। গুণগত বিচারে হাদীসকে কুরআনের পরের স্তরের গণ্য করা হয়। তথাপি হাদীসের সত্যতা নিরূপণে অসুবিধা হেতু এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। অন্যথায়, আল্লাহের প্রতিনিধি হিসেবে নবী যে সমস্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন সে সমস্তকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকার করে নিয়ে কুরআন স্বয়ং স্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধভাবে নবীর বাণীকে কুরআনের সমমর্যাদা দিয়েছে।[১৪]

(৩৩) নবীর জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গিগণ কর্তৃক হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়। হাদীস সংকলন ছাড়াও অনেক সরকারী দলীল যথা সন্ধিপত্র, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ, চিঠি, সনদপত্র, আদমশুমারী রিপোর্ট[১৫] এবং অনুরূপ দলিলাদির[১৬] সংকলনের কাজও শুরু হয়। নবীর সাহাবিগণ কর্তৃক হাজার হাজার হাদীস লিখে রাখার এবং এর চেয়ে অধিক তাঁদের শিষ্যদের (শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ লিখে রেখেছিলেন) নিকট এর মৌখিক প্রচারের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। দীর্ঘকাল যাবত আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, লিখিতভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় নবীর মৃত্যুর দুশ' বছর পরে। সমকালীন বহু মুসলিম মনীষী, যথা কাত্তানী, শিবলী সুলাইমান নদ্‌ভী এ অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করেছেন। অধিকন্তু, কিছুদিন পূর্বে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানাজির আহসান এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অতএব, এ ব্যাপারে অধিক আলোচনা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমি আমার পাঠকদের একথা স্মরণ

করিয়ে দিতে চাই যে, একমাত্র হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থেই নবীর জীবন সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায় না।

গোঁড়া আচরণ ঃ

(৩৪) নবীর আচরণের ন্যায় তাঁর স্থলাভিষিক্তদের আচরণও বিভিন্ন গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হাদীস, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিচারের রায় (case law), সংকলন ও অন্যান্য গ্রন্থে তা পাওয়া যায়। নবী অথবা তাঁর খলিফাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আচরণের কোন বিশেষ বা পৃথক সংকলন কখনো প্রকাশ করা হয়নি। যদি কোন প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে হয়েও থাকে তা যথার্থ নয়।

(৩৫) একথা না বললেও চলে যে গোঁড়া খলিফাদের আমলের যে সমস্ত নজীর সুন্নাহের পরিপন্থী নয় তা গ্রহণযোগ্য। গোঁড়া খলিফাদের সর্বসম্মত কোন আচরণ যদি নবীর সুন্নাহের পরিপন্থী হয়, সেক্ষেত্রে এ ধারণার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে যে, গোঁড়া খলিফাগণ যাঁদের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান পরবর্তী আইনবেত্তাদের চেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছিল তাঁরা নিশ্চয় একাজ নবীর অন্য কোন সুন্নাহের ভিত্তিতেই করেছেন এবং খলিফাদের অনুসৃত সুন্নাহের দ্বারা এর পরিপন্থী সুন্নাহটি বাতিল বলে গণ্য হবে। তত্ত্বমূলকভাবেই ইহা সম্ভব; কারণ এরূপ কোন বাস্তব ঘটনা আমার জানা নেই।

(৩৬) মুসলিম আইন শাস্ত্রে নবীর সাহাবিগণ যদিও নবীর ন্যায় অভ্রান্ত বলে কখনো বিবেচিত নন তথাপি তাঁরা শ্রদ্ধাভাজন। তাঁদের ধর্মপরায়ণতা এবং নেতার প্রতি তাঁদের অনুরাগ কখনো তাঁদের স্বেচ্ছায় নবীর নির্দেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করতে পারেনি। যদি তাঁদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ করে ফেলতেন, অন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধরিয়ে দিতেন। যা হোক, যেসব বিষয় সম্পর্কে নবীর সুন্নাহে কোন নির্দেশ ছিল না সেসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল না তা বলা যায় না। এসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের পরস্পরবিরোধী অভিমত তাঁদের নিজ নিজ খ্যাতি অনুসারে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথম চার খলিফার যে কোন একজন

এবং ইবনে মাসুদের অভিমত অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য।

অন্যান্য মুসলিম শাসকদের আচরণ ঃ

(৩৭) গোঁড়া খলিফাদের আচরণের আইনগত অনুমোদন রয়েছে। অন্যান্য এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকদের বেলায় তা নেই। তবুও ক্ষেত্রবিশেষে এঁদের সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে যাঁদের কার্যকলাপ সমকালীন ও পরবর্তী আইনবেত্তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়নি। কোন কোন উমাইয়া ও আব্বাসী সুলতান, গাজী সালাহউদ্দীন, ভারতের আওরঙ্গজেব এবং অন্যান্য অনেক মুসলিম শাসক বহু মূল্যবান নজীর রেখে গেছেন যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(৩৮) এর তথ্যাদিও বিভিন্ন সূত্র থেকে খুঁজে বের করতে হবে। সূত্রের নির্ভরযোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপিত হবে। এও পরিলক্ষণীয় যে, কুরআন, সুন্নাহ্ অথবা গোঁড়া আচরণ পরপন্থী নয় এমন শর্তসাপেক্ষ তথ্যাদি আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের জন্য গৃহীত হয়।

আইনবেত্তাদের অভিমত ঃ

(৩৯) গোড়া থেকেই মুসলিম আইনশাস্ত্র প্রণেতাগণ আইনবেত্তাদের অভিমতকে দুটি অসম গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা, 'ইজমা' ও 'কিয়াস'।

ইজমা ঃ

(৪০) ইজমার স্বপক্ষে নবীর বিভিন্ন বাণীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

(১) আমার উম্মতগণ কখনো ভুল সিদ্ধান্তের উপর একমত হবে না।

(২) আল্লাহের সাহায্য সমষ্টির প্রতি, যে উহা পরিত্যাগ করে সে অভিশপ্ত।

(৩) মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে যা ভাল বিবেচনা করে আল্লাহের দৃষ্টিতেও তা ভালো।

এ ছাড়া আরও অনেক হাদীস এ প্রসঙ্গে রয়েছে। এমন কি কুরআনের আয়াতের উল্লেখও এর স্বপক্ষে রয়েছে।

(৪১) মুসলিম শাস্ত্র অনুযায়ী যখনই মুসলিম আইনবেত্তাগণ কোন বিষয়ে একমত হন তাঁদের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 'ইজমা' ''কুরআনের আয়াত অথবা নির্ভরযোগ্য হাদীসের সমপর্যায়ে গুরুত্বলাভ করে এবং যে এর কর্তৃত্ব অস্বীকার করবে সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে গণ্য হবে।''[১৭] যাহোক, আইনশাস্ত্র প্রণেতাগণ তত্ত্বমূলকভাবে এও স্বীকার করেন যে পরবর্তী কোন 'ইজমা' দ্বারা পূর্ববর্তী 'ইজমা' নাকচ হতে পারে।[১৮]

(৪২) ভাববার বিষয় যে, 'ইজমার' গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও একে নিরূপণ করার জন্য কোন স্থায়ী সংস্থার উদ্ভাবন করা হয়নি। অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, আইন ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সর্বদাই সলাপরামর্শ করতেন।[১৯] আবার খলিফা ওমর তাঁর বিশাল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রদেশপালদের সাথে পরামর্শ, সর্বোচ্চ আদালতের সাধারণ ও গোটা সাম্রাজ্যের আপীল-অধিবেশন অনুষ্ঠান এবং সাম্রাজ্যের দূরাঞ্চল হতে আগত প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদি ব্যাপারে 'হজ্জ'কে সহজ ও সুবিধাজনক বার্ষিক সংস্থা হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। নবীর মৃত্যুর পর এক বা দুই পুরুষ যাবত দেশের সর্বোত্তম ও একান্ত উপযোগী মত নিরূপণ করা সরকারী দায়িত্ব বলে বিবেচিত হত। যা হোক, অচিরেই গৃহযুদ্ধ ও ধর্মীয় কোন্দল শুরু হয়। শাসকগণ নিজ নিজ 'আস্থাভাজন আইন-মন্ত্রণাদাতাদের পরামর্শ মাফিক চলতে থাকেন এবং সাধারণ পরামর্শের (ইজমা) রেওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। পরিণতিতে আইনশাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও গবেষকেরা এ নিয়ে চর্চা করেন এবং বাস্তবে 'ইজমার' কোন স্থান রইলো না যেহেতু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সূক্ষ্ম ও ক্রমবর্ধমান সাহিত্যে গবেষণা করা ছাড়া 'ইজমা' সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের আর কোন পন্থা নাই। অন্যদিকে, কোন বিষয়ের সর্ব-সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তের জন্য কোন গ্রন্থকার বিশেষ মতামত ব্যক্ত করার যোগ্য বলে ঘোষণা করার কোন আইনানুমোদন নেই। এটা খুবই সহজবোধ্য যে বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ সভ্যের এসব ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।

কিয়াস ঃ

(৪৩) মুসলিম আইনশাস্ত্রে আইনবেত্তা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত অভিমতের প্রকৃতিগত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অনুসিদ্ধান্ত (analogy), অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত (deduction), ন্যায় (equity), responsa prudentium, আদালতের সিদ্ধান্ত (judicial decisions), গ্রন্থ অথবা অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত পণ্ডিতবিশেষের অভিমত এসব কিছুরই বিভিন্ন পারিবারিক নাম ও গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ইহা অনেকটা শব্দ নিয়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাম্বালী মতাবলম্বী কুদামা (তাঁর গ্রন্থ উসুলুল ফিকাহ্) কিয়াস বাতিল করে তৎস্থলে 'ইসতিসহাব' ব্যবহার করেন। এর বিশদ আলোচনা আমি করতে চাইনে। বরং আমি যেসব গ্রন্থে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন পুরোপুরি বা আংশিকভাবে আলোচিত হয়েছে তার শ্রেণী বিন্যাস করব। প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) 'সিয়ার' অথবা নিছক আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী।

(খ) 'ফিকাহ' অথবা মুসলিম আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী।

(গ) 'ফতোয়া' এবং 'আকদিয়া' অথবা আইনগত সিদ্ধান্ত ও মামলা উদ্ভূত আইন প্রভৃতির সংকলন।

(ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অনুরূপ বিষয়ক গ্রন্থাবলী।

(ঙ) প্রশাসনিক ও গণ আইন বিষয়ক পুস্তকাবলী।

(চ) 'নাসায়েহুল মুলূক' অথবা রাজকুমারদের সরকার পরিচালনার কলা-কৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত পাঠ্যপুস্তকাদি।

(ছ) বিশ্ব-ইতিহাস অথবা বিশেষ ইতিহাস, জীবনচরিত, রাজনৈতিক কবিতা ও অনুরূপ বিষয়ক গ্রন্থাবলী।

(জ) রণ-কৌশল, সামগ্রিক যুদ্ধপরিকল্পনা ও যুদ্ধবিদগণ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী।

(ঝ) বিভিন্ন সম্মেলনের কার্যবিবরণী।

(ঞ) মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাবলী।

(৪৪) এসব গ্রন্থের প্রত্যেক শ্রেণী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার

প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির একটি সংকলন গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হবে। যাহোক, এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, 'মাগাজী' (নবী আমলের যুদ্ধসমূহ) সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ইচ্ছাকৃতভাবে এ শ্রেণী বিন্যাস হতে বাদ দেওয়া হয়েছে যেহেতু 'মাগাজী' এবং সাধারণভাবে নবীর জীবনচরিত প্রকৃতপক্ষে পূর্বে আলোচিত দ্বিতীয় উৎসের অর্থাৎ সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত।

(৪৫) আমার গবেষণাকালে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তাকাবলী এবং প্রাচীন কালের যে কোন সভ্যজগতে রাজকুমারদের প্রতি কার্যকরী উপদেশ যার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিধি সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে—যথা, অ্যারিষ্টোটলের পুস্তকাবলী, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কনফুসিয়াসের 'সুকিঙ' ও অন্যান্য রাজনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ইত্যাদির অভাব নেই, তবুও আরবদের পূর্বে আন্তর্জাতিক আইনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা সাধারণভাবে আইন থেকে পৃথক করে আলোচনা করতে কোথাও দেখা যায় না। এক্ষেত্রে আবু হানিফাই খুব সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি এবং 'সিয়ার' সাহিত্য আইনশাস্ত্রে একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে পরিগণিত হয়। এমন অনেক আইন গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে যা আবু হানিফারও পূর্বেকার। এদের সম্পর্কে আমরা এখনই আলোচনা করব। কিন্তু আবু হানিফার পূর্বে কোন আইনবেত্তা 'সিয়ার' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

(৪৬) সম্ভবত আইন সাহিত্যের প্রতি প্রথমেই মনোনিবেশ করা প্রত্যেক জাতির বেলায় স্বাভাবিক। হিজরীর প্রথম শতাব্দীতেই ইসলামী আইন গ্রন্থের প্রণয়ন হয় বলে মনে হয়। জায়েদ ইবনে আলীর (মৃত্যু ১২০ হিঃ) গ্রন্থ বলে পরিচিত 'কিতাবুল মাযমূয়া' আমাদের হস্তগত হয়েছে।[২০] এতে 'সিয়ার' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে একটি অধ্যায় রয়েছে। তেমনি মালিকের (মৃত্যু ১৭৯ হিঃ) মুয়াত্তা গ্রন্থেও 'সিয়ার' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। এরপর থেকেই প্রকৃতপক্ষে এমন কোন ইসলামী আইন সংহিতা রচিত হয়নি যার

মধ্যে 'সিয়ার' 'মাগাজী' এবং 'জিহাদ' প্রভৃতি শিরোনামায় আন্তর্জাতিক আইনের উপর বিশেষ অধ্যায় ছিল না।

(৪৭) 'ফতোয়া' অথবা মামলার বিবরণী, আইনগত সিদ্ধান্ত এবং Responsa prudentium শিরোনামাকৃত গ্রন্থাবলীর বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। এগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ খলিফা আলীর গ্রন্থ বলে পরিচিত। তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক এ গ্রন্থ সংকলিত হয়। তবে এর কোন কপি এখন পাওয়া যায় না। অনুরূপ আর একটি প্রাচীন গ্রন্থ নবীর প্রধান সচিব জায়েদ ইবনে ছাবেতের নামে প্রচলিত। হিজরীর পঞ্চম শতক পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়। আবুল হুসাইন বসরী (মৃঃ ৪৩৬ হিঃ) তাঁর 'কিতাবুল মুতামাদ ফি উসুলিল ফিক' (বায়রুত সংস্করণ) গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। মূলত এসব গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে বিচারকবিশেষের রায়ের সংগ্রহ (অনুরূপ গ্রন্থ ইবনে রুশদের নামেও প্রচলিত আছে) অথবা বেসরকারী আইনবেত্তাদের জবাবের সংকলন হিসেবে। পরবর্তীকালে এমনকি আইনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নামকরণের বেলায়ও 'ফতোয়া' শব্দটির ব্যবহার করা হয়। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মুসলিম আইন সংকলন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এঁদের চেষ্টার ফলে 'ফতোয়াই আলমগীরী'[২১] প্রকাশ পায় যা এখনও মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত।

(৪৮) এ প্রসঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে যুক্তিপূর্ণ ও সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টার চেয়ে সমষ্টিগত আলোচনার সম্ভাবনা অধিক। এমনকি প্রাথমিক যুগেও এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীদের সাহচর্যের যথেষ্ট নজীর ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে। মুসলিম চিন্তাধারার উপর এসব মনীষীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আমি এখানে 'ইখওয়ানে সাফা'র আলোচনা করব না ; কারণ এরা আইনের চেয়ে দর্শন নিয়ে বেশী জড়িত বলে আমার মনে হয়। যাহোক, আবু হানিফা প্রতিষ্ঠিত আইন গবেষণা কেন্দ্রের (Law Academy) কথা উল্লেখ না করে আমি আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি না। যদিও এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলিম আইনের সংকলন ও বিন্যাসে এঁর

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কথিত আছে[২২] যে উক্ত একাডেমীতে চল্লিশ জন সদস্য ছিলেন। সদস্যদের প্রত্যেকে আইনবিশারদও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ, কিছু ছিলেন নৈয়ায়িক, এছাড়াও কিছু ছিলেন ইতিহাসবিদ যাঁরা গোঁড়ামী যুগের রেওয়াজ ও এদের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪৯) এ প্রসঙ্গে মুসলিম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা আসে। প্রাথমিক যুগে আন্তর্জাতিক আইন অথবা নিছক আইনের উদ্দেশ্যে কোন সম্মেলনের দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। তথাপি অনেক সামাজিক অপকর্মের মূল কোন কোন আইন ও প্রথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেজন্য এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মেলনকে এ প্রসঙ্গে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। উদাহরণ-স্বরূপ, মুসলমানদের জন্য সুদী লেনদেন ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ হলেও ভারতে 'বানিয়া' এবং অন্যত্র ইহুদীদের সুদী কারবারের প্রভাব থেকে মুসলমানগণ মুক্ত থাকতে পারেনি। কারণ, দেশে বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা না থাকলে আর্থিক প্রয়োজনের সময় অন্তত সুদপ্রদানের ন্যায় গর্হিত কাজ থেকে মুসলমানদিগকে বিরত রাখা কঠিন। অতএব, সারা বিশ্বের মুসলিম মনীষী ও নেতৃবৃন্দ ৭৯৩ হিজরীতে মদিনায় এক সম্মেলনে মিলিত হন। এ সম্মেলনে তাঁরা তৎকালীন মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন এবং তা সমাধান কল্পে কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি সৈয়দ আবুল ফাতাহ ওরফে শেখ আবদুল মুনীম বাগদাদী 'মুখ্‌তারুল কাওয়ানীন' শিরোনামায় সম্মেলনের পূর্ণ কার্যবিবরণী প্রকাশ করেন। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে সম্পূর্ণ রচনাটির কোন হদীস নেই। ভারতের একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে এর অংশবিশেষ রক্ষিত আছে। মূল রচনাটি আজ পর্যন্ত অসম্পাদিত রয়েছে, তবে কয়েক বছর আগে 'মদিনা সম্মেলন' শিরোনামায় এর একটি হিন্দুস্থানী অনুবাদ ছাপা হয়। 'ইসলামিক কালচার' পত্রিকার জানুয়ারী, ১৯৪১, সংখ্যায় এর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়।

(৫০) আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে দু-একটি কথা।

(৫১) আরবী সাহিত্যের অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত ইসলামী আইন গবেষণার ক্ষেত্রেও অমুসলিম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আগ্রহ ও উদ্যম আধুনিক মুসলমান পণ্ডিতদিগকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) এইচ, রেনাল্ড, Instituts du droit Musulman relative a la guerre, trad. du latin par পরিচ্ছেদ Solvet, ১৮৩৮।

(খ) Institutions du droit Mahometan sur la guerre avec les Infideles, trad. de l' arabe par পরিচ্ছেদ, solvet।

(গ) হেইনবার্গ, "Das muslimiche kriegscrecht" (Abhandlungen der philosophilolog এ। Bayrisch। Akademie der wissenchaften, ১৮৬৯)।

(ঘ) এন, বি, ই, বেইলী, "Jihad in Mohammedan Law and its Application to British India, J. R. A. S., লণ্ডন, ১৮৭১, পৃঃ ৪০১।

(ঙ) ই, নীস, "Le droit des gens dans les rapports des Arabes et des Byzantins" (Revue du droit International et legislation comparee এ, ১৮৯৬, ব্রুকসেলী, পৃঃ ৪৬১-৮৭)।

(চ) সি, হুয়ার্ট, "Le droit de guerre" (Revue du Monde Musulman, প্যারিস, ১৯০৭, পৃঃ ৩৩১-৪৬)।

(ছ) আইডেম, "de khalifat et la guerre sainte" (Revue de l' Histoire de Religions, ১৯১৫, পৃঃ ২৮৮-৩০২)।

(জ) ই, ফাগনান, Le Djihad selon l' ecole malekite (আলজেরীয়া, ১৯০৮)।

(ঝ) টমাস, ডব্লিউ, ইউনবল, Handbuch des islamischen Gesetzes (১৯১০, লাইডেন, লীপজীগ)।

(ঞ) এফ, এফ, স্মীথ, "Die occupaito in islamischen Rech" (Der Islam, ১৯১০, পৃঃ ৩০০-৫৩)।

(ট) প্রথম মহাযুদ্ধকালে রচিত ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কমূলক প্রবন্ধাদি। যথা:

১। স্নোক হোরগ্রনযী, "Heilige Oorlog Made In Germany" (De Gids. জানুয়ারী, ১৯১৫)।

২। সি, এইচ, বেকার. "Deutschland und der heilige krieg" (Internationale Monatschrift ১৯১৫, ৬৩১-৬২)।

৩। স্নোক হোরগ্রনযী, "Deutschland und der heilige krieg," Erwiderung (ঐ, পৃঃ ১০২৫-৩৪)।

৪। সি. এইচ, বেকার, "Schlusswort" (ঐ, পৃঃ ১০৩৩-৪২)।

৫। এফ, সাওয়ালী, "Der heilige krieg des Islam in religions ges chichtlicher und staatsrechlicher Bedeutung (ঐ, ১৯১৬, পৃঃ ৬৭৮-৭১৪)।

(ঠ) হেটস্‌সেক, "Der Mustamin" ein Beitrag zum internationalen privat und Voklerrecht des Islamischen Gesetzes, (বার্লিন, ১৯১৯)।

(জ) ডব্লিউ, হেফেনইঙ্গ, Das Islamische Fremdenrecht, ১৯২৫।

(৫২) রুশ, জার্মান, ইতালী, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায়ও খিলাফত সম্পর্কে প্রচুর লেখা রয়েছে। এসব লেখার একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন ১৯২৫ সালের 'Revue du Monde Musulman' (বর্তমানে Revue des Etudes Islamique, Paris নামে প্রকাশিত) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(৫৩) আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকাবলী যার মধ্যে ইসলামের অবদান প্রসঙ্গেও আলোচনা রয়েছে আমরা তা উপেক্ষা করিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াকারের A History of the laws of Nation (প্রথম খণ্ড, কেম্ব্রিজ, ১৮৯৯), বর্ডওয়েলের Laws of war Belligerents (চিকাগো, ১৯০৮), নিসের (Nys) Etudes de droit internationl public et droit politique, এবং Les Origiens du droit international (প্যারিস, ১৮৯৪), এবং হলটসয়েনডর্ফের Handbuch des Volkerrechts (১৮৮৫, চার খণ্ডের প্রথম খণ্ড) প্রভৃতি এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

(৫৪) আমি যতদূর জানি গত শতাব্দীর নবম শতকে মুসলমান লেখকগণ এ ব্যাপারে লেখার প্রয়োজন অনুভব করেন। ইস্তাম্বুলের ইব্রাহীম হাক্কী আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ ইতিহাস লিখতে গিয়ে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উপর কোন গ্রন্থ নেই বলে আক্ষেপ করেন। ইসলামের অবদান সম্পর্কে প্রায় বারো পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর তিনি তাঁর বিশিষ্ট রচনাভঙ্গীতে বলেন,

["গুটিকয়েক কথার মাধ্যমে মানব ইতিহাসে মুসলমানদের গৌরবময় ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করানোই আমার বিনীত প্রচেষ্টা। মুসলমানগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছিল এবং মধ্য যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ববিষয়ে পশ্চিমাদিগকে (ইউরোপীয়) ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতএব, আন্তর্জাতিক আইনবিধির ন্যায় মানব সভ্যতার এ বিশেষ দিকটি সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেন না। নিশ্চয় তাঁরা এ সম্পর্কে গবেষণা ও পুস্তক রচনা করেছিলেন। তথাপি কি করা কর্তব্য? খ্যাতনামা মুসলিম লেখকদের গ্রন্থাবলীর অংশবিশেষ খৃষ্টান ও তাতারদের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ বিভিন্ন লাইব্রেরীর আনাচে-কানাচে অনাদরে পড়ে রয়েছে। ফলে, এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীন মুসলিম লেখকদের রচনাবলী সম্পর্কে গবেষণা ও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা 'ওলেমাদের' পবিত্র দায়িত্ব।"]

(৫৫) আমাদের এ লেখকের সমসাময়িক আহমদ রশীদ এমন কি ১৯৩৭ সালে এ ব্যাপারে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেন, "বস্তুত, এখন পর্যন্ত এমন কোন বই প্রকাশিত হয়নি যাতে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।[২৩]

(৫৬) তবুও আহমদ রশীদ নিজে এ কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি; এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হেগের আন্তর্জাতিক আইন একাডেমীতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলী। পূর্বে এ সম্পর্কে আহমদ রশীদের লিখিত নিম্নোক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধাদির কথা আমি জানতে পেরেছি ঃ

(ক) দামেস্কের নগীব আরমানাযী ; L' Islam et le droit international, থিসিস, প্যারিস, ১৯২৯।

(খ) ঐ পরিবর্ধিত আরবী সংস্করণ, আশশর উদ্দৌলা ফিল ইসলাম —নজীব আরমিনাযী দিমাস্ক, ১৯৩০।

(গ) সাবা, L' Islam et la Nationalite, থিসিস, প্যারিস, ১৯৩৩।

(ঘ) তেহরানের এম. চাইগান, Essai sur l' histoire du droit public থিসিস, প্যারিস, ১৯৩৮।

(ঙ) Die Neutralitat in islamischen Volkerrecht, থিসিস, বন, ১৯৩৩ (প্রকাশিত ১৯৩৫)।

(চ) আবুল আলা মাওদুদী, জিহাদ ফিল ইসলাম, দিল্লীর হিন্দুস্থানী দ্বিপাক্ষিক 'আল জমায়েতে' পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বলিত, আজমগড়, ১৩৪৮ হিঃ।

(ছ) আহমদ রশীদ, পূর্বে উল্লেখিত, ১৯৩৭।

(জ) বর্তমান রচনার কাজ শুরু হয় ১৯২৯ সালে, শেষ হয় ১৯৩৩ এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে।

(৫৭) জিহাদের আধুনিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য রচনাবলী পরিশিষ্টে সাধারণ গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করা হবে। আবদুর রহীম তাঁর Princples of Mohammadan Jurisprudence (কলিকাতা, ১৯১১, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর বেশ কিছু তীক্ষ্ম মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ের উপর কোন বিশেষ পুস্তক রচনা করার মত সময় ও সুযোগ তাঁর কখনো ঘটেনি।

বিভিন্ন সালিশীর রায় (Awards of Arbitrators and Referees) ঃ

(৫৮) 'arbitration', 'mediation', 'reference' অর্থাৎ 'আপোষ-নিষ্পত্তি', 'সালিশী' এবং 'মধ্যস্থতা' প্রভৃতি পরিভাষা দ্বারা দুটি বিবদমান দল তৃতীয় এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তির রায়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে সম্মত বুঝায়। কেবল আভ্যন্তরীণ নয়, আন্তর্জাতিক বিবাদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের মামলার নজীর মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। এ সকল বিভিন্ন পরিভাষার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে (২৯৮-৯ দ্রষ্টব্য)। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ ধরনের রায় সব সময়ই কার্যকরী নজীর

হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সাধারণত অনুরূপ মামলার উদ্ভব হলে উল্লেখ করা হয়। এ সকল রায় যদি মূলনীতি সম্বলিত হয় সেক্ষেত্রে এগুলো অধিকতর কার্যকরী নজীর হিসেবে বিবেচিত হয়।

চুক্তি ও প্রচলিত রীতি (Treaties and Conventions) ঃ

(৫৯) আন্তর্জাতিক আইনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল চুক্তি। এ সকল চুক্তি কখনো দ্বিপাক্ষিক এবং কখনো বহু দলভিত্তিক হয় এবং ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেবল চুক্তিবদ্ধ দলগুলোই চুক্তির বাধ্য-বাধকতার আওতাভুক্ত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু এখানে এ কথাও উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সব দেশ[২৪] এককভাবে কোন একটি চুক্তিকে মেনে চলেছে এমন কোন নজীর ইসলামের ইতিহাসে নেই। এর কারণ খুঁজে বের করা দুষ্কর নয়। যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং বিদেশীদের উপর বিধি-নিষেধ প্রভৃতি তৎকালে এত উন্নত ছিল না।

(৬০) চুক্তি সম্পর্কে মুসলিম আইনে কয়েকটি সর্বস্বীকৃত বিধি রয়েছে যা চিরন্তন ও বাধ্যতামূলক। অপরিহার্য প্রয়োজন অথবা অত্যধিক চাপে না পড়লে এসব বিধি কোন অবস্থাতেই লংঘনীয় নয়। "কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না।"[২৫] ইহাই পুনঃ পুনঃ বিবৃত কোরানিক বিধান। সেজন্যই প্রবাদ রয়েছে, প্রয়োজনে নিষিদ্ধও হালাল।[২৬] পুনরায়, মুসলিম আইনে অনেক বিধি রয়েছে যা বাধ্যতামূলক নয় অথচ এদের পালন প্রশংসনীয় (মুসতাহাব) বলে গণ্য। তৃতীয়ত, এমন অনেক বিধি আছে যা পালন করা বা না করা ব্যক্তির ইচ্ছার (মুবাহ) উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

(৬১) কেবল শেষোক্ত ঐচ্ছিক কার্যকলাপের ব্যাপারে প্রথা ও চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে মুসলিম আইনে বৈধ বলে গণ্য করা হয়। উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যদি মুসলিম ধর্মীয় আইন সরীয়া বিরোধী কোন চুক্তি প্রয়োজনের চাপে সম্পাদিত হয়, সে চুক্তি ততক্ষণ বলবৎ থাকে যতক্ষণ সে প্রয়োজন বর্তমান। চুক্তি-বাতিল সম্পর্কিত বিধিসমূহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

(৬২) লক্ষ্য করার বিষয় যে, চুক্তিসমূহ সময় সময় সংশ্লিষ্ট দলসমূহের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ এবং ইচ্ছাকৃত আইন-প্রণয়ন বিশেষ; অন্যান্য সময় এ সকল আন্তর্জাতিক অর্থে আইন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সরকারী নির্দেশাবলী ঃ

(৬৩) সৈন্যাধ্যক্ষ, নৌ-সেনাপতি, রাষ্ট্রদূত, প্রতিনিধি, সংক্ষেপে বলতে গেলে রাষ্ট্রের যে সমস্ত কর্মচারীর কিছু না কিছু সম্পর্ক আন্ত-র্জাতিক ব্যাপারে রয়েছে, এদের প্রতি প্রদত্ত সরকারী নির্দেশসমূহে পরবর্তী উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। এসকল প্রকাশ্যেও হতে পারে অথবা গোপনীয়তার সাথে প্রেরিত ও রক্ষিত হতে পারে। এদের মধ্যে প্রায়ই আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। নবীর আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এ ব্যবস্থা চালু দেখতে পাই। এ ধরনের নির্দেশাবলী সম্বলিত প্রতিরূপ দলিলসমূহের কতক পরিশিষ্ট দেওয়া হবে।

ব্যতিহার (Reciprocity) ঃ

(৬৪) অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্যতিহারও সরকারী নির্দেশসমূহ কর্তৃক মুসলিম আইনের বৈধ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য এ পুস্তকের ২৫৫ অনুচ্ছেদ ও সরখসীর, সীয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তরীণ আইন-প্রণয়ন ও একতরফা ঘোষণাসমূহ ঃ

(৬৫) যদিও এক অর্থে গোটা আন্তর্জাতিক আইন আভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন ও দেশীয় আইনের সাধারণ বিধিসমূহ এবং বিশেষ রাষ্ট্র অথবা বিশেষ শ্রেণীর বিদেশীদের সংক্রান্ত বিশেষ বিধিসমূহের মধ্যে পার্থক্য করা। পুনরায়, পরস্পর সম্পর্কিত ও একটির স্থলে অন্যটি প্রযোজ্য বিধিসমূহের মধ্যে এবং যে সমস্ত বিধিসমূহের অনুরূপ বিধি নেই এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শেষোক্ত বিষয়টির উদাহরণার্থে নবীর আদেশ—অমুসলিমদেরকে আরব[২৭] থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে যাতে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করতে না পারে, এবং কোরানিক নির্দেশ—অমুসলিমরা মূর্তি পূজার[২৮] উদ্দেশ্যে কারাগৃহে[২৯] প্রবেশ করতে পারবে না, আমরা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথা ও রীতি (Custom and Usage) ঃ

(৬৬) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথা, রীতি, দেশাচার এবং অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলিম আইনে এ পর্যন্ত খুবই অল্প লেখা হয়েছে যদিও 'ওরফ', 'আদা', 'তায়মুল' এবং 'ওমুমুল বালাবী' প্রভৃতির বৈধতা মুসলিম আইন শাস্ত্রে স্বীকৃত এবং এ সম্পর্কে বিশেষ কোন বিতর্ক নেই। অবশ্য, অসাবধানভাবে কথা বলার দোষে অনেক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। 'আপনার জীবদ্দশায় আপনার সমস্ত আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু ঘটবে' এবং 'আপনি আপনার সমস্ত আত্মীয় স্বজনের চেয়ে দীর্ঘায়ু হবেন' এ দুটি বলার ধরনের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়, কেননা প্রচলিত গল্প অনুসারে বলার এ পার্থক্যের জন্য একজন জ্যোতীষের ভাগ্যে জুটেছিল লাঞ্ছনা এবং অপরজন লাভ করেছিল ঐশ্বর্য ও রাজ অনুগ্রহ।[৩০] এসব মানবিক দুর্বলতার প্রতি চরম উপেক্ষা দ্বারা আমাদের ক্ষতি বৈ কোন লাভ নেই। উদাহরণ স্বরূপ, আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, মুসলিম আইন রোমান আইন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এ ধরনের উক্তি অসন্তোষ সৃষ্টি করতে বাধ্য। ইহুদীবংশোদ্ভূত একজন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিশারদ মুসলিম আইনের প্রভাব অস্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন ইহুদী আইন মুসলিম আইনকে প্রভাবিত করেছে। নবীর আমলে মদীনায় ইহুদীদের অবস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর এ মতের পোষকতা করেন। এ ধরনের অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সঙ্কীর্ণতার দোষে দুষ্ট হওয়ায় এরা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন না।

(৬৭) প্রশ্নটির বিস্তারিত আলোচনার যথার্থ ক্ষেত্র এটি নয়।[৩১] তথাপি আমাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে যদি পরিষ্কার করে না বলি যে, প্রথাকে কেন সাধারণ মুসলিম আইন এবং বিশেষভাবে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

(৬৮) কুরআন বার বার নির্দেশ দেয়, মা'রুফ অর্থাৎ সর্বজনস্বীকৃত ভালকে অনুসরণ করতে এবং মুনকার অর্থাৎ সর্বজনস্বীকৃত মন্দ থেকে বিরত থাকতে। প্রথার ব্যাপারেও ইহা প্রযোজ্য।

(৬৯) মুসলিম আইনের দ্বিতীয় উৎসে আমরা দেখেছি যে, সাহাবীদের যে সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি নবীর মৌন সম্মতি ছিল সেসব বৈধ ও আইনসঙ্গত বলে গৃহীত হয়েছে। এ 'মৌন সম্মতিই' (মুসলিম আইনে তাকরীর বলে অভিহিত) নতুন পুরাতন নির্বিশেষে প্রথাকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীকালীন প্রবাহসমূহ[৩২] (যা নিষিদ্ধ নয় তা হালাল)[৩৩] এবং (প্রথা অথবা প্রচলিত বিধি চূড়ান্ত) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বিশেষ গুণসমৃদ্ধ প্রথা ও রীতি বিশ্বাসীদের আচরণ বিধির বৈধ উৎস।

(৭০) যাহোক, মুসলমানদের আইন ও মুসলিম আইনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা আমাদের ঠিক হবে না। প্রথমটি দ্বারা আমি বুঝি সে সমস্ত আইনসমূহ যা বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন অংশবিশেষ পালন করে থাকে, উদাহরণস্বরূপ, মালয় উপদ্বীপ, উত্তর আফ্রিকার বারবার দেশ, পাকিস্তানের পাঞ্জাব, ভারতের বোম্বাই ও মালাবর অঞ্চল প্রভৃতির মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত উত্তরাধিকার বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রথাসমূহ। কুরআন ও সুন্নাহে বিবৃত মূলনীতির সাথে উপরোক্ত প্রথাসমূহের যথেষ্ট অমিল আছে।

(৭১) যথার্থ মুসলিম আইন সম্পর্কে আমরা জানি যে. সর্বদা বিদেশে ভ্রমণরত পৌত্তলিক আরব ব্যবসায়ী দ্বারা পূর্ণ মক্কা নগরীতে ইসলামের সূত্রপাত হয়। নবীর হিজরতের পর মদিনা কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সেখানেও হাজার হাজার ইহুদী বাস করত। হিজরতের পর এক দশক পূর্ণ না হতেই মুসলিম রাষ্ট্রের সীমা পারস্য ও বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে যায়। এরও দেড় দশক পরে ২৭ হিজরীতে[৩৪] আমরা মুসলিম সেনাদলকে দেখি এমন কি স্পেনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করতে যতক্ষণ না তারীক বহুকাল পরে এসে স্পেন বিজয় সম্পন্ন করেন। অতিকায় অর্ধচন্দ্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্র তখন বিস্তার লাভ করেছে তুর্কীস্থান, আর্মেনীয়, পারস্য, মেসোপোটোমিয়া, সিরিয়া, আরব, মিশর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত উপকূলবর্তী দেশ ছাড়িয়ে ইউরোপের পায়ারনীস হতে সুদূর চীন পর্বতমালা পর্যন্ত। এভাবে ইসলাম মক্কা ও অন্যান্য আরববাসী,

ইহুদী, গ্রীক, স্পেনীয়, পারসিক, তুর্কীস্থানের বৌদ্ধ ও সিনাকিয়াই-এর চীনাদের সংস্পর্শে আসে। ইসলাম তৎকালীন যে সমস্ত সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এদের মধ্যে অনেককে নবধর্মে দীক্ষিত করেন তন্মধ্যে এগুলো কয়েকখান মাত্র। ইতিহাস উল্লেখ করে থাকে যে, প্রাক-ইসলামী যুগের তীর্থ যাত্রা ও ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের এক স্তম্ভ বলে গণ্য 'হজ্বের' মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না; পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিম রাষ্ট্রের আওতাধীন হবার পর খলিফা ওমর[৩৫] পারস্য রাজস্ব আইন হুবহু গ্রহণ করেছিলেন; মুসলিম আইনবেত্তাদের বিরাট সংখ্যা বোখারা, তুর্কীস্তান এবং বৌদ্ধ ও চীনা প্রভাবিত এলাকার লোক; নবীর সাহাবীদের শিষ্যগণ ও শিষ্যদের অনুসারিগণ, আবু হানিফা, আবদুল মালিক, সাফী, ইবনে হাম্বল ও অন্যান্যদের শিক্ষকগণ সাধারণত অনআরব বংশোদ্ভূত 'মাওয়ালী' ছিলেন এবং খুবই স্বাভাবিক যে এদের দেশে এমন কি পরিবারে প্রচলিত প্রাক-ইসলাম যুগীয় রীতি নীতি সম্বন্ধে এরা যা জানতেন তা ভুলে যাননি; আবু হানিফার বাবা পারসিক ও মাতা ভারতীয় ছিলেন; হজরত মুসা, ঈসা, ইব্রাহীম ও অন্যান্য নবীদের আইন অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ কুরআনে[৩৬] রয়েছে এবং যেসব ব্যাপারে মুসলিম আইনে স্পষ্ট নির্দেশ নেই সেসব ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃষ্টানদের রীতি নীতি অনুসরণ করার জন্য নবী আদেশ দিয়েছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য হাদীস[৩৭] রয়েছে; প্রাক-ইসলাম যুগের বহু প্রথা নবী কর্তৃক কেবল অনুমোদিতই হয়নি বরং অন্ধকার যুগের সদগুণাবলী মুসলমানদের জন্য পালনীয় বলেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম আইনে বাইজেণ্টাইন, পারসিক ও অন্যান্য আইনবিধির প্রবেশ কোন ধর্মীয় অনুমোদন ক্রমে নয় বরং সুবিধার্থে এবং এগুলো ইতিবাচক মুসলিম আইনের অনুশাসন বিরোধী নয় বলে। মুফতিগণ কর্তৃক মুসলিম বিজিত দেশের প্রথা ও রীতির অনুমোদন এবং বেসরকারী আইনবেত্তাগণ[৩৯] কর্তৃক মুসলিম আইন লিপিবদ্ধ করা সংক্রান্ত কার্যকলাপের মধ্যে এদের অনুপ্রবেশের কারণ বহুল পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায়।

(৭২) এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বহু প্রাচীন প্রথা, রীতি

এবং আচার ব্যবহার ইসলাম কর্তৃক সংশোধিত অথবা এমন কি লোপ পাওয়া সত্ত্বেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এদের এক বিরাট অবশিষ্টাংশের মুসলিম আইনের উৎস[৪০] হিসেবে বেশ অবদান রয়েছে। (এ প্রসঙ্গে Journal of Hyderabad Academy, ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত 'মুসলিম আইনের উপর রোমান আইনের প্রভাব' শীর্ষক আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

উপসংহার ঃ

(৭৩) এক্ষণে এই প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহ্-এর প্রাসঙ্গিক অংশাবলী মুসলমানদের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থায়ী ইতিবাচক আইনে পরিণত হয়; রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়ন ও চুক্তি বাধ্যবাধকতা অস্থায়ী ইতিবাচক আইনের প্রতিষ্ঠা করে; এবং বাকী সব যথাক্রমে নেতিবাচক অথবা মামলা উদ্ভূত আইন (Case-law) এবং প্রস্তাবিত আইন (Suggested law) প্রণয়নে সহায়তা করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

টীকা ঃ

১। জন ম্যাকডোনেল কর্তৃক লিখিত সি. ফিলিপন এর "International Law and Custom of Ancient Greece and Rome"-এর পরিচিতি।

২। Sources of Muslim Law, Effect of Treaties ইত্যাদি।

৩। সদরুস শরীয়া পৃঃ ৯।

৪। মুসলিমুস ছাবুত, পৃঃ ৫।

৫। তাফতাজানী পৃঃ ১৭৩-৯৬, যে কোন উসুলে ফিকার হুসন ওয়া কব্‌হ (ভাল-মন্দ) অধ্যায়। ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ডের Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory (নিউয়র্ক) পৃষ্ঠা ৭৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। তুলনীয় তাওয়ালীউল তাসীম ইবনে হাযর, পৃঃ ৭৮ (কায়রো সংস্করণ, ১৩০১)। জায়েদ ইবনে আলী (মৃত্যু ১২০ হিঃ) তাঁর ফিকাহ গ্রন্থ আল মাযমুয়া-এ একই পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ গ্রন্থের রচয়িতা যদি তিনিই হয়ে থাকেন অগ্রাধিকার তাঁরই পাওয়া উচিত।

২। তাঁর অন্য একজন সমসাময়িক ঈমাম মালিকের নামেও কিতাবুস্‌সীয়ার-এর উল্লেখ করা হয়। তুলনীয় ইয়াজ, তারতীব আলখুলী কর্তৃক উল্লেখিত, পৃঃ ৭৬০ দ্রষ্টব্য।

৩। আলমাবসুত সরখসী, দশম খণ্ড, পৃঃ ২।

৪। আলমুহীত রাজীউদ্দীন সরখসী, প্রথম খণ্ড।

৫। এ পরিভাষার তত্ত্বমূলক আলোচনার জন্য আমার নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। শরহে তওহীদ্, পৃঃ ২১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। মুসলীম্‌স ছাবওয়াত, পৃষ্ঠা ১০।

২। কুরআন, সূরা ২ আয়াত ২০০-২০২।

৩। কুরআন, সূরা ২৮ আয়াত ৭৭।

৪। কুরআন, সূরা ৭ আয়াত ৩২।

৫। সরখসী, সিয়ারুল করীব, ১ম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

৬। কুরআন, সূরা ২, আয়াত ২৫৬।

৭। কুরআন, সূরা ৫, আয়াত ২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। কুরআন অনুযায়ী (সূরা নজম, আয়াত, ৩-৪) নবীর সকল উক্তি ঐশী জ্ঞানভিত্তিক। তথাপি তাঁর সব উক্তিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঠ করার নির্দেশ তিনি দেননি। এজন্য পঠিতব্য ও অপঠিতব্যের মধ্যে ভেদ-রেখা টানার প্রয়োজন।

২। মসনদে ইবনে হাম্বাল, প্রথম খণ্ড, ৬৯ ; এ প্রসঙ্গে কানজুল উম্মাল, প্রথম খণ্ড, নং ৪৭৮তে তিরমিজী ও নাসায়ীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

৩। কানজুল উম্মাল, (প্রথম খণ্ড, ৪৭৫৯তে) বুখারী, তিরমিজী, নাসায়ী এবং অন্যান্যদের উদ্ধৃতি রয়েছে।

৪। ইবনে হিশাম, ১০১৪-১৫ ; কাশফুল আছরার, আবদুল আজীজ বুখারী প্রণীত (পাজদাবীর মন্তব্য), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮।

[আল-হাসান বলেনঃ নবী অনেক সময় কুরআনের কিছু কিছু আয়াত (অহী মারফৎ) প্রাপ্তির পর ভুলে যেতেন যেন এমন কোন আয়াত নাজেল হয়নি এবং সেহেতু আল্লাহ্‌র

ইঙ্গিতেই এসব তাঁর মন থেকে মুছে যেত। নবীর জীবদ্দশায় কুরআনের ব্যাপারে ইহা অনুমোদিত ছিল।]

৫। ইবনে হিশাম, সিরাত রসূলুল্লাহ্, পৃঃ ২২৬—ইবনে সাদ, ৩/১, পৃঃ ১৯২।

৬। ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ১১২-১৩ ; বুখারী, পরিচ্ছেদ, ফাদাইলুল কুরআন, কুররা।

৭। একমাত্র খলিফা ওমর প্রেরিত সেনাদলে এদের সংখ্যা একবার তিনশতে দাঁড়িয়েছিল (কানজুল উম্মাল, প্রথম খণ্ড; ৪০৩০ দ্রষ্টব্য)।

৮। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনে জানযুল উদ্ধৃতি সম্বলিত কানজুল উম্মাল, প্রথম খণ্ড, ৪০৩০ দ্রষ্টব্য।

৯। ইবনে সাদ, কানজুল উম্মাল, প্রথম খণ্ড, ৪৭৬৪তে উদ্ধৃত। বুখারী পরিচ্ছেদ, ফাদাইলুল কুরআন, জাম-উল-কুরআন।

১০। বুখারী, ঐ, ৯৩ ঃ ৩৭ ; ৭৫ ঃ ৩৩ (৩) ; ইবনে সাদ, কানজুল উম্মাল, প্রথম খণ্ড, ৪৭৭২, ৪৮০১, ৪৮০২তে উদ্ধৃত।

১১। বুখারী, ৬৬ ঃ ৩ ; ৯৩ ঃ ৩৭।

১২। কাসাতাল্লানী, প্রথম খণ্ড, ৪০৬।

১৩। বুখারী, ৬৬ ঃ ৩—কানকুল উম্মাল, প্রথম খণ্ড, ৪৭৯৯।

১৪। কুরআন, সুরা নজম, ৩-৪ ; সুরা আহযাব, ২১ ; সুরা হাশর, ৭ ; সুরা ২৪, ৬৩ ; সুরা নিসা, ১৫০-১৫২ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৫। বুখারী, ৫৬ ঃ ১৮১, নং ১।

১৬। দ্রষ্টব্য ঃ আল-ওছায়েকুস সিয়াসিয়াহ এবং লেখকের Corpus des Traites et Lettres diplomatiques de l' Islam সাবাহীদের আমল থেকেই সংগ্রহ শুরু হয়। দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামিক রিভিউ, অকিং, মে, ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হাদীস সংকলনের উপর লিখিত লেখকের প্রবন্ধ ; এবং সাহিফাহ হাম্মাম ইবনে মনাব্বিহ'র Earliest Extant Work on the Hadith, বিশেষ করে ভূমিকা।

১৭। কাশফুল আসরার আলা উছুলিল বযদবী লিল বুখারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬১।

১৮। ঐ, পৃঃ ২৬২।

১৯। সূরা আল-ইমরান, ১৫৯ ; সূরা যখরূফ, ৩৮ ; সূরা মুহাম্মদ, ২১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২০। কিতাবুল মাযমু শিরোনামায় প্রকাশিত, মিলান, ১৯১৯। ব্রোকল্‌মান তাঁর G.A.L. তে মুয়াত্তা অনুরূপ আল আমিরী (মৃত্যু ১২০ হিঃ) কৃত একটি ফিকাহ্-হাদীস গ্রন্থের উল্লেখ করেন। কিন্তু খাস্তীবের 'তারীখ বাগদাদ' অনুযায়ী তিনি প্রকৃতপক্ষে ১৫৯ হিঃ ইন্তিকাল করেন ; আব্দুল মালিকের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক হিসেবে তাঁর পক্ষেই প্রথম সংকলন করা স্বাভাবিক ; কিন্তু তাঁর কোন গ্রন্থ আমাদের কাছে নেই।

২১। 'ফতোয়াই হিন্দিয়া' হিসেবেও পরিচিত।

২২। (১) জামিউল মাসানীদিল ইমামিল আজম—আবু মুয়াইয়িদ মুহাম্মদ বিন মাহমুদ খাওয়ারযেমী (প্রথম খণ্ড, ৩২-৩৩) (২) সিরতে নুমান—শিবলী (৩) ইমাম আবু হানীফা কি তদবীন কানুনে ইসলামী—হামিদুল্লাহ্ (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৯)।

২৩। "L' Islam et le droit des gens," আহমদ রশীদ (Recveil des Cours, Academie de droit international, হেগ, ১৯৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮)।

২৪। আধুনিক কালেও বিশ্ব চুক্তির নজীর খুব অল্পই আছে, যেমন বার্নের ডাক সম্মেলন ; মুসলিম রাষ্ট্রসমূহও একেই মেনে চলে।

২৫। কুরআন, সূরা ফাতিহা, ১৭৩, সূরা মায়িদা, ৩, সূরা আন-আম, ১২০, ১৪৬, সূরা ১৬, ১১৫।

২৬। সরখসী, সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৯।

২৭। বুখারী, ৫৫ঃ১৭৬ ; ৫৮ঃ৬ ; ৬৪ঃ৮৩—মুসলিম পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৫—ইবনে হাম্বাল, প্রথম খণ্ড, ২২২—ইবনে সা'দ, ৪৪।

২৮। কুরআন, সূরা তওবা, ২৮।

২৯। এ সম্পর্কে সরখসীর বক্তব্য স্পষ্ট (সিয়ারুল কবীর, প্রথম খণ্ড, ৯৩ অথবা ১৩১) এবং তিনি বলেনঃ মূর্তি পূজা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাবা গৃহে প্রবেশে অমুসলমানদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

৩০। ঐ, তৃতীয় খণ্ড, ২৩৩।

৩১। দ্রষ্টব্যঃ ইসলামিক কালচার, জানুয়ারী, ১৯৩৯, পৃঃ ১২৫-২৬ এ প্রকাশিত লেখকের এক বক্তৃতার বিবরণী ; Hyderabad Academy studies নং ৬, ১৯৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুসলিম আইনের উপর রোমান আইনের প্রভাব' শীর্ষক লেখকের প্রবন্ধ ; C.A. Nallonio, Raccolta di Scritti, চতুর্থ খণ্ড, ৮৫ পৃঃ ; G.H. Bousquet, 'Mystere be la formation et des origines du Fiqh, Revue Algerienne, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সংখ্যা।

৩২। কুরআন, সূরা নিসা, ২৪, সূরা আনয়াম, ১১৯ঃ "উল্লেখিত নারিগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল।" "যাহা তোমাদিগের জন্য নিষিদ্ধ তাহা তিনি বিশদভাবেই তোমাদিগের নিকট বিবৃত করিয়াছেন।"

৩৩। এ সম্পর্কে সায়েবানীর লেখা থেকে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়ঃ) সিয়ারুল কবীর, প্রথম খণ্ড, ১৯৪) ; প্রথাগত প্রমাণ আইন-বিধির সমমর্যাদাসম্পন্ন, (ঐ, চতুর্থ খণ্ড, ২৩-৫)ঃ প্রথাগত জ্ঞান আইন-বিধান সমতুল্য। (ঐ, চতুর্থ খণ্ড, ১৬) ; প্রথাগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সাধারণকে বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করা যায়। (ঐ, প্রথম খণ্ড, ১৯৮) ; যেখানে আইনগত স্পষ্ট বিরোধ নেই সে স্থলে প্রথাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৬) ; সাধারণ আইনকে বিশেষ করণের ক্ষেত্রে রীতি বৈধ বলে গণ্য।

৩৪। তাবারী, Annales, প্রথম খণ্ড, ২৮১৬-৭ ; ইবনুল আছির, কামিল, তৃতীয় খণ্ড, ৭২ ; আবুল ফিদা, প্রথম খণ্ড, ২৬২ ;

জাহাবী, আল তারিখুল কবীর ; গীবন, Decline and Fall, পঞ্চম খণ্ড, ৫৫৫ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) ; বালাজুরী; ফুতুহ্, পৃঃ ৪০৮ ; ইবনে কাছির, বিদায়া, সপ্তম খণ্ড, ১৭০ ; হামিদুল্লাহ, আল-ওছায়েকুস সিয়াসিয়াহ, নং ৩৭১।

৩৫। তাবারী, তারীখ (ইউরোপীয় সংস্করণ), প্রথম খণ্ড, ৯৬২-৩।

৩৬। কুরআন, সূরা আনয়াম, ৮৪—৯১ ("সুতরাং তুমি তাহাদিগের পথ অনুসরণ কর") ; সূরা আল ইমরান, ৯৫, সূরা ১৬, ১২৩ ("সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।")

৩৭। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চুল আঁচড়ানোর সম্পর্কে বুখারী, ৭৭ ঃ ৭০।

৩৮। ইবনে হাম্বাল, মসনদ, তৃতীয় খণ্ড, ৪২৫।

৩৯। দ্রষ্টব্য ঃ লেখকের গ্রন্থ ইমাম আবু হানীফা কি তদবীন কানুনে ইসলামী এবং 'Codification of Muslim Law by Abu Hanifah,' Islamic Review, Woking, ৪৭তম খণ্ড, এপ্রিল, ১৯৫৭ সংখ্যা।

৪০। দ্রষ্টব্য ঃ ইবনে হাবীব প্রণীত আলমাহবার (হায়দারাবাদ সংস্করণ, ১৩৬১ হিঃ, পৃঃ ৩০৯-৪০)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(৭৪) আইন বলতে আমরা সেসব বিধিসমূহকে বুঝি যা একটি রাষ্ট্রের সরকার এর গোটা প্রশাসন (gubernatorium) এবং নাগরিকদের পরিচালনার জন্য প্রণয়ন অথবা অনুমোদন করে। এভাবে বৈদেশিক সম্পর্কের সহিত জড়িত প্রশাসন বিধিসমূহ আন্তর্জাতিক আইনে রূপান্তরিত হয়। নিম্নোক্ত আইনের বিভাগকরণ থেকে এ বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে বলে আমরা আশা করি ঃ
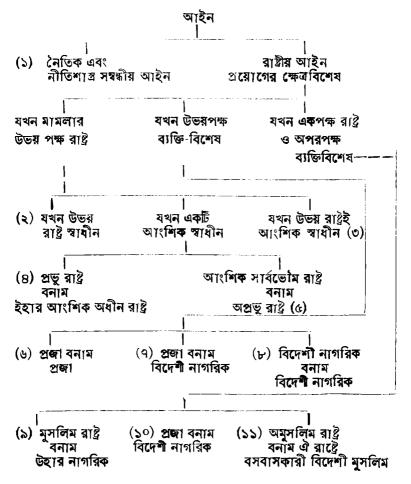
(৭৫) আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপারে এক নম্বরের সংগে আমাদের সরাসরি সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে, দুই, তিন, চার এবং পাঁচ নম্বরের অন্তর্ভুক্ত আন্তঃসরকারী সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী আইন। দশ ও এগারো নম্বরসহ এ সকলই সর্বজাতীয় আন্তর্জাতিক আইন গঠন করে। সাত ও আট নম্বর জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত। ছয় ও নয় নম্বর সঙ্কীর্ণ অর্থে দেশীয় আইনকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন হতে স্বতন্ত্র হিসেবে দেশীয় আইন ; আদালত আইন (Civil law) এবং পৌর আইন বলেও অভিহিত হয়। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে একে আভ্যন্তরীণ আইন বলে উল্লেখ করলে যুক্তিসঙ্গত হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মানব সমাজের আন্তর্জাতিকরণে ইসলামের অবদান

(৭৬) মানব সমাজের জটিলতা মানব প্রকৃতির প্রতিফলনই বটে। পরস্পরবিরোধী উপাদান অথবা যথার্থভাবে বলতে গেলে, একই সঙ্গে ভাল-মন্দ উভয়েরই সংমিশ্রণ মানুষ। সময় সময় বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ফিরিশতাকেও ছাড়িয়ে যায়, আবার অন্য সময় সেই মানুষের কার্যকলাপে শয়তানও লজ্জায় বিব্রত বোধ করে। ফলত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি প্রবণতা একই সঙ্গে মানব সমাজে লক্ষ্যণীয়। একটি কেন্দ্রমুখী অর্থাৎ স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবার থেকে প্রজাতি, উপজাতি থেকে নগর-রাষ্ট্রের নাগরিক ; নগর-রাষ্ট্র থেকে বৃহৎ রাষ্ট্র। সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রমণ্ডল এবং এমনকি বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা—একেই মানব সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতময় ইতিহাসের একটি দিক বলা হয়ে থাকে। অন্যটি কেন্দ্রবিমুখ অর্থাৎ মানুষ এক ও অভিন্ন আদম-হাওয়া'[১] পরিবারের সভ্য ও বংশধর হওয়া সত্ত্বেও বর্ণ, ভাষা, দেশ, গোত্র প্রভৃতির পার্থক্য প্রভেদকে এত প্রকট করে তুলেছে যে অবিরাম রক্তপাতও ভ্রাতৃঘাতী মানবসমাজকে কলঙ্ক সচেতন করতে ব্যর্থকাম হয়েছে।

(৭৭) মানব প্রকৃতিকে পরিবর্তন অথবা সাধারণ মানুষকে অতি অসাধারণ উগ্রপন্থীতে রূপান্তর করার ন্যায় অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়ে কোন লাভ নেই।

(৭৮) এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত মূল্যবান অবদান সত্ত্বেও প্রাচীনকালের সভ্য জাতিসমূহ ভৌগোলিক অথবা রাজনৈতিক জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়নি। এমনকি প্রাচীন ধর্মগুলিও সার্বিক এবং গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে না হয়ে বরং জাতিভিত্তিক ছিল বলে মনে হয়। তথাপি, এসব প্রাচীন জাতিভিত্তিক ধর্মগুলিও গোড়ার দিকে শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছিল। বর্ণ (Chromatic), বংশ ও জাতিগত প্রাধান্যবোধ যা এখনও আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার কোন কোন অংশে প্রবল, আমার মতে এ সমস্ত তাদের স্ব-ঘোষিত ধর্মীয় নির্দেশপ্রসূত নয়,বরং পৌত্তলিক ও ধর্মহীন লোকদের কার্যকলাপের ফল।

(৭৯) সৌভাগ্যবশত[২] ইসলাম শুরু থেকেই ভাষা, বর্ণ, দেশ ও জাতির পার্থক্য পরিহার করে বিশ্ববাসীদের জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

'বিশ্ববাসিগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হও।' (কুরআন, সূরা হুজুরাত—১০) 'এবং তোমরা সকলে আল্লাহের রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহকে স্মরণ কর ঃ তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।' (কুরআন, সূরা আল-ইমরান—১০৩)

'আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজদিগের মধ্যে বিবাদ করিবে না। করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদিগের

"বিশ্ববাসিগণ, ইহুদীগণ, সাবেয়ী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কেহ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করিলে এবং সৎকার্য করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না। (কুরআন, সূরা মায়িদা, ৬৯)

নবীর অসংখ্য হাদীস এবং চৌদ্দশ বছর ধরে ইসলামী ব্যবহারের দৃষ্টান্তসহ অন্যান্য বহু আয়াত বিশেষ করে সূরা আল ইমরানের ৬৪ আয়াত যা নবী বিদেশী শাসকদের প্রতি উল্লেখ করেন, একই কথার সমর্থন করে।

(৮৪) খ ও ঘ এর অন্তর্ভুক্ত কুরআনের উদ্ধৃতিসমূহের প্রতি আমি সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা ও বর্ণে মানুষের বৈসাদৃশ্য মহান স্রষ্টার সৃষ্টির নৈপুণ্যের অভিব্যক্তি পরিচায়ক বৈ আর কিছু নয়: এবং মানুষ একই দম্পতি হতে কেবল উদ্ভূত নয়, এমনকি তার ধর্মসমূহের উৎসও এক। (ঙ) এর অন্তর্ভুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ, যা দু'দুবার কুরআনে পুনরাবৃত্ত হয়েছে, বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এতে এই প্রমাণিত হয় যে কুরআনে উল্লেখিত ধর্মসমূহের অনুসারিগণ যদি তাদের মূল ধর্মের সমস্ত নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে অথবা পরবর্তীকালীন ধর্মের আংশিক পালন করে তবে তাদের মুক্তি সম্পর্কে কোন ভয় নেই, কেননা এসব নির্দেশাবলীর মধ্যে আসন্ন শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী রয়েছে। (নবী ইদ্রিসের আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণীর জন্যে নিউ টেষ্টামেণ্টে এপিসল অফ যোডা, ১৪—১৫ দ্রষ্টব্য। অনুরূপভাবে ইব্রাহীম সম্পর্কে জেনেসিস, ১৭—১৬—২০ : ইয়াকুব সম্পর্কে জেনেসিস ৪৯—১০ : মূসা সম্পর্কে ডিউটারোনোমি (Deuteronomy), ১৮—৮ : ৩৩—২ : দানিয়েল সম্পর্কে দানিয়েল (Daniel), ২—৩১—৩২ ; ৭, ১৩—১৪ : দায়ূদ সম্পর্কে সাম (psalm) ৪৫, ৩—১৮ ; ঈসাইয়া সম্পর্কে ইসাইয়া (Isaiah), ২১,৬—৭ ; ৪২,৯ ; ৪৩, ১,৬ : হাবকুক সম্পর্কে হাবাকুক, ৩, ৩ ; জনদি ব্যাপটিষ্ট অর্থাৎ নবী ইয়াহাডা সম্পর্কে জনের প্রত্যাদেশ (Revelation of John),) ২,২৬—২৯ ; ৬, ৪ ; ঈসার সম্পর্কে সেণ্টজনের সুসমাচার (Gospel of st. John) ১৪. ১৫—১৬ ; ১৫, ২৬—২৭ ; ১৬, ৭—১৬ এবং সেণ্ট মেথিউর সুসমাচার (Gospel of Matthew), ২১, ৩৪—৪১ ; জরাথুষ্ট্রের সম্পর্কে আভেস্তা

(Avesta), ইয়াস্ত ১৩,২৮, ১২৯ ; ব্রাহ্মণদের জন্য কল্কীপুরাণ এবং বৌদ্ধের আগমন সম্পর্কে মৈত্রী অর্থাৎ সকলের জন্য আশীর্বাদ দ্রষ্টব্য ।)

(৮৫) আন্তর্জাতিক আইন যদি জাতিতে জাতিতে ঐক্য সাধনে আগ্রহী না হয় তবে এর প্রয়োজন কি ?

(৮৬) হজ্জ

মানব জাতিতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রচলিত অর্থে ইসলাম জাতীয়তার গণ্ডি-বহির্ভূত। সুতরাং ইসলাম প্রচারিত বিশ্ববাসীদের ভ্রাতৃত্ব সত্যিকারভাবে আন্তর্জাতিক। এ ভ্রাতৃত্ববোধকে জোরদার করা এবং পৃথিবীব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হজ্জ ইসলামের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। হজ্জ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় পাঁচটি কর্তব্যের فرض عين অন্যতম। স্ত্রী পুরুষ 'নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে'[৩] বৎসরে অন্তত একবার আল্লাহের উদ্দেশ্যে মক্কার কাবাগৃহে হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। প্রাচীন পৃথিবী হিসেবে পরিচিত তিন মহাদেশের মাঝখানে আরবদেশ অবস্থিত। এভাবে মক্কা ভৌগলিক দিক দিয়েও প্রাচীন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল অথবা মুসলমানদের পরিভাষায় سرةالارض زمين ناف[৪] অর্থাৎ পৃথিবীর নাভিস্থল। মক্কায় হজ্জ পালনকালে হাজীকে সাধারণ পোষাক ত্যাগ করে এবং অনাড়ম্বর ইহরাম পরিধান করে সকল প্রকার ভোগবিলাস অথবা কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা হতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থেকে আত্মসংযমের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। হজ্জ ক্রিয়া সম্পাদনকালে ছোট বড় সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়াবার দৃশ্য শ্রদ্ধার উদ্রেক না করে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে একজনের কুরআনে বর্ণিত পুনরুত্থান দিবসের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক : বলা হইবে আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহেরই।'[৫] সত্যিকারের সার্বজনীন সমাবেশ ও মানুষের সম্পূর্ণ সাম্যের নিদর্শন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ হল ইসলামের বার্ষিক হজ্জের রূপ।[৬]

খিলাফত ঃ

(৮৭) ইসলামের আর একটি আন্তর্জাতিকরণ সহায়ক সংস্থা। নবীর ইন্তিকালের পর দু'তিনজন ব্যক্তিবিশেষ ছাড়া তৎকালীন মুসলমানদের সবাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সমস্ত মুসলমানদের জন্য কেবল একজন শাসক হতে পারে। যদিও অল্পকালের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্য আরবের বাইরে বহুদূর সম্প্রসারিত হয়েছিল, তবুও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐক্য এক শতাব্দীর উর্ধ্বে অক্ষুণ্ন ছিল। মুসলিম অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকই হোক না কেন পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানগণ মদিনা অথবা পরবর্তী কালের দামেস্কের খলিফাকে 'বিশ্বাসীদের নেতা' হিসেবে স্বীকার করত। উমাইয়া বংশের পতনের পর মুসলিম জগত প্রথমে দু'ভাগে এবং বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। তথাপি খিলাফত সম্পর্কিত ধারণা মুসলমানদের মন থেকে মুছে যায়নি। খিলাফতের জন্য একই সঙ্গে একাধিক মুসলিম শাসকের দাবী এ বক্তব্যের বিরোধিতার চেয়ে অধিক সমর্থন করে, কেননা তাদের প্রত্যেকেই গোটা বিশ্বমুসলিমের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করত।

(৮৮) নগণ্য ও অধুনা লুপ্তপ্রায় 'খারেজী' সম্প্রদায় ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে কারও একটি কেন্দ্রীয় খিলাফত সংস্থার বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে যে মতভেদ পরিলক্ষিত তাও নবীর ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কিত। খিলাফতে একমাত্র হজরত আলী ও তাঁর বংশধরদের ন্যায্য অধিকার ছিল যে ভাবেই হোক শিয়াদের নিকট এ এক বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে সুন্নীগণ বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ওসমানের হত্যার পর খলিফা পদে হজরত আলীর অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আবু বকর, ওমর, ওসমান একের পর এক সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নিযুক্ত হন এবং এমনকি হজরত আলী নিজেও তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি বরং অকপট চিত্তে তাঁর পূর্বসূরীদের কার্যে সহযোগিতা করেছেন।

(৮৯) যাহোক, এ ব্যাপারে একটি সহজ নিষ্পত্তির সুযোগ এখনও রয়েছে, যেহেতু এসব মহাপুরুষের কেউ আজ জীবিত নেই। একথা অনস্বীকার্য যে নবী যেমন বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক দিশারী তেমনি পার্থিব জগতেরও নেতা ছিলেন। একমাত্র সুফী তরীকার অন্যতম শাখা নকস্‌বন্দীয়া ছাড়া সুন্নীদের সবাই এ বিষয়ে প্রায় একমত যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আলীই নবীর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিলেন। পুনরায়, পার্থিব ক্ষমতার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কেও সবাই একমত। এমনকি সুন্নীরাও বিশ্বাস করে না যে সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা পদে নিযুক্ত হওয়া ছাড়া খিলাফতের প্রতি আবু বকরের অন্য কোন অধিকার ছিল। সুতরাং, নবী আলীকে তাঁর আশু পার্থিব উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নের সত্যতা যাচাই করলেই এ বিবাদ মিটে যায়। স্পষ্টত আজ তেরশত বছর পর এর কোন বাস্তব গুরুত্ব নেই এবং আলোচ্য ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর বহু কিছু ঘটে গেছে। শিয়াগণ কর্তৃক আলী রসুলুল্লাহের ওয়াসী وصی رسول الله বলে অভিহিত হলেও সুন্নীগণ কিছু মনে করে না, কেননা আইনের দিক দিয়ে নির্বাহক ও উত্তরাধিকারী এক পর্যায়ভুক্ত নয়।

(৯০) ক্ষমতাসীন খলিফা কর্তৃক উত্তরাধিকারী খলিফার মনোনয়ন, অন্যথায় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্তির রেওয়াজ শিয়া ও সুন্নী উভয়ের মধ্যে সর্বদাই প্রচলিত ছিল।

টীকা

১। জাতিতত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব ঐক্য সম্পর্কিত আলোচনার জন্য ও, এরেনফেল (O. Ehrenfels), 'Ethnology and Islamic sciences' (Islamic culture. ১৯৪০, পৃঃ ৪০৪) দ্রষ্টব্য।

২। হায়দারাবাদ একাডেমী জারনাল এ প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্যঃ بعثت نبوی کے وقت کی چند عالمگیر کنهان اور ان کا اسلامی حل—"رسول اکرم سیاسی زندگی' গ্রন্থে পুনপ্রকাশিত।

৩। কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত ৯৭।

৪। ইয়াকুত, মুযাম আল-বুলদান, والكعبة এ, যে, ভেনসিন্‌ক, (A. J. wensinck), "The Ideas of the western semites concerning the Navel of the Earth. "verhandelingen der koinklijke van witenschappen te Amsterdam, afdeeing letterkunde, আমষ্টারডেম, ১৯১৬, পৃঃ ২১, ৩৬, تاريخ الخميس لاديار بكرى পৃঃ ১, ৩৭, আল-হালাবী, প্রথম খণ্ড, ১৯৭, আল কিসায়ী, ফলিউ ১৪ বি, প্রমাণসাপেক্ষ।

৫। কুরআন, সূরা মুমিন, ১৬।

৬। 'হজ্ব' সম্পর্কিত লেখকের প্রবন্ধ, les pelerinages, ed. seuil, প্যারিস, ১৯৬০।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্ডেস্ কুই-এর মন্তব্য কিছুটা অশালীন বটে ঃ

সব জাতিরই আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে এমনকি ইরোকুইদেরও (Iroquois), যারা বন্দীদের খেয়ে ফেলে। এরা পরস্পরের মধ্যে দূত আদান প্রদান করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি করার আইন কানুন জানে। একটিমাত্র গলদ দেখতে পাওয়া যায় যে এ আন্তর্জাতিক আইন সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(৯২) কিন্তু কোন্ জাতি এককালে আদিম এমনকি অসভ্য ছিল না? সভ্য জাতি হিসেবে বিভিন্ন জাতির অগ্রে ও বিলম্বে অভ্যুদয়ের কারণসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা এখানে আমি প্রয়োজন বোধ করি না। একথাও উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে মানুষ সৃষ্ট জীবের মধ্যে গ্রহণ ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ। তবুও একথা ভুললে চলবে না যে অনুরূপ পরিবেশেও মানুষ সাধারণত সমভাবে চিন্তা করে না। তাই এরূপ ধারণা করা নেহায়েতই অযৌক্তিক হবে যে প্রত্যেক জাতির চিন্তাধারার সব কিছুই পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে ধার করা।

(৯৩) অন্যান্য জাতির আন্তর্জাতিক আইনের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সমৃদ্ধি সাধনে তাদের অবদানসমূহের উল্লেখই যথেষ্ট। সুমেরীয়দের থেকে সূচিত বলে কথিত জ্ঞাত মানব ইতিহাস স্বভাবতই অস্পষ্ট। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকাবাসীদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা ছিল। সিরীয়দের নিজস্ব সম্পদের বদৌলতে অতীতের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার অধিকতর সুবিধা ছিল। অতএব, ভূমধ্যসাগর উপকুলবাসীদেরও বিশেষ সুবিধা ছিল। পরস্পর মেলামেশার ফলে তাদের মধ্যে কেবল পণ্যের আদান-প্রদানই নয়, ভাবের আদান-

প্রদান হত। মিশর, সিরিয়া, কার্থেজ, গ্রীস এবং রোমে ধারাবাহিকভাবে বড় বড় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এদেশগুলির সবই ভূমধ্যসাগর উপকূলে অবস্থিত। মিশরের দ্বিতীয় রামেসাস (মিসসট্রাস, খ্রীষ্টপূর্ব ১২৯২ হইতে ১২২৫ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন) এবং দক্ষিণ সিরিয়ার হিট্রিদের রাজা হিটাসের (বর্তমানে তুর্কী হাতাই) মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তিটি খুব সম্ভবত প্রাচীনতম মৌলিক কূটনৈতিক দলিল। উপরোক্ত দলিলটি হিট্টি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট একটি রৌপ্যফলক। এ চুক্তির উদ্দেশ্য কেবল মহাসীরিয় যুদ্ধের অবসান ঘটানো এবং উভয় দেশের দেবতাদের রক্ষণাবেক্ষণে দুই রাজার মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করাই ছিল না বরং চুক্তিবদ্ধ উভয় রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যজোট স্থাপন করা। দুই জাতির মধ্যে অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্য চলবে। এক দেশের পলাতক আসামী অন্য দেশে আশ্রয় নিলে আসামীকে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে, কিন্তু অনুরূপ প্রত্যার্পিত আসামীদিগকে বিশেষ প্রকারের কয়েকটি দণ্ড দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ফিনিশীয়গণ গ্রীকদের বর্ণমালার ন্যায় সভ্যতার প্রাথমিক উপাদান যুগিয়েছে। হিব্রু অথবা ইহুদিগণ আর এক সিরীয় প্যালেষ্টিনিয়ান অধিবাসী যারা হযরত মূসা ও ঐশী পেণ্টাটিউফের অনুসারী হিসেবে তাদের এক নিজস্ব আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। কিছু বিদেশী জাতির সাথে ইহুদীদের চরম শত্রুতা ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমেলেকাই (তৎকালে প্যালেষ্টাইনে বসবাসকারী আরব উপজাতিসমূহ)। এদের সংগে যে কোন প্রকারের শান্তির সম্পর্ক স্থাপনে ইহুদিগণ অনিচ্ছুক ছিল। এ সকল জাতির বিরুদ্ধে ইহুদিগণ যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হত তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বৃদ্ধ, নারী, বালক-বালিকা, এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও নির্বিচারে হত্যা করত (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাইবেল, স্যামুয়েল, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ১—৩)। যাহোক, অন্যান্য যে সমস্ত জাতির সাথে তাদের প্রকাশ্য শত্রুতা ছিল না তাদের বেলায় তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মেনে চলত। রাষ্ট্রদূতকে তারা অত্যন্ত পবিত্র বলে জ্ঞান করত এবং চুক্তিসমূহও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করত। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়

ইহুদী বাইবেল খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের মাধ্যমে পৃথিবীতে এর প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

(৯৪) এবার আমরা ইউরোপ প্রসঙ্গে আসছি। ফিনিসীয় কৃষ্টি দ্বারা গ্রীকগণ যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিল ; কিন্তু তাদের মনের সংকীর্ণতার দরুন তাদের তৈরী আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা মূলত গ্রীক উপদ্বীপের নগর রাষ্ট্রসমূহের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েছিল। গ্রীক ছাড়া সবাই বর্বর বলে অভিহিত হয় এবং এ্যারিষ্টোটলের মতে 'প্রকৃতি বর্বরদিগকে (গ্রীকদের) দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন।' প্ল্যাটো যদিও তাঁর দেশবাসীকে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সদয় হবার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু কখনো একথা বলেননি যে গ্রীক ছাড়া অন্য কেউ এ সদয় ব্যবহার পাবার উপযুক্ত। গ্রীক জাতিসমূহের (জাতিসমূহ বলতে এখানে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের বলা হয়েছে) সাধারণ আইন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়েছিল এবং এমনকি এ সকল নগর রাষ্ট্রের অধিকাংশের মধ্যে এক ধরনের জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ডেলফির এমফিক-টায়োনিক লীগের চুক্তি উপরোক্ত জাতিসংঘের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"আমরা কোন এমফিকটায়োনিক শহর ধ্বংস করব না এবং যুদ্ধ অথবা শান্তি কোন অবস্থাতেই তাকে প্রবহমান পানি হতে বিচ্ছিন্ন করব না। যদি কেউ তা করে আমরা তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং তার শহর ধ্বংস করব। যদি কেউ দেবতার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে অথবা যে এ সম্পর্কে জ্ঞাত অথবা যদি কেউ ডেলফিতে তার মন্দিরের সম্পদ আত্মসাতের পরামর্শ গ্রহণ করে তাহলে আমরা আমাদের হাত, পা, মুখ তথা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে শাস্তি দেব।"

(৯৫) গ্রীক আন্তর্জাতিক আইনের বিশদ গবেষণার জন্য সি, ফিলিপসনের The international law and custom of Ancient Greece and Rome (দুই খণ্ড) এবং এর মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী সহায়ক হবে।

(৯৬) রোম গ্রীসের উপর রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করলেও গ্রীকগণ অচিরেই বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের স্বীয় প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করেছিল। রোমানগণ তাদের নিজস্ব আইন রচনা করেছিল। 'ফেশাল'

নামে অভিহিত একটি পুরোহিত সভা তারা গঠন করে। যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, বন্ধুত্ব অথবা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনকালে এবং রোমানদের কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছে অথবা রোমানদের কাছে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক দাবীদাওয়ার ক্ষেত্রে এই সভা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করত। রোমের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি নেই এমন কোন রাষ্ট্রের নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা রোমান রাজ্যে ছিল না। রোমানরা ইচ্ছা করলে অনুরূপ ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারত। কেবল রাষ্ট্রদূতরাই ব্যতিক্রম ছিল। বন্ধুসুলভ রাষ্ট্রের নাগরিকদের আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ছিল। এদের বিচারের ভার প্রেটার পেরিগ্রিনাস (বিদেশীদের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত বিচার সংস্থা) এর উপর ন্যস্ত ছিল।

(৯৭) সিরিয়া এবং মিশরও রোমান সাম্রাজ্যের আওতাধীন ছিল। কাজে কাজেই ইরানের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত ছিল এবং সেইহেতু বহু শতাব্দী ধরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যুদ্ধ চলে। পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের এ আলোচনা বাইজেন্টাইনদের প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে এর অপর অংশ রোমের তুলনায় প্রাচ্য সাম্রাজ্যের উপর গ্রীকের প্রভাব অধিক ছিল। যে সমস্ত দেশের সাথে আরবদের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ জড়িত ছিল সে সমস্ত দেশের জীবনধারা রোমান আইন থেকে সংগৃহীত 'জাসটিনিয়ান সংহিতা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। রোমানদের শান্তি-আইন, বিশেষ করে জাতীয় আন্তর্জাতিক আইন বেশ উন্নত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ আইন মূলত সেনাপতি-বিশেষদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং আমরা পারসিক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে আক্রমণাত্মক আচরণ বিধিসমূহ চিহ্নিত করতে পারি।

(৯৮) বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে আরব উপদ্বীপের পারস্পরিক সীমান্ত ছিল। উভয় সাম্রাজ্যই নিজেদের স্বার্থে আরবের বিভিন্ন আরব অধ্যুষিত এলাকায় উপনিবেশ, আশ্রিত রাজ্য এবং এমনকি 'বাফার' রাষ্ট্র স্থাপন করে। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই অবহিত হয়েছি যে

মুসলিম আইনের বিকাশ কেবল আরবদের দ্বারা সংগঠিত হয়নি; সিরিয়া, ইরান, মিশর ও তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও এর উৎকর্ষ সাধনে প্রথম শতাব্দী থেকেই সহযোগিতা করেছিল। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস গবেষকগণ রোমান, পারসিক, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে আরবের অবস্থা বর্ণনাই আমার জন্য যথেষ্ট, কারণ তৎকালে আরবে প্রচলিত বিধিসমূহ মূলত মুসলমানগণ কর্তৃক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

প্রাক-ইসলাম আরব

(৯৯) ইসলামের প্রারম্ভে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরব প্রধানত গোত্রভিত্তিক অসংখ্য স্বাধীন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত ছিল। গোত্রগুলো ছিল যাযাবর অথবা স্থায়ী বাসিন্দা। এমনকি এক ও অভিন্ন গোত্রের সদস্যরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। স্থায়ী আরবদের নিজস্ব নগর রাষ্ট্র ছিল। "মুক্ত নাগরিকদের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব পালন উদ্দেশ্যে অবাধে সমবেত হবার জন্য প্রত্যেক শহরের চতুর্পার্শ্বে প্রয়োজনীয় স্থান ছিল।.................... যদিও আরবগণ একই ভাষা বলত, একই মেলায় অংশগ্রহণ করত, একই দৈববাণীর শরণাপন্ন হত, একই দেবদেবীর পূজা করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই প্রথার অনুসারী ছিল, কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকায় তাদের পারস্পরিক সার্বভৌম ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকল্পে আইনের বিবর্তন সম্ভবপর হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে এ সমস্ত স্বায়ত্বশাসিত সম্প্রদায়সমূহের অবস্থা ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা হতে মূলত ভিন্ন একথা বলা যায় না। বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও আরবদের বিকাশের স্বাভাবিক সম্পর্ক বস্তুত এক জাতিরই পরিচয়বহ। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের জন্য স্বাধীন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আছে। তবে জাতি, ভাষা ও ধর্মের দিক দিয়ে এসব সম্প্রদায়সমূহ

ভিন্ন হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।..............আত্ম-নির্ভরতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।.........আরবদের উগ্র গোত্রবাদ তাদের মধ্যে সামাজিক নিঃসঙ্গতার মনোভাব সৃষ্টি করে। এই নিঃসঙ্গতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য সাধন সম্ভব হয়নি। একজন আরবের কাছে তার রাষ্ট্র অর্থাৎ তার গোত্র ও গোত্রীয় নিবাস নিছক কল্পনা নয় বরং জীবন্ত বাস্তব। সে তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সে তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; কেননা তার সম্মান, বৈভব, এমনকি তার অস্তিত্বের জন্য সে এর কাছেই ঋণী।......আরবরা আরব জাতি হিসেবে ঐক্য কামনা করে বটে, কিন্তু নিজ নিজ নাগরিকত্ব রক্ষার্থে বিকেন্দ্রন তাদের সদাকাম্য। যে কোন অবস্থায় তাদের নাগরিকত্বের দাবী জাতিগত বন্ধনের দাবীর ঊর্ধ্বে। তাদের প্রতিভা বহুমুখী হলেও স্ব স্ব নগর রাষ্ট্র ও আবাসভূমির সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে তারা তাদের প্রতিভা বিকাশের অবাধ সুযোগ পেয়েছিল। প্রকৌশল নিপুণতা পরিচায়ক কোন বিরাট ইমারত তারা গড়েনি। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার[৮] চেয়ে বুদ্ধি-চর্চা (কবিতার কথা উল্লেখ করছি) নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবরা শিল্পানুরাগী।[৯] উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীকদিগকে যেমন জ্ঞান-উপাসক ও মিশরীয় ও ফিনিসীয়দিগকে সম্পদ-প্রিয়,[১০] বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ঐক্য সাধনে অপারগ হলেও প্রকৃত সভ্য জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ঐক্যের অধিকারী তারা ছিল।"[১১]

(১০০) প্রকৃতিদত্ত জীবনোপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যের কল্যাণে অতি প্রাচীনকালে, বিশেষ করে ইয়ামনে সত্যি সত্যি অনেক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তথাপি ইসলামের উষালগ্নে আইন শৃঙ্খলা বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। বিদেশী শাসনাধীন রাজ্যগুলি যথা, ওমান, বাহরাইন ইত্যাদির অবস্থা অনেকটা ভাল ছিল যদিও যাযাবর ও স্থায়ী বাসিন্দার বিভাগকরণ সেখানেও ছিল।

(১০১) আরবদের নগর-রাষ্ট্রসমূহই কেবল নয় ভ্রাম্যমান গোত্রগুলির বিরাট অংশকেও একই রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এরা কারোর চেয়ে খাটো নয়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন এলাকায় বাস করলেও তারা ভূখণ্ডের অধিকারী ছিল। অন্যান্য যে কোন রাষ্ট্রের মত তারাও বিচার করত, যুদ্ধে লিপ্ত হত এবং চুক্তি সম্পাদন করত।

(১০২) Bellum eminum contra omnes পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত অবস্থাকে প্রায়ই আরবের স্বাভাবিক অবস্থা বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আংশিকভাবে তা সত্যও হতে পারে। আমরা যদি আরব গোত্রসমূহকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিই (কেনই বা দেব না?) এই ভীতির উপশম ঘটে। এমনকি আমাদের আধুনিক কালেও ছাড়পত্রবিহীন কোন ব্যক্তি ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে না। যাহোক, একথাও অনিস্বীকার্য যে আরবের সদা বিবদমান গোত্রসমূহ শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থাও একভাবে না একভাবে করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা اشهر حرم [১২] অর্থাৎ 'পবিত্র মাসের' উদ্ভাবন করেছিল যার ফলে সম্পর্কশূন্য গোত্রসমূহের কষ্টের যথেষ্ট লাঘব হয়েছিল। পুনরায় তারা সহচর ব্যবস্থারও উন্নতি করেছিল। বেদুঈনদের হাত হতে জান মাল রক্ষার ব্যাপারে তা যথেষ্ট সহায়ক ছিল। একজন প্রাচীন লেখকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি হতে সহচর সংস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়;

"দুমাতুল যানদাল (আরবের উত্তরে অবস্থিত) গামী ইয়ামান অথবা হেজাজের প্রত্যেক ব্যবসায়ী মুদারী গোত্র অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে ভ্রমণ করার সময় কুরাইশ সহচর সংগ্রহ করত, কেননা কোন মুদারী অথবা মুদারীদের মিত্র কুরাইশ ব্যবসায়ীদিগকে হয়রান করত না। সুতরাং কালবীরাও তাদেরকে হয়রান করত না যেহেতু তারা বানু-আল যুসম গোত্রের সাথে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ ছিল; এবং বানু আসাদদের সাথে মিত্রতার দরুন তারাই তাদের সাথে গোলমাল করত না ......। ইরাক যেতে হলে তারা বানু আমর ইবনে মারছাদের (কায়েম ইবনে ছালাবাহ গোত্রের) সহচর গ্রহণ করত যার ফলে রাবীয়া গোত্র অধ্যুষিত এলাকায় তারা নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারত.........। বাহরাইনের অবস্থিত আল-মুশাক্কারে যাবার জন্য কুরাইশ সহচরের প্রয়োজন হত.........। রজবের ২০ তারিখে সোহরের মেলা শুরু হত

এবং পাঁচ দিন ধরে চলত। আল-যুলান্দা ইবনে আল-মুসতাকবির সেখানে তাদের কাছ থেকে আয়ের দশমাংশ আদায় করত। এর পরেই দাবার মেলা। দাবা আরবের দুটি প্রধান বন্দরের অন্যতম। এই মেলা দেখতে লোক আসত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হতে, ব্যবসায়ীরা আসত সিন্ধু, ভারত ও চীন হতে………। আরবের দক্ষিণ দূরাঞ্চলে অবস্থিত মাহারার মেলায় যাবার জন্য বানু মুহরীব গোত্রীয় সহচরদের নিযুক্ত করা হত……। যাহোক, এডেনের মেলায় যেতে কোন সহচরের প্রয়োজন হত না ; কেননা এ রাষ্ট্রভুক্ত এলাকা ছিল বলে আইন শৃঙ্খলা বিরাজ করত। ارض مملكة وامر مملكم। প্রাক-ইসলাম আরব ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষ সহচরের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হদরামাওতে অবস্থিত রাবিয়ার মেলায় বানু আকিল আল-মুরার গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের সহচরের কাজ করত এবং কিন্দার আল-ই-মাছরুক বাকীসব লোকের ভার গ্রহণ করত। এর ফলে উভয় গোত্রই খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেছিল। তথাপি আকিল আল মুরারা কোরাইশের পৃষ্ঠপোষকতার কল্যাণে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অপসারণ করেছিল।[১৩]

ওকাজই ছিল আরবের সবচেয়ে বড় মেলা। কোরাইশ, হাওয়াজীন, গাতাফান, আসলাম, আহাবিশ, আদল আদ-দিস, আল-হায়া এবং আল-মুসতালিক প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করত।[১৪]

(১০৩) আন্তর্জাতিক আইনের আর একটি বিষয় ইলাক বা চুক্তির (الا يلاف العهود)[১৬] পদ্ধতি মক্কাবাসীরা গড়ে তোলে। অবাধে বাণিজ্য সামগ্রী নিজ নিজ দেশে আনবার উদ্দেশ্যে তারা বহু চুক্তি সম্পাদন করেছিল অথবা সিরিয়া, আবিসিনিয়া, ইরান, ইয়ামান প্রভৃতি দেশের শাসকদের কাছ থেকে সনদ লাভ করেছিল। মক্কার ব্যবসায়িগণ এইসব বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসার খাতিরে তাদের বাণিজ্য পথে বসবাসকারী বহু গোত্রকে তাদের দস্তরিতে[১৭] বেচাকেনার উদ্দেশ্যে বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অথবা বিভিন্ন মাল বিভিন্ন রাজ্যের উপর দিয়ে অবাধে যাতায়াতের সুবিধার্থে এই সমস্ত গোত্রের সহিত

মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এমনকি বিদেশী রাষ্ট্রের লোকদিগকে যেমন, ইরান, এই চুক্তি ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত।[১৮] উপরোল্লিখিত সনদ লাভের জন্য মক্কাবাসীদের দূত প্রেরণ করতে হত এবং এ ব্যাপারে তারা যে সমস্ত দেশে দূত পাঠিয়েছিল তার নাম ধাম থেকে যেমন তাদের কুটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপকতা তেমনি মক্কা নগর রাষ্ট্রের পরিচালকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়।[১৯]

(১০৪) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা স্থায়ী সহযোগিতার জন্য গোত্রসমূহের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের রেওয়াজ আরবের সর্বত্রই বেশ চালু ছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের বেলায় বহু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ পালিত হত, যেমন, পরস্পরের রক্ত মদে মিশিয়ে পান করা,[২০] সুগন্ধি গায়ে লাগানো,[২১] আগুন জালানো نار الحلف,[২২] মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর আগুন জ্বালানো, نار الفداء মুক্তিপণ দ্বারা নারী যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার কালে আগুন জ্বালানো, যেহেতু দিনের আলোকে বন্দী নারীর পুনরুদ্ধার তারা অবমাননাকর বলে মনে করত, অগ্রভাগের চুল কাটা এবং চুক্তিবদ্ধ দলসমূহ পরস্পরের নখ কেটে কোন হ্রদের তলদেশে তা পুতে রাখা[২৩] এবং পরস্পর করমর্দন ইত্যাদি। অধ্যাপক ক্রেনকো (Krenkow) একবার আমাকে বলেছিলেন, চুক্তিপত্র কিভাবে নিরাপদে রাখতে হয় সে সম্পর্কে তিনি নাকি ধ্রুপদ আরবী সাহিত্যের কোথাও পাঠ করেছিলেন। কেবল চুক্তির দলিলটি দুটুকরা করে ফেলা হত এবং চুক্তিবদ্ধ দলের প্রত্যেকেই নিজেদের কাছে এর অর্ধাংশ রাখত এবং যখনই এর শর্তাবলী উল্লেখের প্রয়োজন হত টুকরা দুটি একত্রীভূত করা হত। এক্ষেত্রে জালিয়াতির সম্ভাবনা কম নিশ্চয়ই।

কোরাইশ কর্তৃক নবীর পরিবারকে একঘরে করার চুক্তিটিও কাবাগৃহের দেওয়ালে আটকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[২৪] বিশেষ ধারারও প্রচলন ছিল বলে মনে হয় (তুলনীয়— والهدم الهدم الدم الدم "[তোমার] রক্তের সন্ধান (আমার) রক্তের সন্ধান এবং (তোমার) রক্তপাত আমারও রক্তপাত" ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৯৭)।

(১০৫) অতঃপর আমাদিগকে দূত সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। আরব দলপতিদের বিদেশী শাসকদের সহিত সাক্ষাৎ[২৫] এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের আরবে আগমন সম্পর্কে বিরাট সাহিত্য রয়েছে। আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে পারস্যের সাহায্য চেয়ে ইয়ামিনরা টেসিফনের (Ctesiphon) কাছে দূত পাঠায়।[২৬] বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যসহ বহু বিদেশী রাষ্ট্রে দূতদেরকে কোন এক বিশেষ দিনে আবরাহা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তার বিবরণ ইয়ামনের মারিফ বাঁধের প্রস্তরফলকে এখনও উৎকীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে; আবরাহা এ বাঁধের সংস্কার করেছিলেন।[২৭] আন্তগোত্রীয় ও আন্তনগর রাষ্ট্রীয় দূত আদান-প্রদানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আরবে রয়েছে। মক্কাবাসীরা মুসলিম শরণার্থীদের বিরুদ্ধে দুবার নিগাসের দরবারে দূত পাঠিয়েছিল।[২৮] ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর উত্তরাধিকারসূত্রে মক্কার রাষ্ট্রদূত ও মুখপাত্র سفير ومنافر ছিলেন। ইবনে আবদ রাব্বিহির ভাষায়, "কোথাও যুদ্ধ বাধলে তারা উমরকে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূত হিসেবে পাঠা'ত এবং যখনই কোন বিদেশী গোত্র কোরাইশদের অগ্রাধিকার অস্বীকার করত সেক্ষেত্রে উমরই তাদের হয়ে কথা বলত এবং কোরাইশগণও তিনি যা বলতেন তা মেনে নিত।"[২৯] রাষ্ট্রদূতকে তারা সর্বদাই পবিত্র বলে জ্ঞান করত। ان الرسل لم تزل امنة فى الجاهلية والاسلام[৩০] জাহিলিয়া বা ইসলামেরই যুগ হোক না কেন রাষ্ট্রদূতগণ সর্বদাই নিরাপত্তা ভোগ করেছেন।

(১০৬) সমস্ত আরব উপদ্বীপের জন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না এই অর্থে যদিও আরবে ঐক্য ছিল না (ভেলহাউজেনের Wellhausen ভাষায় 'ein Gemein wesen ohne obrigkeit'[৩১] অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন ক্ষমতাবিহীন সম্প্রদায়) তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ইসলামের পূর্ব থেকেই কেন্দ্রীভূত ঐক্যের অনুকূলে প্রবল প্রবণতা সক্রিয় ছিল। আমরা দেখেছি মক্কা হতে বাহরাইন, দুমাতুল যানদাল হতে মাহারাহ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র কিভাবে সহচর ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এমনকি আমি এ সিদ্ধান্তে পর্যন্ত উপনীত হতে পারি যে ইতিমধ্যে

আরব উপদ্বীপে রাজনীতি হতে আলাদাভাবে একটি অর্থনৈতিক জোট গড়ে উঠেছিল।[৩২] তা আমরা যদি আরবের মেলার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করি তাহলে একটি কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হই। অনেকের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে হাবীব''[৩৩] এবং আল-মারজুফী[৩৪] (যেমন কালফাসান্দী তাঁর নিহাইয়াতে, মাকরীজী তার আল খবর আন আল-বাশার এ) ইবনে আল-কালবীর তথ্যের ভিত্তিতে মেলার অনুক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন ঃ—

মাস	তারিখ	স্থান
১	১০—৩০	খাইবার
৩	১—৩০	দুমাতুল যানদাল
৬	১—৩০	আল-মুশাক্কার (বাহরাইন, বর্তমানে আল-হাসা)
৭	২০—২৫	সুহার (ওমান)
৭	৩০ ?	দুবা (ওমান)
৮	১৫ ?	শীহর (মাহারাহ)
৯	১—১০	এডেন (ইয়ামান)
৯	১৫—৩০	সা'না (ইয়ামান)
১১	১৫—৩০	রাবিয়াহ (হাদরামাওয়াত) এবং তায়িফের নিকটবর্তী ওকাজে।
১২	১—৮	জুল—মাযাজ (মক্কা এবং ওকাজের মধ্যবর্তী)
১২	১—১১	মীনা (মক্কার সন্নিকটে 'হজ্ব' এলাকায়)

(১০৭) মানচিত্রের দিকে তাকালে এক নজরেই বোঝা যায় এর অর্থ হল উত্তর থেকে পূর্ব, পূর্ব থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ থেকে পশ্চিম এবং পশ্চিম থেকে উত্তর গোটা আরব পরিভ্রমণ। এসব মেলা যে স্থানীয় ছিল না বরং দেশের দূর-দূরাঞ্চল হতে এমনকি বিদেশ হতেও লোকজন এ মেলায় যোগদান করত আমাদের গ্রন্থকারগণ সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে মক্কাবাসীরা দুমাতুল যানদাল ও রাবীয়ার মেলা অথবা আসলাম, গাতাযানি ও অন্যান্য গোত্রসমূহ ওকাজের মেলায় যোগদান করত। তারা একথাও উল্লেখ

করেছেন যে, ব্যবসায়ীরা এক মেলা হতে অন্য মেলায় যেতেন। পুনরায়, এগুলিই সর্ব আরবীয় মেলা ছিল اسواق العرب الكبيرة[৩৪]।[৩৫] অন্যথায় আঞ্চলিক হলেও মাযান্নাহ্,[৩৬] বদর, দুবাসাহ্[৩৭] প্রভৃতির মত আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মেলার অস্তিত্ব ছিল।

(১০৮) সাধারণ সালিশ আরবে কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতার আর একটি প্রমাণ। গোত্র, বংশ নির্বিশেষে সবাই এইসব সালিশ, দৈবজ্ঞ এবং অন্যান্য গণকের শরণাপন্ন হত। আমীর ইবনে আল-জারিব এবং আরও অনেকে এদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত বহু উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং এই নিরপেক্ষতার কারণেই এরা সাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিল।[৩৮]

(১০৯) আরবের শান্তি সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রতিবেশী جوار,[৩৯] আশ্রয়,[৪০] অর্জিত নাগরিকত্ব প্রাপ্ত এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী حلفاء موالى, সমর্পণ[৪১] বিদেশী আপ্যায়ন[৪২] এবং এমনকি পোত ধ্বংস (shipwreck)[৪৩] সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

(১১০) সবশেষে আমি এ প্রসঙ্গে 'শৌর্যক্রমের' (হিলফ আল-কুছুল) কথা উল্লেখ করতে পারি। জারহামীদের সময় ইহা প্রবর্তিত হয় এবং ইসলামের নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বাল্যকালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর অনুসারীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় দেশী অথবা বিদেশী যে কোন নির্যাতিত ব্যক্তির প্রতি সুবিচার না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষ সমর্থনের শপথ নিত।[৪৪] (জাদাহ [ذادة] নামে অপর একটি সংস্থা পবিত্র মাসে শান্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেলায় কার্যরত থাকত। দ্রষ্টব্য, History of al yaqulsiy, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪-৫) এছাড়াও সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে 'হিলফুস সিলাহ' নামে একটি সংস্থা মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়। (দ্রষ্টব্য জুবাইর ইবনে বক্কর, নসব, কুরাইশ, কপরোলো, ইস্তাম্বুল, ফলিও ৯৭ ক)।

(১১১) এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের আইন কানুন অত্যন্ত উন্নত ছিল। সুতরাং, যুদ্ধ ঘোষণা,[৪৫] শত্রুর জান-মালের প্রতি

ব্যবহার, যুদ্ধ-বন্দী,[৪৬] যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বিতরণ,[৪৭] অভিযান পরিচালকের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা,[৪৮] গুপ্তচর,[৪৯] জামিন (امان),[৫০] সন্ধি ও যুদ্ধ বিরতি,[৫১] সন্ধির আলাপ আলোচনা[৫২] এবং অন্যান্য অনেক বিষয়, এমনকি উর্দী মোটামোটি নিয়মমাফিক আলোচিত হয়েছে।

(১১২) এমনকি নিরপেক্ষতা ও اعتزال তাদের অজানা ছিল না এবং এ সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। আমরা এই পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। (দ্রষ্টব্য, ৬০৮ অনুচ্ছেদ)

টীকা

১। Espirit des lois, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭ (প্যারিস, ১৮৬০); "Toutes les nations ont un droit des gems ; et les Iroquois memes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et recoinent les ambassades, its conpaissent les droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce droit des gens n'est pas jonde sur les vrais principes."

২। হল্টযেনডর্ফ, (Holtzendorf), Hand buch des vodke-rrechts, পৃঃ ১৬৮।

৩। ওপেন হাইম (oppenheim), Internatinal law (চতুর্থ সংস্করণ), পৃঃ ৫৫-৬।

৪। পলিটিক্স, প্রথম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৫। লরেন্স কর্তৃক উল্লেখিত, Principles of International law (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ ১৫।

৬। উইলসন এবং টাকার, International law (অষ্টম সংস্করণ) পৃঃ ১৬।

৭। ওপেন হাইম, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫৯-৬১।

৮। ইয়ামানের ফিন্দা একমাত্র ব্যতিক্রম।

৯। "The city state of Mecca" (Islamic culture, জুলাই, ১৯৩৮) পৃঃ ২৭৫।

১০। তুলনীয়ঃ হিন্দুদের লক্ষ্মী পূজা।

১১। অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের উক্তি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাপেক্ষে আরবদের বেলায়ও প্রযোজ্য। মক্কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আমার প্রবন্ধ, "The city state of Mecca" (Islamic culture, জুলাই, ১৯৩৮) দ্রষ্টব্য।

১২। Islamic culture. জুলাই, ১৯৩৮, পৃঃ ২৬৭-৮ ; লাহোরে অনুষ্ঠিত 'ইদারা মা'রিফ ইসলামিয়া'এর দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য বিবরণী, পৃঃ ৯৮-৯ Hydarabad Academy journal. পঞ্চম খণ্ড, ৯৬।

১৩। Olinder. The kings of the Family of Akil at-Merar।

১৪। মোহাম্মদ ইবনে হাবিব (মৃঃ ২৪৫ হিঃ), (كتاب المحبر 'হায়দারাবাদ সংস্করণ) "আরবের মেলা" পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৩৬-৮।

১৫। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ আত-তানোখী, المستجاد من فعلات الاجود (ল্যালিনগ্রাদ) ৩২নং কাহিনী (এ প্রসঙ্গে বনে আমার সহপাঠী Dr. Lea Pauly স্মরণীয়)

"وبعث (مهلهل) معى خفيراً من ماء حتى وردوا الى الحيرة"

"এবং (মুহালাহিল) তারা হিরা শহরে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাকে এক জলসত্র হতে অন্য জলসত্রে সঙ্গদান করার জন্য একজন সহচর পাঠিয়েছিলেন। "জার্মানীতে Dr. Pauly ও সিরিয়াতে কুর্দ 'আলী এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

আল-মারজুকী, كتا الازمنة و امكنة দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬১ঃ

و كانت هذه الا سواق......لايصل احد اليها الا بخفير
و لا يرجع الا بخفير

"এবং এই সকল মেলা……সহচর ছাড়া কেউ সেখানে যেতে অথবা সেখানে ফিরে আসতে পারে না।"

১৬। মোহাম্মদ ইবনে হাবিব, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৬২।

১৭। ইয়াকুবী, প্রথম খণ্ড, ২৮০ ; ইবনে সা'দ ১/১, পৃঃ ৪৩,৪৫ ;

তাবারী Annales, ১ম খণ্ড, ১০৮৯ ; লিসানুল আরব, ইলাফ ; lammens, La Mecque ; a la veille de l'Hegire, ১২৮ পৃষ্ঠা।

১৮। Fraenked Aramaisch. Fremden woerter, পৃঃ ১৭৬ ঐ, schutzrecht পৃঃ ২৯৬ ; Lammens, La Republique marchande be la Mecque পৃঃ ২৫ ; ইবনে সা'দ ১/২, পৃঃ ৩২ ; হেফেনিঙ কর্তৃক উদ্ধৃত, Das Islamische Fremdenrecht, ৮৯ পৃষ্ঠা।

১৯। লেখকের প্রবন্ধ "Al-Itaft ou les rapports econ omico-diplomatiques de le Mecque pre-Islamique ; Melanges massignon; দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৯৩-৩১১ ; Le prophet de I,Islam, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৯৯-৬০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২০। দিনাওয়ারী, পৃঃ ৩৫৩ ; ইয়াকুবী, প্রথম খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ।

২১। ইয়াকুবী, প্রথম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।

২২। কালকাসন্দী, صبح الاعشى প্রথম খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ (ঐ, نهاية)।

২৩। দিনাওয়ারী, পৃঃ ৩৫৩।

২৪। ইবনে হিশাম, ২৩১ পৃঃ।

২৫। ইবনে হাজার, عطاردبن حاجب والاصابة ইবনে সা'দ ১/১, পৃঃ ৪৩-৪৫ ; তাবারী, History. প্রথম খণ্ড, ১৫৩৭ ; আল মাসুদী, মুরুজ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫০ ; 'ইসলামের পূর্বে উমর অনেক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন' ; আল-ইসবাহানী 'আগানী,' ১২, ৪৮ ৯ পৃঃ ইত্যাদি।

২৬। ইয়াকুবী, প্রথম খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ

২৭। Glasser, "zwei Imchriften" সুলাইমান নদভী, أرض القرآن প্রথম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ।

২৮। ইবনে হিশাম, ২৭১-২১, ৭১৬-৭ পৃঃ।

২৯। العقد الفريد দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৫ পৃঃ।

৩০। সরখসী, المبسوط দশম পরিচ্ছেদ ; ৯২ পৃঃ।

৩১। ভেল হাউসেন (wellhausen) এর প্রবন্ধের শিরোনাম।

৩২। হায়দারাবাদ একাডেমী জার্নালে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ (পঞ্চম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৩৩। পূর্বে উল্লেখিত, ২৬৩-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩৪। كتاب الازمنة و الا مكنة দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬১-৭০ পৃঃ। কেতাবুল আযামাতি ওয়াল আক্‌মিনাহ্।

৩৫। ঐ, ১৬১ পৃঃ।

৩৬। আল-মারজুদী পূর্বে উল্লেখিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬১, পাদটীকা ; তুলনীয়, সাইদ আল-আফগানী, اسواق العرب (দামেস্ক সংস্করণ)।

৩৭। 'বদর' এর জন্য তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০৭, ১৪৬০ ; এবং 'হুবাসা'র জন্য ঐ, ১১২৯ পৃঃ। এবং সাধারণ আলোচনার জন্য লেখকের প্রবন্ধ Le Prophete de l' Islam (প্যারিস, ১৯৫৯), দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৯৯-৬১০ দ্রষ্টব্য।

৩৮। তুলনীয়, লেখকের "Administration of Justice in Early Islam," Islamic culture (এপ্রিল, ১৯৩৭) ; এবং اسلامی عدل گستری اپنے اغاز میں মাজাল্লাহ উছমানিয়া একাদশ/১-২ ; Histoire de l' orgnitiation judiciaire in pays d' Islam, E.Tyan প্রণীত ; প্রথম খণ্ড ৩০-৮০ পৃঃ grandefroy-Demombynes কর্তৃক উক্ত পুস্তকের সমালোচনা Revue des Etudes Islamiques" এপ্রিল, ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ; অপর একটি প্রবন্ধ "sur les orgines de la justice musulmane melanges syriens offerts a dussunds" (৮১৯-২৮ পৃঃ) এ প্রকাশিত, দ্রষ্টব্য।

৩৯। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ২৫১ঃ তাবারী ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ১২০৩ ; বিশদ আলোচনার জন্য। ইবনে হাবীব, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৬৭-৮। এটা লক্ষ্যণীয় যে আরবরা একই শব্দ 'মাঁওলা' আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়প্রার্থী অর্থে ব্যবহার করেছেন। অপেক্ষাকৃত পুরনো 'জার' শব্দটিরও দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে। তুলনীয় যেমন جارالله আল্লাহের প্রতিবেশী ان الله له جار এ নিশ্চয় পরিভাষার অভাব-হেতু নয়, কেননা আর যাই হোক আরবী ভাষা শব্দের প্রাচুর্যে ও অভিব্যক্তিতে দীন একথা বলা চলে না। নেহায়েত শব্দের হেরফের

তাও বলা চলে না। আমার মতে এর তাৎপর্যের অতিরঞ্জন কখনো সম্ভব নয়। কেননা এ কেবল সাম্যের নির্দেশক নয় বরং তার চেয়েও অধিক। বহুদিনব্যাপী বিবাদ অবসানের পর একটি মানব সমাজের সংযোজন, উপলব্ধি, পুনঃ মানবীকরণের প্রতি এ ইঙ্গিত করে। ইসলামের আবির্ভাবে বিশ্ববাসীদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ দেখা দিয়েছিল তার পটভূমিকা আমরা সেখানে খুঁজে পেতে পারি!

৪০। তুলনীয়, ديوان الحما سة (ইউরোপীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৫-৬)ঃ

حمدت الهى بعد عروة اذ نجى
خراش و بعض الشر اهون من بعض
ولم ادر من الفى عليه رداءه
على انه قد سل عن ما جد محض

[ওরবার মৃত্যুর পর খিরাশের মুক্তিতে আমি আল্লাহের প্রশংসা করেছি ; কোন কোন পাপ অন্য পাপের চেয়ে লঘু। খিরাশকে কে আশ্রয় দান করেছিল আমি জানি না ; তবে তিনি নিশ্চয় কোন নিষ্কলঙ্ক অভিজাত পরিবারের সন্তান হবেন।]

৪১। প্রতিশোধ প্রতিরোধের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৪২। ওয়াকিদী (ফন ক্রেমার সম্পাদিত) ২৩ পৃঃ।

৪৩। আল-আজরাকী, اخبار مكة (ইউরোপীয় সংস্করণ) ১০৬-৭।

৪৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৫-৬ ঃ সুহাইলী الروض الانف প্রথম খণ্ড, ৯০-, ৪ ; ইবনে স'াদ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৪১ পৃঃ ; মসনাদ, ইবনে হাম্বাল, প্রথম খণ্ড ১৯০ ; المنمق الا بن حبيب লাক্ষ্ণৌ, ১৪৪ ; মাসুদী, التنبيه পৃঃ ২০৯-১০ ; (الاغا نى)।

৪৫। اذن بعضهم بعضا بالحرب [তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।] (তুলনীয়, كتاب بكر و تغلب)।

৪৬। كتاب الاغانى দ্বাদশ খণ্ড, ৪৭ ; তাবারী ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, ২২০৭ ঃ وكانت ربيعة لاتسبى اذ العرب يتسا بو ن فى الجا هلية [রাবীয়া গোত্রের লোকেরা যুদ্ধবন্দীদের দাসরূপে

ব্যবহার করত না যদিও ইসলামের পূর্বে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তা করত।]

৪৭। তুলনীয় : যে কোন অভিধানে مرباع শব্দ।

৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে গানমাহ :

لك المرباع منها والصفايا
وحكمك والنشيطة والفضول

[তোমার প্রাপ্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পছন্দ সে জিনিষ, কর্তৃত্ব, সাধারণ লুণ্ঠনের পূর্বে শত্রুর কাছ থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অবিভাজ্য ভগ্নাংশ]—مرباع শিরোনামায় تاج العروس অভিধানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল-সারখসী, আল-মাবসুত, দশম পরিচ্ছেদ, ৯ পৃঃ।

৫০। نقائض جرير و الفرزدق ৯৩, ৪৬২ পৃঃ।

৫১। تاريخ اليعقوبي প্রথম খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ।

৪৯। গুপ্তচর দুই প্রকারের। যথা, গতি-বিধি লক্ষ্যকারী (eye-spy) ও খবর সরবরাহকারী (ear-spy) গুপ্তচর।

৫২। বাকর ওয়া তাগলিব।

৫৩। দৃষ্টান্তস্বরূপ দীর্ঘস্থায়ী বক্‌র ও তাগলীবের যুদ্ধে 'রাজীয়া' গোত্রের সবাই, কেবল একজন ছাড়া, মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছিল। চুল থাকা হেতু সে ব্যক্তি নিজের দলের লোকের হাতেই অজান্তে নিহত হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে ইসলামের স্থান

(১১৩) আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন যা কার্যত পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ইউরোপে উদ্ভূত আইন। লেখকগণ রীতিমাফিক গ্রীক নগর রাষ্ট্রের কথা দিয়ে এর ইতিহাস শুরু করেন এবং পরবর্তী রোমান যুগের বর্ণনা দেন। এর পরেই হঠাৎ অন্তবর্তী প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে তারা চলে আসেন আধুনিক কালের আলোচনায় এবং জোর গলায় দাবী করেন মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক আইনের······কোন অবকাশ এবং প্রয়োজনীয়তা ছিল না।[১]

(১১৪) প্রাচীন ফিনিশীয়রা যে হস্তলিপির ন্যায় সংস্কৃতির প্রাথমিক চাহিদা গ্রীসকে জুগিয়েছিল অথবা ইরান যে কয়েক শতাব্দী ধরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। অন্যথায় আমরা বুঝতে পারতাম প্রাচ্যের নগর রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তারে গ্রীসীয় আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা কতখানি মৌলিকত্বের দাবীদার।

(১১৫) পুনরায় রোমীয় আইনের উপর প্রাচ্য আইনের প্রভাব সম্পর্কে একাধিক যোগ্য পণ্ডিত গবেষণা করেছেন এবং আমি এই মুহূর্তে সে আলোচনায় যেতে চাই না। মধ্যযুগে ইউরোপে আন্তর্জাতিক আইন বলতে কিছু ছিল না, সেকালে এর প্রয়োজনও ছিল না এবং রোমান ও আধুনিক যুগের হাজার বছরের ব্যবধানের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী যোগসূত্র নেই—ওপেনহাইমের এই উক্তির সত্যতা যাচাই করাই এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(১১৬) গ্রীসীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা জানি যে গ্রীক উপদ্বীপে অবস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যক নগর রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহা সংশ্লিষ্ট। এর অধিবাসীরা এক ও অভিন্ন জাতির লোক, একই ভাষায় কথা বলে,

একই ধর্মে বিশ্বাস করে এবং একই প্রথা মেনে চলে যদিও একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে কোন মূল্যে তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে। বস্তুত গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক আইনের দুটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট বিধিমালা ছিল। একটি গ্রীকদের বেলায় ও অন্যটি পৃথিবীর বাকী সব লোকের বেলায় প্রযোজ্য ছিল। তবে শেষোক্ত বিধিমালাটি অনুন্নত ছিল এবং মোটেই সুবিন্যস্ত ছিল না।

(১১৭) অন্যদিকে রোমীয় যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে তাদের আইন কোন এক বিশেষ জাতির জন্য নয় বরং মোটামোটি রোমীয় সাম্রাজ্যের সকল প্রজার উপর প্রযোজ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে রোমীয় সাম্রাজ্য বহু রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এদের সবাই অল্প বিস্তর জারের আনুগত্য স্বীকার করলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। সিজারের কর্তৃত্বাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ বাধলে এ ব্যাপারে রোমের নির্দেশ চাওয়া হত এবং রোমীয় আইন অনুযায়ী সম্রাটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হত। একেই আমাদের উৎসাহী লেখকগণ গ্রীসীয় আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী এবং আধুনিক কালের অগ্রদূত বা নামধারী বলে অভিহিত করে থাকে। বোধ হয় এই উক্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার একজনের আছে। যুদ্ধ এবং শান্তি কালে রোমকরা আরমীয় দেশগুলির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিধিমালা মেনে চলত তাকে কেন রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন বলে আখ্যায়িত করা হয় না? এই সকল আইন খুব বিস্তারিত বা সুবিন্যস্ত হওয়ার মত ততটা উন্নত নাও হতে পারে, তথাপি কেবল এগুলিই ন্যায়সঙ্গতভাবে রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন বলে অভিহিত হওয়ার দাবী রাখে। প্রশাসনিক বিধিমালা যা কেবল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত অংশগুলির মধ্যে প্রযোজ্য কোন অবস্থাতেই রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন বলে অভিহিত হওয়ার দাবী রাখে। প্রশাসনিক বিধিমালা যা কেবল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত অংশগুলির মধ্যে প্রযোজ্য কোন অবস্থাতেই রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন বলে অভিহিত হতে পারে না। এ মিথ্যার নামান্তর। যাহোক শান্তি সম্পর্কিত রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন গ্রীসীয় ব্যবস্থা হতে

উন্নততর ছিল বলে আমি মনে করি (তুলনীয় ফিলিপসনের রচনাদি) : তথাপি যুদ্ধ সংক্রান্ত রোমীয় আইনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি ; কেননা বিবদমান প্রতিপক্ষের কোন অধিকার আছে বলে তারা স্বীকার করত না এবং আরমীয় শত্রুদের বেলায় খেয়াল খুশী মাফিক আচরণ করত।

(১১৮) যাহোক আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থায় একটি বিবদমান রাষ্ট্রের শান্তিকালে মিত্র রাষ্ট্রের সম অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। যুদ্ধ কিছু অধিকার খর্ব করে, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন একথা স্বীকার করে। তৎসত্ত্বেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বহু অধিকার এমনকি পরস্পর যুদ্ধলিপ্ত অবস্থায়ও অক্ষুন্ন থাকে।

(১১৯) এ ধারণার সৃষ্টি হল কিভাবে ? আধুনিক ইউরোপীয় ব্যবস্থা রোমীয় ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বলা হয়ে থাকে ; কিন্তু রোমীয় আইনে আমরা এমন কিছু খুঁজে পাইনা যা এ ধারণার স্বপক্ষে ইঙ্গিত করে। এ কি কেবল আধুনিক অবদান, খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাব বা অন্য কিছু ?

(১২০) প্রথমে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। যদিও ইউরোপবাসীরা গোড়া থেকেই খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়া শুরু করেছিল, তবুও যীশু খৃষ্ট প্রচারিত প্রেম বাণী আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশে সহায়ক ছিল না। খৃষ্টের বাণী বলে ম্যাথিউতে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৩৯) উল্লেখ আছে : 'পাপকে বাধা দিও না, যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে তোমার বাম গালও এগিয়ে দিও।' অথবা (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ২১): "সিজারের নিকট সিজারের প্রাপ্য ও আল্লার নিকট আল্লার প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও।' পুনরায় (২৬শ তম পরিচ্ছেদ, ৫২) "তোমার তরবারী যথাস্থানে রেখে দাও ; কেননা যারা তরবারীর আশ্রয় নেয় তরবারীতেই তাদের ধ্বংস"। সেণ্ট জন সুসমাচারএ (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, ৩৬) উল্লেখ আছে "এই পৃথিবীর রাজত্ব আমার নয়।" এই সম্পর্কিত আরও অনুরূপ বাণী রয়েছে। প্রাথমিক খৃষ্টীয় শিক্ষা এমন ছিল যে (বেলজিয়ামের অধ্যাপক নিস (Nys)[৩] সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন) একজন খৃষ্টানের পক্ষে বল প্রয়োগ দ্বারা আত্মরক্ষা দূরের কথা এমনকি নির্যাতনের হাত হতে নিজকে রক্ষার জন্যে আইনের আশ্রয় চাওয়াও সম্ভব ছিল না। অধ্যাপক নরম্যান বেণ্টউইখ (Norman

Bentwich) স্বীকার করেছেনঃ "এ হল ক্যানানদের বিরুদ্ধে হিব্রু মনোভাবে এবং আমি কি এর সাথে যোগ করে বলতে পারি 'রোমে ফিরে যাওয়ার' আন্দোলনও বটে এবং যে খৃষ্টীয় বাণী জনসাধারণকে পরিণামে রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে মনোভাব নয়।[৪] উপরন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন সূত্র প্রণয়নের সময় খৃষ্টধর্মের নৈতিক বলের আরও অবনতি ঘটেছিল। পোপ ও যাজকতন্ত্র দুর্নাম অর্জন করেছিল। ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক আইনের জনক গ্রটিয়াস (Grotius) তার De jure belli ac pacis নামক গ্রন্থের (১৬২৫ সালে প্রকাশিত) মুখবন্ধে উল্লেখ করেন যে তাঁর সময়কার ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিরা যুদ্ধে এমন ধরনের আচরণ করত যাতে এমনকি বর্বরও লজ্জাবোধ করত।

(১২১) যেখানে ১৮৫৬ সাল অবধি ইউরোপীয় সভ্য জাতিরা বিশ্বাস করত যে আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধা ভোগ করার অধিকারী একমাত্র খৃষ্টান জাতিসমূহ সেখানে খৃষ্টধর্ম প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করেছে একথা আমার কাছে অকল্পনীয়। এ মোটেই পরার্থপরতা বা খৃষ্টীয় ধর্মবোধ নয় বরং নিছক বাস্তব রাজনীতির তাগিদেই ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তির আওতায় তারা মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ককে সভ্যজাতির সম্প্রদায়ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। জাপান ও অন্যান্য অ-খৃষ্টীয় জাতিকে এই সম্মানের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হয়। এর পরেও অনেকে এই একই ধারণা পোষণ করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ওলসী[৫] দাবী করেন যে খৃষ্টীয় জাতিসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করে তাই কেবল আন্তর্জাতিক আইন। পোপের এক হুকুমনামা অনুযায়ী খৃষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পাদিত তাদের চুক্তি দ্বারা বাধ্য নয়।[৬]

(১২২) আর্নেষ্ট নীসের[৭] বর্ণনা অনুযায়ী, মুসলমানগণ কর্তৃক খৃষ্ট ধর্মের লালন ভূমি জেরুজালেম ও পেট্রিয়াকদের দুটি পীঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও এন্টিয়ক বিজয় এবং উম্মাইয়া, আব্বাসী ও তুর্কীদের হাতে খৃষ্টানদের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ধর্মযাজকদের মন এত বিষিয়ে তুলেছিল যার ফলে খৃষ্টীয় 'যাজক সম্প্রদায় স্বয়ং যুদ্ধে বিভীষিকার

স্বপক্ষে প্রেরণা জুগিয়েছিল'। সাধু সন্ন্যাসী, এমনকি পোপরাও 'ক্রুসেডে'র গোড়াপত্তন করেছিল ; এবং 'টেম্পলার,' 'হসপিটেলার,' 'সেণ্ট জন, 'টিউনিক' এবং অন্যান্য খৃষ্ট-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে।[৮] অধ্যাপক ওয়াকার[৯] মন্তব্য করেছেনঃ মুসলিম ভীতির চাপে পড়েই ইউরোপ 'ক্রুসেডের' সময় প্রথম বারের মত একতাবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি একই পতাকাতলে সমেবত হয়ে যুদ্ধ করে যা ইতিপূর্বে কখনো খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত ও পোপকে তাদের ধর্মীয় প্রধান হিসেবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি।

(১২৩) স্পেন, দক্ষিণ ইউরোপ এবং 'ক্রুসেডের' সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। কিন্তু আর একটি দিক রয়েছে যা আমাদের এ প্রসঙ্গে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। পিয়ারে বেলো, আয়আলা, ভিটোরিয়া, জেন্টিলস প্রমুখ আন্তর্জাতিক আইনের প্রাচীনতম ইউরোপীয় লেখকদের প্রায় সবাই স্পেন বা ইটালীর লোক এবং এদের সবাই খৃষ্টান সমাজের উপর ইসলামের প্রভাবের ফলে ইউরোপে যে রেঁনেসা দেখা দেয় তারই সৃষ্টি।[১০] প্রাচ্যে বাগদাদ ও পাশ্চাত্যে কর্ডোভা আরব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বিরাজমান ছিল এবং মাঝখানে ইউরোপ এই দুই বৃহৎ আরব সাম্রাজ্যের একটি বা অন্যটি দ্বারা পরাভূত বা শাসিত হবার আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত ছিল।

(১২৪) আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আরব সংস্কৃতি ও আরব আইন শেখার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে যে অসংখ্য ছাত্র জমায়েত হত তাদের কথা বাদই দিলাম। এমনকি কয়েকজন পোপ ও ধর্মযাজক আরবী সম্পর্কে যেমন প্রগাঢ় জ্ঞান রাখতেন লুথারের পাণ্ডিত্যও তেমনি প্রগাঢ় ছিল। শত শত বছর ধরে ইউরোপের শিক্ষার খোরাক জুগিয়েছে লেটিন ভাষায় অনুবাদ করা আরবী বই।

(১২৫) পাশ্চাত্যদের আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উপর ইসলামের প্রভাব বিশেষ করে এর প্রথম যগ কদাচিত স্বীকৃতি পায়।

বিরল স্বীকৃতিদাতাদের মধ্যে নিসের origines du droit international-এর নাম আমি আগেই উল্লেখ করেছি (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বইটির উর্দু অনুবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছে) আর তার সঙ্গে আছেন ওয়াকার। রাশিয়া বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির উপর ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে রুশ আইনজ্ঞ বেরন স্থ তবে (Baron de Taube) ১৯২৬ সালে হেগের আন্তর্জাতিক আইন গবেষণা কেন্দ্রে (Academy of international law) যে বক্তৃতামালা প্রদান করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় "মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যদেশীয় উৎসের পুরোপুরি ছাপ বহন না করলেও ন্যূনতম পক্ষে প্রাচ্যের অনুরূপ মুসলিম সামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর এদের অধিক নির্ভরশীলতার অকাট্য সাক্ষ্য বহন করে।" (পৃঃ ৩৮৪)

তিনি বহু দৃষ্টান্ত দেন এবং উপরন্তু একথাও স্বীকার করেন যে আরব ব্যবসায়ীরা যখন প্রাচ্যে চীন ও পাশ্চাত্যে সুইডেন ও ডেনমার্ক অবধি গমন করেন তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাইজেণ্টাইন গ্রীকরা নিষ্ক্রিয় ছিল।' প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 'সুইডেনে প্রাপ্ত আটত্রিশ হাজার আরবীয় মুদ্রার মধ্যে বাইজেণ্টাইন মুদ্রার সংখ্যা ছিল মাত্র দুশ।" (পৃঃ ৩৯৫)

(১২৬) বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও এমনকি সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ইউরোপের উপর ইসলামের প্রভাব স্বীকৃত। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়।

(১২৭) প্রশ্ন থেকে যায় মুসলমানরা নিজেরা আন্তর্জাতিক আইনের চর্চা করেছিল কিনা। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে আমরা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি এবং আমরা জানি যে 'ফিকহ' বা আইনের অংশ হিসেবে 'সিয়ার' (আন্তর্জাতিক আইন) সমস্ত মুসলিম শিক্ষায়তনে পড়ানো হত।

(১২৮) এর থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে মুসলমানরা আন্তর্জাতিক আইনকে অনেক আগে থেকেই রাজনীতি ও সাধারণ আইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক বিষয় বস্তু হিসেবে দাঁড়

করিয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আমরা যখন প্রাচীন আরবী রচনা পাঠ করি তখন শান্তি ও যুদ্ধের সময়ের মুসলমান, রোম (বাইজেন্টাইন) ও অন্যান্যের মধ্যে সম্পর্কের স্পষ্ট ধারণা লাভ করি এবং যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে যে পারস্পরিক ক্রিয়া বিদ্যমান ছিল কেবল তাই দেখি না বরং আন্তর্জাতিক আইনের পারস্পরিক ক্রিয়াও লক্ষ্য করি। মুসলিম আইনেই আমরা প্রথম দেখতে পাই শত্রুর পূর্ণ অধিকারের সর্বকালীন স্বীকৃতির ধারণা, শান্তি ও যুদ্ধে তা সমানভাবে প্রযোজ্য। যে অধিকারের স্বীকৃতি আছে কুরআনে, আছে নবী তাঁর উত্তরসূরীদের ব্যবহারিক জীবনে। উপরন্তু এও লক্ষ্য করার বিষয় যে আয়আলা, ভিটোরিয়া, জেণ্টাইল; গ্রোটিয়াস এবং অন্যান্য কর্তৃক লিখিত যুদ্ধরীতি নীতি সম্পর্কিত পুস্তকাবলীর অনুরূপ বই রোমান এবং গ্রীসীয় সাহিত্যে নেই। এদের জন্ম এমন একটি যুগে যখন ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য আজকের মত এত উন্নত ছিল না। অতএব এইসব পুস্তক আমাদের কাছে 'সিয়ার' ও 'জিহাদ' সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থাবলীর প্রতিধ্বনি বৈ আর কিছু নয়। রোমীয় ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগসূত্র আমাদের সেখানেই খুঁজতে হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ধারণার যুগান্তকারী পরিবর্তনের উৎস সেখানেই বলে আমাদের স্বীকার করতে হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা আমরা দেখতে পাই।

(১২৯) একটি নির্ঘণ্ট অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ ইতিহাসের পুনরালোচনা করলে উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে ঃ

সংখ্যা	কাল ও উদাহরণ	নির্দিষ্ট আইনের ক্ষেত্র	বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র
১	গোত্রীয়	স্বজন	অবশিষ্ট পৃথিবী
২	উপজাতীয় (গ্রীক নগর রাষ্ট্র)	একই উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্র	„
৩	জাতীয় (রোমান)	সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ	„
৪	ধর্মীয় (ইহুদী)	আমালেকী ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী	—
৫	পৃথিবী ত্যাগ (খৃষ্টীয়)	—	সমগ্র বিশ্ব
৬	সেরাপথ (ইসলামীয়)	যুদ্ধ ও শান্তিতে সমগ্র বিশ্ব	—
৭	ধর্মনিরপেক্ষ (আধুনিক ইউরোপের প্রথম দিকে)	খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসমূহ	অবশিষ্ট বিশ্ব
৮	বস্তুবাদী (যথার্থ পাশ্চাত্য দেশসমূহ)	সভ্য অর্থাৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ	অসভ্য অর্থাৎ দুর্বল দেশসমূহ

টীকা

১। ওপেন হাইম, ইণ্টারন্যাশনাল ল (চতুর্থ সংস্করণ ১৯২৪) ১, ৬২ পৃঃ।

২। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফরাসী মনীষী কলীনে (collinet) এ বিষয়ের উপর কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

৩। Les origines du droit international, ৪৪ পৃঃ : "যীশু খৃষ্টের বৈরাগ্য বাণী অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল, ব্যবহারিক জীবনে আস্থা স্থাপনকারীদের আত্মরক্ষার জন্য বল প্রয়োগ তো নিষিদ্ধ ছিলই, সেই সঙ্গে তারা কোন রকম বৈধ সমর্থন—যথা দেশের আইনের আশ্রয়ও প্রার্থনা করতে পারত না।"

৪। Religious Foundation of International Law, ৮৭ পৃঃ।

৫। টমাস, ডি, ওলসি, International law (চতুর্থ সংস্করণ, নিউইয়র্ক, ১৮৮৯)।

৬। বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্ধৃতির জন্য, তুলনীয় এ, রশীদ (A. Rechid), পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪২৬—৩০ ; নীস; les origines du droit international, ২১৬ পৃঃ। পোপ চতুর্থ নিকোলাস অখৃষ্টীয়দের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন, তুলনীয় নীস, ১৬১ পৃঃ। মনে হয় খৃষ্টান ধর্ম শাস্ত্রকাররা কখনো এ নীতি বর্জিত মতবাদ হতে বিচ্যুত হননি। হাঙ্গেরীর রাজা, ভ্লাদিসলাসের সঙ্গে তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের (১৪২১ থেকে ১৪৫১) যে চুক্তি হয়েছিল তা ভাঙার জন্য হাঙ্গেরীস্থ পোপের প্রতিনিধি হাঙ্গেরীরাজকে অধিকার দিয়েছিল বলে আমরা জানি ; সে বলেছিল, کفار ٤ ویریلا ن سوزک حکمی یوقدا 'বিধর্মীদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির কোন আইনগত বৈধতা নেই। তুলনীয় ইব্রাহীম হাক্কী, تا بین الدول تاریخ حقوق ইস্তাম্বুল সংস্করণ, ১৩০৩, ৪৯ পৃঃ)। এমনকি সমসাময়িক অধ্যাপক এল, ম্যাসীগননও এই যাজক নীতির সমালোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেছেন, তুলনীয়, অনুচ্ছেদ ৬৬০।

৭। পূর্বে উল্লেখিত ১৪১-২ পৃঃ।

৮। নীস, পূর্বে উল্লেখিত ১৪৩ পৃঃ।

৯। টি, এ, ওয়াকার, A History of the law of nations, প্রথম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

১০। গ্রটিয়াস হল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করে ফ্রান্সে দীর্ঘকাল কাটিয়ে আশ্চর্য হয়েছিলেন যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিম আইনে Postliminium (নির্বাসিত বা শত্রুর হাতে বন্দী ব্যক্তি দেশে ফিরলে তার পুরানো নাগরিক অধিকার ফিরে পাওয়ার বিধান) প্রচলিত ছিল। (তুলনীয়, De jure belli, দশম খণ্ড) এটা থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন পর্যালোচনা করেছিলেন। (এই সূত্রের জন্য আমি হানস ক্রুজ Hans Kruse সাহেবের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুসলিম আইনের নৈতিক ভিত্তি

মুসলিম আইনের মূলনীতি, উৎস এবং লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিম আইন নৈতিক মূল্যবোধের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করে না। গোড়ার দিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কেবল ধর্মের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। অচিরেই তাঁদেরকে অনেক বিষয় নিয়ে চর্চা করতে হয়। যথা, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি; তবুও সেগুলো সর্বসঞ্চারী কুরআনকে কেন্দ্র করে এবং তার অধীনতা মেনেই চলত : ইতিহাস প্রাথমিকভাবে পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখিত কাহিনীর ব্যাখ্যা, ভাষাতত্ত্ব (কাব্যসহ) পবিত্র গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের যথার্থ অর্থের ব্যাখ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা, কাবামুখী হওয়ার দিক নির্ণায়ক এবং প্রাত্যহিক সালাতের সময়-জ্ঞাপক, ব্যাকরণের লক্ষ্য, পবিত্র গ্রন্থের রচনা ও বাকধারার মান অক্ষুণ্ণ রাখা ইত্যাদি। কুরআনের উপর সমস্ত বিজ্ঞানের এই ভিত্তিই কবি ও অন্যান্যদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করত, এক অনৈসলামী ভাবধারার অস্বাভাবিক বিস্তৃতির প্রতিরোধ করত।

(১৩১) আমাদের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় আইনের শাখাসমূহ যখন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে তখন এরা এদের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে। এদের বিধানসমূহের জন্য কুরআন, সুন্নাহ বা গোঁড়া পদ্ধতির অনুমোদনের প্রয়োজন হত। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তোয়াক্কা না করে শুধু বিষয়ের খাতিরে আলাদাভাবে কোন বিজ্ঞান চর্চা মূলত মুসলমানেরা করেনি। ইহকালে ও পরকালে মানুষের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সব কিছুকে 'শরীয়া'র অধীন করা হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস ছাড়া মানুষ শয়তানীতে শয়তানকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং আল্লাহ মানুষের জন্য যা সৃষ্টি করেছেন তা ভোগ না করলে মানুষ হিসেবেই গণ্য হয় না। মধ্যম পন্থাই

ইসলামের বিধান خير الامور اوسطها এবং এমনকি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বেলায়, একথা সত্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সাধারণ আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হতে বিচ্যুত হলেও মানবীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়নি ; বরং শাশ্বত কুরআন ও সুন্নাহের মৌলিক ভিত্তিকে অটুট রেখেছে।

(১৩২) বিদেশীদের প্রতি আচরণের প্রশ্নটি মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের বিষয়। সর্বকালে সর্বদেশে শত্রু আপনজন হলে বিজয়ীকে কিছুটা সংযত আচরণ করতে দেখা যায়, কিন্তু বিদেশী শত্রুর বেলায় তা নয়। কারো কারো বেলায় গণহত্যা (আমালেকীদের বেলায়) অন্যান্যদের বেলায় অস্পৃশ্যতা ধর্মীয় আদর্শ ছিল, তথাপি অন্যান্যরা 'চুক্তিভঙ্গ করা পাপ কিন্তু বিধর্মীর সহিত সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করা অধিকতর পাপ' বলে যুক্তির অবতারণা করেছেন (যেমন আমরা ক্রুসেডেরা, শুনেছি)।

(১৩৩) এটা সত্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিপথগামী। তথাপি দেখা যাক পার্থিব ক্ষমতার শীর্ষকালে আন্তর্জাতিক আইনের পরম ধার্মিক ও চরম গোঁড়া মুসলমান গ্রন্থকারগণ এ সম্পর্কে কি বলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি মূলনীতিতে তাদের সবাই একমত এবং মুসলিম আইনের প্রত্যেক সংক্ষিপ্তসারে বার বার বলা হয়েছে যে, المسلم والكافر فى مصائب الدنيا سواء অর্থাৎ 'এই পৃথিবীর দুঃখদুর্দশায় মুসলিম এবং অমুসলিম সবাই সমান এবং সদৃশ।'[১] অন্যপক্ষ অমুসলিম এই অজুহাতে একজন আইন ও বিবেককে লঙ্ঘন করতে পারে না ; তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর একজন কোন অবস্থাতেই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। 'একের অপরাধে অন্যকে শাস্তিদান ইসলামে নিষিদ্ধ। শত্রুকে আশ্রয় দেবার ইসলামী রীতি 'অংশীবাদীদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে'[২] এই কোরানিক নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য অংশীবাদীদের আশ্রয় দানের কথা বলা হয়েছে।

কোন আশ্রয়প্রার্থীকে কোনক্রমেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বস্তুত মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিধির গোটা কাঠামো অমুসলিম-উদ্দেশ্যে গঠিত ; কারণ এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা ইসলামী বিশ্বকে এবং সম্পূর্ণ বলে গণ্য করত। অমুসলিম ও অপর রাষ্ট্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করাই ছিল মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য। মুসলমানদের উপর ইসলামের নির্দেশ সে নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হলেও পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ দপ্তরসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে হবে (কুরআন, সূরা নিসা, ১৩৪)।'[৩]

(১৩৪) আরও লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম আইন শাস্ত্রে আন্তর্জাতিক আইনকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মুসলিম আইনবেত্তাদের অটল মনোভাবকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। আমি বলতে চাই যে, আন্তর্জাতিক ব্যবহার বিধিকে তাঁরা মুসলিম আইনের অংশবিশেষ মনে করেন এবং তাঁরা আন্তর্জাতিক আইনকে শাসকদের ইচ্ছা বা রাজনীতিবিদদের খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দেন না। আন্তর্জাতিক আইনের এই আইনগত মর্যাদা শুধু বর্তমান নয় বরং বহু পূর্ব থেকেই স্বীকৃত। কারণ, প্রাচীনতম মুসলিম আইন সংহিতা জায়েদ ইবনে আলী (মৃত্যু ১২০ হিঃ) কর্তৃক রচিত 'আল মাজমু' গ্রন্থে আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্তি আমরা দেখতে পাই এবং পরবর্তীকালেও এ নিয়মের কোন পরিবর্তন হয়নি।

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদ দাবূসী বলেন, لان الله مافرق بيننا وبينهم فى أسباب اصابة الدنيا فانها ليست بدار جزاء

(যেহেতু আল্লাহ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার কারণসমূহের ব্যাপারে আমাদের এবং তাদের (অমুসলিম) মধ্যে পার্থক্য করেননি ; কারণ এই পৃথিবী কর্মফলের ক্ষেত্র নয়।)

২। আল কুরআন, সূরা তওবা, ৬।

৩। আবু ওবায়েদ তাঁর كتاب الا موال গ্রন্থে নবীর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন : وفاء موعد خير من غدر

(চুক্তিভঙ্গ করার চেয়ে চুক্তি পালন করা শ্রেয়)।

দ্বিতীয় খণ্ড

শান্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক নিরীক্ষা

(১৩৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ অথবা আক্রমণাত্মক সম্পর্ক (যে সমস্ত যুদ্ধরত রাষ্ট্র কোন চুক্তি বা নিষ্পত্তি ছাড়াই যুদ্ধ হতে বিরত হয় তাদের বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত নয়) এবং তাদের অধিকার এবং কর্তব্য নিম্নোক্ত শিরোনামায় আলোচনা করা যেতে পারে :

১। স্বাধীনতা

২। সম্পত্তি

৩। এখতিয়ার

৪। সমতা

৫। কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

(১৩৬) ছোট বা বড় সব রাষ্ট্র হয় সার্বভৌম এবং স্বাধীন, অথবা আংশিক সার্বভৌম বা অসার্বভৌম। আন্তর্জাতিক আইনে শেষোক্ত রাষ্ট্রের কোন স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক আইনে স্বাধীনতার প্রকৃত মানদণ্ড বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার নিরঙ্কুশ হলে আমরা তাকে সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করি। এই অধিকার যদি শর্তাধীন সীমাবদ্ধ কিন্তু মূলত অস্বীকৃত না হয় তাহলে আমরা একে আংশিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত করব এবং এই অধিকার কোন রাষ্ট্রের না থাকলে সে রাষ্ট্র অসার্বভৌম রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে। এ পরীক্ষা ছাড়াও স্বাধীনতার অন্যান্য চাহিদা রয়েছে যা আমরা এখনই আলোচনা করব।

(১৩৭) লক্ষ্যণীয় যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সরকার কাঠামোর কোন সম্পর্ক নেই। একটি রাষ্ট্র নির্বাচিত প্রতিনিধি সম্বলিত প্রজাতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে রাজতন্ত্রও হতে পারে। এমনকি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলামী বয়াত بيعة প্রথা অর্থাৎ আনুগত্য রক্ষার শপথ—যা নবীর আমল থেকেই চালু ছিল তার মধ্যে মোটামুটি সামাজিক চুক্তি এবং সাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। ঐশী নির্দেশে নবী ক্ষমতা লাভ করেন; তথাপি তাঁর কর্তৃত্বের উপর আস্থাশীল প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধিদের মারফত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আনুগত্য প্রকাশ করতে হত। নবীর ইন্তিকালের পর 'অহী'র মাধ্যমে ঐশী নির্দেশের পথ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন উত্তরাধিকারের প্রশ্ন ওঠে। বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার, সাধারণ নির্বাচন, দ্বৈত শাসন—এই তিনটি প্রস্তাব উত্তরাধিকারের ব্যাপারে উত্থাপন করা হয়। নবীর কোন পুত্র সন্তান ছিলেন না এবং নিকটতম আত্মীয় বলতে তাঁর ছিলেন এক চাচাতো ভাই, যিনি

আবার জামাতাও বটে। দ্বৈত শাসনের সপক্ষে আনসার বলে অভিহিত আদি মদীনাবাসীদের কারো কারোর অভিমত এইরূপ যে, আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং তোমাদের (মক্কাবাসীদের) মধ্য থেকে একজন শাসক হোক (منا امير و منكم امير)।[২] স্পষ্টত উভয় শাসককে একযোগে শাসন করতে হত যেহেতু রাজ্য ভাগ করা সম্ভবপর ছিল না। অথবা এটা বড় জোর স্থান অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুযায়ী দুই শাসকের অধিক্ষেত্রের বিভাগকরণ বুঝায়।[৩]

(১৩৮) জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার সম্বলিত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ আমল পেয়েছে বলে মনে হয় না। গোঁড়া খিলাফতও বংশানুক্রমিক ছিল না। সীয়া মত অনুযায়ী খলিফা আলী তাঁর পুত্র আল-হাসানকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টান্ত মুয়াবীয়া অনুকরণ করেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর পুত্রকে মনোনীত করেছিলেন। এমনকি এ ধরনের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও সাধারণত মনোনীত উত্তরাধিকার হিসেবে আনুগত্যের শপথ লওয়া ; কেননা এটা জনসাধারণের নিকট প্রস্তাব বৈ অধিকার বলে গণ্য হত না, এবং সেইহেতু জনসাধারণ, যাদের উপর মনোনীত উত্তরাধিকারী কর্তৃত্ব করবেন, তাদের সংগে এ চুক্তির প্রয়োজন ছিল। পুত্রের উত্তরাধিকার অপরিহার্য নয় (মুসলিম শাসনতান্ত্রিক আইনে জ্যেষ্ঠাধিকার কখনো স্বীকৃত নয়)। উমাইয়া ও আব্বাসীদের মধ্যে হামেশাই ভ্রাতা বা অন্যান্য জ্ঞাতি ভ্রাতা পুত্রের বর্তমানেও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। রাজপরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য করার অদ্ভুত আইন ওসমানীয় তুর্কীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতের মোগল সাম্রাজ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তরবারী ও যোগ্যতা এ বিষয়ের মীমাংসা করেছে। বহু পুত্রের বর্তমানে কন্যার উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতের সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬—৪০) একমাত্র দৃষ্টান্ত। গোঁড়া মতবাদের সঙ্গে এটাকে মিলিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শাসক নির্ণয়ে ইসলামে দুটি স্বীকৃত পথ আছে— শাসক নিজে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করবেন ; তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রের

দিকপালদের পরিচালনায় সাধারণ নির্বাচনে শাসক নিযুক্ত হবেন। নির্বাচিত ব্যক্তি শাসকের জ্যেষ্ঠ পুত্রও হতে পারেন বা অন্য কেউও হতে পারেন।

১৪০। বস্তুত সরকারী কাঠামো এবং ক্ষমতালাভ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বিবেচ্য বিষয় নয়। এখন দেখা যাক স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় আর রাষ্ট্র বলতেই কি বুঝায় ?

স্বাধীনতা ঃ

১৪১। (ولا تكون فوق يده يد قاهرة)[৪] ইব্‌নে খালদুন স্বাধীনতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, স্বাধীন সেই রাষ্ট্র যার উপর বহির্শক্তির প্রভাব খাটে না। অন্য কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার শাসন করার অধিকার—সে অধিকার এমন হবে যে, কোন বিদেশী শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করবে না।

১৪২। প্রতিটি মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার বিস্তৃতি ও প্রতিবিম্ব হচ্ছে স্বাধীনভাবে কাজ করার রাষ্ট্রীয় অধিকার[৫] (الاصل فى الناس الحرية) রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনায় স্বাধীনতার পূর্ণতা আপেক্ষিক। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা মানব সমাজের ইতিহাসে কোন স্থানে কখনো ছিল না। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও মানুষের দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান বহু প্রাকৃতিক বিঘ্ন, অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতির জন্য পারস্পরিক স্বাধীনতার সঙ্কোচন ও সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্ন রয়েছে। বলপ্রয়োগের দ্বারাই হোক বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারাই হোক, চুক্তি দ্বারাও স্বাধীনতার সঙ্কোচন ঘটে। বাধা দেবার কেউ না থাকলে একতরফা ঘোষণার মৌন সম্মতির প্রশ্ন রয়েছে।

(১৪৩) একই সঙ্গে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র না থাকলে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে একই সময়ে বহু স্বাধীন রাষ্ট্র বিরাজ করলেও সহ-অবস্থানের অধিকার অতীতে সহজে মেনে নেওয়া হয়নি। গ্রীকদেরকে তাদের দার্শনিকরা বুঝিয়েছিলেন, যারা গ্রীক নয় তারা গ্রীকদের ক্রীতদাস হবে এটাই প্রকৃতির ইচ্ছা।[৬] পৃথিবীর তিরিশ ভাগের এক ভাগের উপরও যারা

পুরো আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি, সেই রোমকরাও বিশ্বাস করতো তারাই পৃথিবীর মালিক। গোটা পৃথিবীকেই তারা নিজেদের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করত এবং দুনিয়ার সব মানুষের প্রভু বলে নিজেদের পরিচয় দিত।[৭] স্পষ্টত যতদিন ধর্মগুলো ছিল জাতীয় ব্যাপার তখন কোন জাতিই অন্যের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারত না এমনকি আত্মসমর্পণ করলেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহুদীদের আইন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে ঃ "যখন তুমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোন নগরের নিকট আগমন কর সেখানে শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন কর। যদি তারা তোমার শান্তির প্রস্তাবে নগর দ্বার উন্মোচন করে তখন তোমার এটিই পালনীয় হবে, নগরের সমস্ত অধিবাসী তোমার অধীন হবে এবং তোমার সেবা করবে। যদি তারা তোমার শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং তোমার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তুমি সে নগর অবরোধ কর ঃ যখন তোমার পূজনীয় প্রভু এই নগরকে তোমার অধীন করবেন তখন নগরের প্রতিটি পুরুষকে তলোয়ারের তীক্ষ্ণতায় হনন কর ঃ কিন্তু নগরের যত নারী, যত শিশু, যত গোধন এবং নগর মধ্যে বিরাজমান সমস্ত কিছু, গ্রহণযোগ্য সামগ্রী তুমি মালিক হিসেবে গ্রহণ করবে ; তোমার শত্রুর সব কিছু তুমি ভোগ করবে।[৮] ইহা তোমার পূজনীয় প্রভুর দান।"[৯]

(১৪৪) অপর পক্ষে ইসলাম বিশ্বাস করে ঐশী প্রত্যাদানের বিশ্বজনীনতায়, যার ভার ছিল মোহাম্মদের উপর ন্যস্ত।[১০] এটা সেই প্রত্যয় যা মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্ব-সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শে। যে জাতি গোষ্ঠী বা ভাষার ভিত্তিতে প্রভুত্ব স্থাপন করে সে জাতিকে আমরা নিশ্চয়ই পৃথকভাবে দেখব সে জাতি থেকে, যে জাতি মর্তলোকে স্রষ্টার স্বর্গরাজ্য[১১] স্থাপনে অভিলাষী,--যাদের কাছে মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে স্রষ্টার বাণী (বর্তমান ক্ষেত্রে কুরআন) চরম প্রাধান্য লাভ করে।[১২] প্রকৃতপক্ষে কোন শাসক আরব বা নিগ্রো[১৩] তাতে ইসলামের কিছু আসে যায় না, তবে তাকে মুসলিম হতে হবে অর্থাৎ তাকে স্রষ্টার অনুগত হতে হবে।[১৪] স্রষ্টার শত্রুকেই মুসলমানরা নিজেদের শত্রু বলে মনে করে—সে শত্রু বহুবাদী অংশীবাদী ও নিরীশ্বরবাদী। তারা বিশ্বকে জয় করতে চেয়েছে, লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়। তারা চেয়েছে আল্লাহ্‌র

ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের ধর্মে শান্তিপূর্ণভাবে দীক্ষা দিতে। গোষ্ঠীভিত্তিক ধর্ম যা কেবল জন্মগত অধিকারেই মানুষকে ধর্মের সুযোগ দেয় তারা তার বিরোধী। ধর্ম তাদের একচেটিয়া নয় বরং এ ধর্ম সকলের জন্য উন্মুক্ত, সকলকে সমান অধিকার দানে উদগ্রীব।[১৫] এক কথায় ইসলামী সভ্যতার বিস্তৃতি এবং আস্থা স্থাপনকারীদের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা গঠন মুসলমানদের লক্ষ্য—সে ব্যবস্থায় ধর্ম, সম্পদ ও অন্যান্য ভেদ-বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে বঞ্চিতের মৌলিক প্রয়োজনে সহায়তা যোগাবে (তুলনীয়, কুরআন, সূরা তওবা, ৬০ ; সূরা আনফাল, ৪১)।

(১৪৫) তবে এর অর্থ এ নয় যে, তারা ইত্যবসরে তাদের শাসনাধীন এলাকার বাইরের মানুষের অধিকার স্বীকার করত না। যারা যুদ্ধ চায় না[১৬] তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন এবং অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন কুরআনের নির্দেশ ; [১৭] এ পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্ এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই ক্ষমতাসীন করেন, এ কথাও কুরআন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে।[১৮]

রাষ্ট্র ঃ

(১৪৬) স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে, তার মৌলিক কার্যপদ্ধতিরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে দীনতম রাষ্ট্রীয় কর্মচারী জনগণের উপর তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, এবং এমন কি নগণ্য সরকারী কর্মচারীরাও সরকারী ক্ষমতা ব্যক্তিগত মর্জিমাফিক ব্যবহার করেন। অবশ্য কর্তৃত্বের (authority) উৎস সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ জনগণের ইচ্ছাই এর উৎস, কেউ দাবী করেন ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা, কেউ বা দাবী করেন ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে।

(১৪৭) এ ব্যাপারে ইসলামের ধারণা সম্পর্কে স্বীকৃত গ্রন্থকাররা সবাই একমত ঃ ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত পয়গম্বরদের মাধ্যমে ঐশী ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব। একে ধর্মতন্ত্র বলা যেতে পারে ; তবে আধুনিক

পাশ্চাত্য অর্থে নয়। কুরআনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কতিপয় উদ্ধৃতি বক্তব্যকে বিশদ করবে :

(ক) "রাজ্য তো আল্লাহেরই ! তিনি তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন।" (সুরা আ'রাফ, ১২৮)

(খ) "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি।" (সুরা বাকারা, ৩০)

(গ) "আমি তাহাকে বলিলাম, 'হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশীর অনুসরণ করিও না ; করিলে, ইহা তোমাকে আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে।" (সুরা সাদ, ২৬)

(ঘ) "বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা ছিনাইয়া লও, তুমি যাহাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী কর আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সুরা আল ইমরান, ২৬)

নবীর বাণী[১৯] ও গোঁড়া ধার্মিকদের ব্যবহারসহ কুরআনের অনুরূপ অসংখ্য আয়াত এ সত্যই উদঘাটন করে যে, আল্লাহ্ ইহ-পরকালের মালিক, খিলাফত পরিচালনার জন্য তিনি মানুষের হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। তাঁরই ইচ্ছায় মানুষ ক্ষমতা পরিচালনা করে।

(১৪৮) দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পূর্বেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। মুসলিম পণ্ডিতদের মতে রাষ্ট্র কি, খিলাফত বা আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের মৌলিক তত্ত্ব কি এবং অনুরূপ প্রশ্নাবলী যা মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে যথাযথভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। এখানে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিলেই হয় : (১) একই সময়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের স্বীকৃতি ; (২) একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ; এবং (৩) অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও তাদেরকে একই গোষ্ঠিভুক্ত মনে না করা।[২০]

(১৪৯) রাজীউদ্দীন সারাখসী আবু ইউসুফ ও সায়েবানীর অভিমত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন :

لما الدار انما تنسب الى اهلها لثبوت يدهم القاهرة عليها و قيام و لا يتهم الحافظة فيها (المحيط لرضى الدين السرخسى خطبة و لى الدين فى اسثنا نبول ورق ٥- ب)

(তাঁদের উভয়েরই ধারণা : জনগণের সহিত রাষ্ট্রীয় এলাকার সম্পর্ক এই হেতু যে, জনগণ সেই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ও আত্মরক্ষামূলক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।)

দ্বিতীয় বিষয়ের সম্পর্কে বলা যায় যে, মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে মূলত একটি জাতি[২১] হলেও, লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত মুসলমান বাস করেনি। এ ব্যাপারে কুরআনও কয়েকবার উল্লেখ করেছে :

(ক) কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নহে, তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র ; এবং কেহ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশত হত্যা করিলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তবে তাহার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহের ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২২]

(খ) তোমাদের কী হইল যে, তোমরা সংগ্রাম করিবে না আল্লাহের পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য ? যাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ, যাহার অধিবাসী জালিম, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও ; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও

আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।' ... ... যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশ্‌তাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম'। তাহারা বলে, "তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করিতে পারিতে আল্লাহের দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না।"[২৩]

(১৫০) সংখ্যালঘু সংক্রান্ত প্রশ্নটি খুবই পুরাতন।[২৪] গোড়ার দিকে বিদেশে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘুদের কথা বাদ দিলে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রই দুর্লভ ছিল। দিগ্বিদিকে ইসলাম প্রসার লাভ করলেও প্রসারিত সীমার অভ্যন্তরে মুসলমানগণ একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়নি। বসতি এলাকাগুলোর ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্যে বহু রাষ্ট্রে মুসলমানদের বিভক্তি ছিল অনিবার্য। বস্তুত, আমাদের স্বীকার করতেই হবে সে বিচ্ছিন্নতাকেও যা সৃষ্টি হয়েছিল গৃহযুদ্ধ সার্থক বিদ্রোহের দ্বারা। এটা এমনি ব্যাপার যে, প্রাচীন আইনবেত্তারাও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদদাবুসীয়ার সুষ্ঠু উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

لان الدارين فى الاصل ما امتاز اجراء الاحكام وتنفيذ الولايات وكذلك الولايات المختلفة فى دار الاسلام بين ملوك الاسلام لا تمتاز الا بالغلبة واجراء الاحكام ـ

(কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের পার্থক্য দ্বারা মুসলিম অমুসলিম শাসনাধীন এলাকার পার্থক্য নির্ণীত হয়। ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যেও এ সত্য পরিলক্ষিত হয় ; কেননা এসব স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের পার্থক্য থাকে)[২৫]

(১৫১) উমাইয়াদের পতনের সাথে সাথে স্পেন প্রাচ্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। পরে, যখন আব্বাসী সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু

অবস্থা সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসকবর্গ বংশানুক্রমিক শাসক ও প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠে। তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন এবং অপরাপর চুক্তি সম্পাদন করতেন। খলিফার মতামত ব্যতিরেকে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। খলিফার প্রতি তাঁদের নামেমাত্র আনুগত্যের কথা পরবর্তী কোন অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।[২৬] একটি কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দিয়ে এর উপসংহার করব। লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, উত্তর আফ্রিকার যে অঞ্চলে আব্বাসী সাম্রাজ্য, ইদ্রীসী রাজ্য ও স্পেনের উম্মাইয়া রাজ্য সাধারণ সীমান্ত রচনা করেছে সেখানে খলিফা হারুন আল রশীদ একটি ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন এবং এই রাজ্যের শাসনভার তিনি তুলে দেন আগলাবী বংশের হাতে। তাঁরা পুরো স্বাধীনভাবেই সে রাজ্য শাসন করতেন, শুধু জামে মসজিদে জু'মার নামাজের খুতবায় বাগদাদের খলিফার নাম উল্লেখ করতেন।[২৭]

রাষ্ট্রের একত্রীকরণ ঃ

(১৫২) আধুনিক যুগের কিছু নজীর ও প্রথার স্বীকৃতি দানের দু-একটি কথা বলা দরকার। বেশীর ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড গত কয়েক শতাব্দীতে একের পর এক অমুসলিমদের করতলগত হয়েছে—বিশেষত ওলন্দাজ, রুশ, ফরাসী এবং ইংরেজদের। গণমানসে রাজনৈতিক চেতনার অভ্যুদয়ে এবং পরিবেশের আনুকূল্যে ক্রমে ক্রমে তারা মুক্তি লাভ করেছে। ইন্দোনেশীয়দের আস্থা দীর্ঘকাল লালনের প্রচেষ্টায় ওলন্দাজ নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের বিচ্ছেদ যতটা গভীর ও সর্বসম্পর্করহিত ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ ক্ষেত্রে ততটা নয়। রুশরাও তাদের শাসনাধীন বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী অঞ্চলকেও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে ঃ রুশ যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার, বৈদেশিক সম্পর্ক, পৃথক বাহিনী গঠন ইত্যাদি অধিকার। এ কথাগুলো লেখার সময়ে উল্লেখিত অধিকারগুলো তাদের জীবনে বিশেষ স্পষ্ট না হলেও (১৯৬০) কালের আবর্তে আঞ্চলিক স্বাধীনতা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। ফরাসীরাও তাদের মুসলিম উপনিবেশগুলোকে

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা জাতিসংঘেও আসন লাভ করেছে ; অবশ্য সামরিক ঘাঁটি, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং অন্যান্য বন্ধন স্বাধীনতাকে করেছে অর্থহীন। এককালের পরাধীন দেশগুলোকে বৃটীশ কমনওয়েলথ তাদের মৌলিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের কমনওয়েলথ ত্যাগের অধিকারও অতি বাস্তব। কিন্তু কতিপয় সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র সর্বপ্রকার স্বাধীন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্র সংঘ, সমিতি বা কমনওয়েলথভুক্ত হতে পারে তা প্রাচীনকালে কল্পনাতীত ছিল। হয়তো কমনওয়েলথ প্রধানের পদটা একদিন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো পালাক্রমে উপভোগ করবে এবং যুক্তরাজ্যের শাসকের একচেটিয়া অধিকারে থাকবে না। যাহোক, এই বিশেষ সমিতিগুলোর সঙ্গে জাতিপুঞ্জ বা বর্তমান জাতিসংঘকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। অন্য কথায় স্বেচ্ছায় 'অধীনতামূলক' সহযোগিতায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষুণ্ণ হয় বলে বিবেচিত হয় না। তথাকথিত নয়া উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও উপেক্ষণীয় নয়। উপনিবেশগুলোর প্রাক্তন প্রভুদের গৃহীত নীতির ফলে যে জটিলতা ও অবনতি দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাষ্ট্রগুলোর অধিবাসীদের বহু যুগ অপেক্ষা করতে হবে, এ জটিলতা ও অবনতি সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত—বৌদ্ধিক, নৈতিক, আর্থিক ইত্যাদি। সমষ্টিগত শক্তিকে বিভাগের দ্বারা শাসনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম কলহ সৃষ্টির গুরুত্ব তুচ্ছ নয়।

(১৫৩) আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত। সংক্ষেপে এটা নিয়ে আলোচনা করা যায়।

(১৫৪) হস্তক্ষেপ ঃ

স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার অধিকার দেয়। কিন্তু অধিকার ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মুক্তিকে সার্থক করতে গেলে অন্য রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপও বন্ধ রাখতে হবে। তবুও সময়ে সময়ে হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক নয় ঃ (১) আত্মরক্ষার্থে ও (২) হস্তক্ষেপের চেয়েও অকল্যাণকর অবস্থার প্রতিরোধের জন্য।

(১৫৫) আত্মরক্ষার্থে হস্তক্ষেপ প্রতিশোধমূলক অথবা প্রচলিত চুক্তি লংঘনের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, কুরআন[২৮] ও নবীর ব্যবহারিক জীবনে[২৯] এর অনুমোদন আছে। দণ্ডদান ও হস্তক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কখনো কখনো দুরূহ ব্যাপার। হস্তক্ষেপের মূলে আছে বল প্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি, তা প্রকাশ্যই হোক আর অপ্রকাশ্যই হোক; যার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। একদা কতিপয় খৃষ্টান প্রজা মুসলিম শাসনাধীন এলাকা ত্যাগ করে বাইজেণ্টাইন শাসনাধীন এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বাইজেণ্টাইন সম্রাট[৩০] কর্তৃক তাদের প্রত্যার্পণের কারণ হচ্ছে খলিফা ওমরের হস্তক্ষেপ।

(১৫৬) মানবতার খাতিরে অর্থাৎ মুসলিম গ্রন্থকাররা যাকে বলে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, হস্তক্ষেপের ব্যাপার অজ্ঞাত ছিল না। এমনকি মুসলিম প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে এটা গণ্য করা হয়েছে: তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।[৩১]

"তোমাদের মধ্যে একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকার্যে নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।"[৩২]

এবং আরও কতিপয় আয়াতে এর উল্লেখ আছে। নবীর বহু হাদীসের মধ্যে মাত্র একটির আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অশোভন কিছু দেখ নিজের হাতে তার রূপান্তর ঘটিও; যদি তাতে ব্যর্থ হও তবে কথা দ্বারা সম্পাদন কর; তাও যদি না পার অন্তরের প্রয়োগের দ্বারা (অসম্মতি জ্ঞাপন ও প্রার্থনা ইত্যাদি) তা সম্পন্ন কর কিন্তু শেষটা তার ইমানের চরম দুর্বলতার পরিচয় দিবে।"[৩৩]

(১৫৭) হস্তক্ষেপের সমর্থনে কুরআনে নির্দেশ আছে, "হত্যার চেয়ে ফতনা নিকৃষ্ট"[৩৪] এবং আইনেও উল্লেখ করা হয়েছে يختار أهون الشرين অর্থাৎ দুটি মন্দের লঘুটাই কাম্য।[৩৫]

(১৫৮) মুসলিম আইনবেত্তাদের মতে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র শরিয়তের[৩৬] মারাত্মক খেলাপ করে তবে অন্য একটি মুসলিম রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সেখানে প্রয়োজন। শিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক গোঁড়া খলিফারা প্রকাশ্য নিন্দিত হওয়ার ফলে তাতে হস্তক্ষেপ করার জন্য সুন্নীরা যথার্থ কারণ খুঁজে পায়। এটা ধর্মহীনতার[৩৭] সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

(১৫৯) হস্তক্ষেপকে আমরা অবশ্যই প্রতিবাদ, উপদেশ, শুভ প্রচেষ্টা, মধ্যস্থতা এবং সালিশ থেকে পৃথক করে দেব। সম্পাদিত অপরাধের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংশোধনের পরিবর্তে নিছক প্রতিবাদ[৩৮] আসলে অনুভূতিরই প্রকাশ মাত্র। উপদেশের ক্ষেত্রে[৩৯] কল্যাণ কামনায় বন্ধুত্বসুলভ প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন সক্রিয় সমর্থন থাকে না। শুভেচ্ছানুমোদিত কাজ ও মধ্যস্থতা[৪০] বলতে আমরা বুঝি বিবদমান উভয় দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্র রচনা করা। সালিশের[৪১] ক্ষেত্রে বিবদমান উভয় দল পূর্বাহ্নে কোন তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসরণে একমত হয়ে বিচারপ্রার্থী হয়। এগুলোর কোনটির ক্ষেত্রেই জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা বশীভূত করার প্রশ্ন ওঠে না যা হস্তক্ষেপের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

টীকা

১। তুলনীয়, wensinck. مفتاح كنوز السنة এর بيعة অধ্যায়।

২। ইবনে হিসাম. পৃ: ১০১৬ ; তাবারী, ইতিহাস, ১,১৮২৩।

৩। মুসলমানরা দ্বিশাসকত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার কারণ যে শুধু এটা অযৌক্তিক ছিল তা নয়, আনসার গোত্রীয় আওসী ও খাজরাজীদের অন্তর্দ্বন্দ্বও অন্যতম কারণ। (তাবারী, ইতিহাস, ১,১৮৪৩) তবুও মুসলিম ইতিহাসে এর কতিপয় দৃষ্টান্ত রয়েছে যার মধ্যে একটা আছে গাজনিস্থ মোহাম্মদ গজনভীর বংশে।

'তাদের রক্তপাত করার পর মওদুদ নিজের পিতার আসনে নয় বছর শাসন পরিচালনা করেন, তাঁর পরলোকগমনের পর অন্যেরা শাসনভার গ্রহণ করেন। তারপর আলী ও মোহাম্মদ যুক্তভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলী ছিলেন মাসুদের পুত্র এবং মোহাম্মদ, মওদুদের পুত্র। আলী এবং মোহাম্মদ যুগ্মভাবে দুই মাস শাসন করার পর শোনা যায়, একদিন সেনাবাহিনীর প্রধানরা তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করেন।'

ফুতুহস সালাতীন, ইসামী, শ্লোক নং ১২২০—৫ (আগ্রা সংস্করণ, ১৯৩৮)। অন্য একটির জন্য তুলনীয় ১৮৬—৮৭ অনুচ্ছেদ, "রাজ্য ও যুগ্মশাসনে বিধিবদ্ধ অংশ।" আরও তুলনীয়, (কুরআন ২০. ৩২) দ্বৈত শাসনের জন্য واشركه فى امرى

৪। "Progumena", পরিচ্ছেদ ত্রিবিংশ।

৫। সরাখসী, ৪, ৭১।

৬। এরিষ্টোটল, পলিটিক্স, প্রথম অংশ, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৭। ফিলিপসন, International law and custom, ১, ১০৪।

৮। তুলনীয়, অপরপক্ষে নবীর হাদীস অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রথম বৈধ বলে স্বীকৃতি পায় অথচ পূর্বের ধর্ম অনুযায়ী তা ভস্মীভূত করা হত (বুখারী, জিহাদ খণ্ড, পরিচ্ছেদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্ত আইন; তিরমিজী সিয়ার খণ্ড, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ; তাবারী. তাফসীর সূরা আনফালের ৬৮, ৬৯ আয়াত, তাবারী, ইতিহাস, ১. ১৭১০)। এর প্রচলিত ব্যবহার সম্পর্কে বাইবেলেও এর স্বীকৃতি মেলে, Dentero-nomy, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ১৩—১৮।

৯। Denteronomy, ২০, ১০—১৪। মুসলিম আইনের সঙ্গে তুলনার জন্য নবীর নির্দেশ. নির্ঘণ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য, এই বইয়ের ৬৪৬ অনুচ্ছেদ।

১০। তুলনীয়, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ৭৯-৮৪ অনুচ্ছেদ।

১১। কুরআন, সূরা আনফাল, ৩৯ আয়াত।

১২। তিরমিজী, ফাদাইল আল-জিহাদ ঃ

[নবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "কেউ কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, কেউ বা যুদ্ধ করে পরিবার পরিজনের মতে, আবার তেমন মানুষও থাকে যারা কেবল লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে আছে কারা ? আল্লাহ্‌র নবী জবাবে বললেন : "তারাই মাত্র আল্লাহ্‌র পথে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে সফল করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে।"

১৩। আল-কাসানী, بدائع الصنائع ৭ম পরিচ্ছেদ ৯৯। তুলনীয়, বুখারী, 'নেতা যদি নাককাটা নিগ্রোও হয় তার আদেশ পালনীয়।'

১৪। তুলনীয়, কুরআন, সূরা নিসা, ৫৯।

১৫। কুরআন, সূরা নিসা, ১২৩, সূরা ইনশিরাহ, ১০ ; সূরা আলে-ইমরান, ১০৩ ইত্যাদি। তুলনীয় ইবনে হিশাম বর্ণিত দশম হিজরীতে নবীর বিদায় হজ্জের ভাষণ, ৯৬৮-৭০ পৃঃ ; ইয়াকুবী, ২, ১২২-২৩ ; যাহিজ, البيان والتبيين ২, ২৪।

১৬। কুরআন, সূরা আনফাল ৬১ আয়াত।

১৭। ঐ, সূরা নিসা, ৯০, ৯২ ; ঐ, সূরা নিসা, ৭২ আয়াত ; সূরা ১৭, ৩৪ আয়াত ; সূরা মোমেনুন আয়াত ৮ ; সূরা মা'আরিজ, ২৩, সূরা বাকারা, ১১৭ ; সূরা আল-ইমরান, ৭৬ ; সূরা মায়িদা, ১ ; সূরা তওবা, ৭।

১৮। কুরআন ; সূরা আলে-ইমরান, ২৬ ; সূরা আনয়াম, ১৩৪ ; সূরা, ১১, ৫৭ ; সূরা ২৪, ৫৫ আয়াত ইত্যাদি।

১৯। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মারাখনী কর্তৃক উদ্ধৃত, "সুলতানী কর্তৃত্ব দুনিয়াতে আল্লাহের ছায়া স্বরূপ" شرح السير الكبير (১, ১৫) দ্রষ্টব্য।

২০। ঐ, ৪, ২০১-২, ইত্যাদি।

২১। তুলনীয়, (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪১), নবীর আমলে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, অনুচ্ছেদ ২ : তারা মানবজাতির অপরাপর অংশ থেকে একটি স্বতন্ত্র জাতি।

২২। কুরআন, সূরা নিসা, ৯২।

২৩। ঐ, সূরা নিসা, ৭৫, ৯৭।

২৪। উর্দু ত্রৈমাসিক 'মিয়াসাতে' ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত 'হিজরাতে' নামক আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৫। আদ-দাবুসী, কিতাবুল ইসরার (পাণ্ডুলিপি, ওয়ালিউদ্দীন, ইস্তাম্বুল, নং ১৪০২)।

২৬। ১৯০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৭। ফরিদ রিফাই, আসরুল মামুন, ১, ১২৮।

২৮। তুলনীয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুরআন, সূরা আনফাল, ৫৬-৫৮।

২৯। মুসলিমদের মিত্রদের প্রতি মক্কাবাসীদের দুর্ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল ও মক্কা বিজয় সম্পর্কে আমি উল্লেখ করছি। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮০২ ; তাবারী, ইতিহাস ১, ১৬২১ ; নবীর অন্যান্য জীবনী)।

৩০। তাবারী, ১, ৩৫০৮।

৩১। কুরআন, সূরা আল-ইমরান, ১১০।

৩২। ঐ, আল-ইমরান, ১০৪।

৩৩। মুসলিম হাদীস, ১, ৫০।

৩৪। কুরআন, সূরা আল বাকারা, ১৫১।

৩৫। مجلة الاحكام العدلية প্রথম পরিচ্ছেদ ; সরখসী, شرح السير الكبير ৩, ৩৩২, ৪, ৪৬ ইত্যাদি।

৩৬। যে কোন ওসূলের কিতাবে 'সংগত কারণ' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭। فتاوای عالمگیریة।

৩৮। নবীর চিঠি ও দূতের প্রতি পারস্য সম্রাটের রূঢ় ব্যবহারের জন্য নবীর দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক শালীনতা ভঙ্গের প্রতিবাদ বৈ আর কিছু নয়।

৩৯। প্রাচীন কালের চেয়ে আধুনিক কালে অনুরূপ ঘটনা বেশী দেখা যায়।

৪০। নবীর আমলে মাজদী ইবনে আমর সংক্রান্ত ঘটনার জন্য তাবারী, পৃঃ ১২৬৫ ও ইবনে হিশাম, ৪১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪১। ইবনে হিশাম, ৬৬৯—৭০ পৃঃ, ৬৭৩ পৃঃ, (কুরাইজার মামলা) ; দিনাওয়ারী ১৬৯—৯৯ পৃঃ ; তাবারী, ইতিহাস, ১, ৩৩৩৬—৮ (আলী ও মোয়াবীয়ার মামলা)।

মোয়াবীয়ার সাথে ত কলহে আলী কেন সালিশের অভিমত মানতে পারেননি তার ব্যাখ্যার জন্য কিছু বলা দরকার। সালিশের সিদ্ধান্ত কিসের ভিত্তিতে গৃহীত হল তা গুরুত্বপূর্ণ নয় ; গুরুত্বপূর্ণ হল সালিশের সিদ্ধান্তটা। আলী ও মোয়াবীয়ার মামলার সালিশে ছিলেন দুই ব্যক্তি এবং রায়ে তাদের মতভেদ ছিল। এরূপ বিভক্ত রায় মেনে নিতে স্বাভাবিক কারণেই কোন পক্ষ বাধ্য নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পত্তি

(১৬০) সাধারণ মানুষের মত রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি থাকতে পারে এবং থাকেও।

(১৬১) রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রথম বস্তুটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড। রাষ্ট্রের সাথে ভূখণ্ডের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট যে সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এমনকি নির্বাসিত বৈধ শাসকরাও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডেরই দাবীদার।

(১৬২) ভূখণ্ড বলতে এখানে কেবল রাষ্ট্রীয় শাসন এলাকার ভূপৃষ্ঠকেই বোঝাচ্ছে না বরং ভূপৃষ্ঠের নিম্নে ও উর্ধ্বে বিরাজমান মাটি, পানি ও আকাশকে বুঝায়। স্পষ্টত প্রাচীন কালে যখন বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি হয়নি তখন রাষ্ট্রগুলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টির যতটুকু শাসন করার ক্ষমতা রাখত ততটুকু তারা দাবী করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হল তার আগেই মানুষ সমুদ্রকে ও সেইসঙ্গে পাতালপুরীর খনিজ সম্পদকেও জয় করেছে এবং আকাশ প্রসঙ্গে বলতে হয় তখন বিমান ছিল না, বেতার প্রচার ছিল না আর কৃত্রিম উপগ্রহের বালাই ছিল না। যাহোক, আরব আইনবেত্তারা বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের উপরে ও নীচে যা কিছু আছে তার মালিক রাষ্ট্র। তাই তারা জনস্বার্থে নির্মিত মসজিদ, বিদ্যালয় ইত্যাদি ইমারতগুলির উপর বা নীচে কোন কিছু নির্মাণের অধিকার জনসাধারণকে দেয়নি।[১] পানি সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরে করব।

(১৬৩) নিঃসন্দেহে, মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধর্মীয় ভিত্তি আপেক্ষিক মালিকানা বা আল্লাহর আমানত ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানা স্বীকার করে না। তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র এবং আল্লাহে অবিশ্বাসী রাষ্ট্রের মধ্যে ভূখণ্ড সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহের চূড়ান্ত মালিকানার অর্থ এই যে, মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক আমানতদার এবং শাসনক্ষমতার অধিকারী এবং শাসকের ক্ষমতার উৎসও আল্লাহ। নবীর ভাষায় শাসককে 'আল্লাহ্‌র ছায়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং যে কেউ একে অবমাননা করে, বলতে

গেলে, আল্লাহকে অবমাননা করে।[২] এও লক্ষ্যণীয় যে আল্লাহের অনুমোদন সত্ত্বেও মুসলিম শাসক স্বেচ্ছাচারী নয়। প্রথমত তিনি তাঁর রাজ্যের যে কোন সাধারণ প্রজার মত আইন অর্থাৎ 'শরীয়া'র অধীন। উপরন্তু, সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ক্ষমতার বলেই শাসক ক্ষমতায় থাকেন ; :আল্লাহের হস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি'[৩] এবং 'আমার সম্প্রদায় কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না' এই নীতির বলে তিনি শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক গদিচ্যুত[৪] হতেও পারেন।

(১৬৪) অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা হতে আলাদা যেখানে ব্যক্তিবিশেষ শাসকের প্রতিভূ হিসেবে জমির মালিকানা ভোগ করে, ইসলামী আইনবেত্তাগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি মালিকের ঐশী ক্ষমতার অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত ক্ষমতার অভিপ্রকাশ বা প্রতিফলন মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ আবু হানিফা বলেছেন বলে শোনা যায় ঃ 'মুসলিম রাজ্যের সমস্ত অংশ 'ইমাম' অর্থাৎ মুসলিম শাসকের কর্তৃত্বাধীন এবং তার এই কর্তৃত্ব মুসলিম সম্প্রদায়েরই কর্তৃত্ব।[৬]

(১৬৫) আমরা লক্ষ্য করেছি যে রাষ্ট্র ভূখণ্ডের মালিক[৭]—এর বিশদ আলোচনা আমরা এখনই করব—তথাপি তাই সব নয়। ভূখণ্ড ছাড়াও রাষ্ট্র অনেক কিছুর মালিক হতে পারে বা হয়েও থাকে যেমন, দালান কোঠা, যান-বাহন, টাকা-পয়সা, খাদ্যসামগ্রী, ব্যবসায়ের হিসাব পত্র ইত্যাদি। আপোষ বা জবরদস্তিমূলক এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের এই সব সম্পত্তি দখল বা এদের নিষ্পত্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন প্রযোজ্য হয়।

(১৬৬) রাষ্ট্রের সম্পত্তির সেরা সম্পত্তি ভূখণ্ড। এর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

সীমানা

(১৬৭) সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি বরাবরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক দুরূহ ব্যাপার। বিধান এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি সীমানার মধ্যে নদী কিংবা হ্রদ থাকে রাষ্ট্রসমূহের সীমানা পানির মাঝামাঝি

পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে যদি না বিধান বা চুক্তি সাপেক্ষ অন্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে।[৮]

(১৬৮) পানি সংলগ্ন ভূখণ্ডের অচ্ছেদ্য অংশ সাধারণত এই নীতিই এর উল্টোটি নয়, মুসলিম আইন বলে স্বীকৃত।[৯] অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র এমন কোন ভূখণ্ডের মালিক হয় যার চারদিক পানি দ্বারা বেষ্টিত, আপাত দৃষ্টিতে ধরে নিতে হবে, সে রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট পানিরও মালিক—দৃষ্টান্তস্বরূপ হ্রদ। যেহেতু একটি রাষ্ট্র পানির মালিক সেহেতু সে রাষ্ট্র পানিসংলগ্ন ভূখণ্ডেরও মালিক এই নীতি মুসলিম আইনসম্মত নয়।

মুক্ত সমুদ্র

(১৬৯) স্পষ্টত, মুক্ত সমুদ্র সাধারণ জলধারা বা হ্রদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। প্রাচীন লেখকগণ এ সম্পর্কে কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন। মালিকবিহীন সম্পত্তি অথবা অমুসলিম ভূখণ্ড হিসেবে একে গণ্য করা হবে কিনা এ বিষয়ে পরবর্তী আইনবেত্তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। উভয় ক্ষেত্রে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগভিত্তিক যুক্তির অবতারণা করেন। শত্রু কর্তৃক মুসলিম সম্পত্তি দখল এবং তা তাদের ভূখণ্ডে অপসারণ করে নিরাপদকরণের ব্যাপারে বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে আবেদীন এই বিষয়টির উপর বিভিন্ন আইবেত্তার মতামত বিশ্লেষণ করেন ঃ

………যদি তারা (শত্রু) ইহা তাদের নিজস্ব নিরাপদ এলাকায় লইয়া যায়। মুক্ত সমুদ্র এবং অনুরূপ বিষয়াদি শত্রু এলাকার অন্তর্ভুক্ত ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মরুভূমি, যার বাইরে কোন ইসলামী ভূখণ্ড নেই। এই মতটি হামাবীর (মৃত্যু ১০৯৮) বলে বলা হয়। আবু আল সুদ আল-হামেলীর ভাষ্যের উপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেন, সমুদ্রের উপরিভাগ অমুসলিম ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য হবে। আল সরনবিলালী (জন্ম ১০৬৯ হিঃ, গনিয়াতু জাবিল আহকাম ফি বাগিয়াতি দুরলিল আহকাম গ্রন্থের রচিয়তা) তাঁর গ্রন্থের দশমাংশ আয়কর বিষয়ক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী আল কিনানীকে (যিনি হিদায়ার পাঠক হিসেবে পরিচিত) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মুক্ত সমুদ্রকে কি মুসলিম না অমুসলিম

ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন ঃ যেহেতু এর উপর কারোর নিয়ন্ত্রণ নেই সেহেতু এর মালিক এদের কেউ নন। আল হাসকাফী তাঁর গ্রন্থ আদ দুররুল মুনতাফীতে (ইব্রাহীম আল হালাবী রচিত মুলতাফীল আবহার নামক গ্রন্থের ভাষ্য হিসেবে ১০৮০ হিজরীতে সংকলিত) এই মত পোষণ করেন যে মুক্ত সমুদ্র অমুসলিম ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[১০] [একই লেখক অন্যত্র উল্লেখ করেছেন[১১]] 'আননাহার' গ্রন্থের লেখক বলেনঃ যা মুসলিম অথবা অমুসলিম ভূখণ্ডের কোনটারই অন্তর্গত নয় তা অমুসলিম ভূখণ্ডের অংশ বলে বিবেচিত হবে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুক্ত সমুদ্র যার উপর কারোরই নিয়ন্ত্রণ নেই... ... এছাড়াও মুক্ত সমুদ্র অমুসলিম ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং, মুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম প্রজার বিনা অনুমতিতে সেখানে গমন করলে অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হবে এবং তার আনুগত্য অস্বীকৃত হবে। পুনরায়, যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা সেখানে যায় এবং পৌঁছার পূর্বে ইসলামী ভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তার পুরানো ছাড়পত্র আর বৈধ থাকবে না ; তার যাবতীয় মালপত্রের উপর শুল্ক ধার্য করা হবে।"

(১৭০) এ আলোচনা হতে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে এইসব আইনবেত্তার মতামত তাদের ছোট ছোট নৌকা নিয়ে সমুদ্রের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অসুবিধাভিত্তিক। পরোক্ষভাবে তাঁরা স্বীকার করেন যে মুসলিম আওতা ততদূর ব্যাপ্ত যতদূর তারা নিয়ন্ত্রণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পরবর্তীকালে তুর্কীরা কৃষ্ণ সাগরকে তাদের আওতাধীন করেছিল এবং কোন মুসলিম আইনবেত্তা এর বৈধতা অস্বীকার করেননি।

(১৭১) ভূখণ্ডসংলগ্ন পানি সম্পর্কে নবীর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রত্যেক ভূমিরই একজন অধিকারী আছে (যা মালিক ভিন্ন অন্য কারো বেলায় নিষিদ্ধ)' এ কথা নবী বলেছেন বলে শোনা যায়। (ইন্নাহু ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম জায়লা লিকুল্লে আরদি হারিমা)[১২] কূপ, রাস্তাঘাট, নৌচলাচল পথ, খাল, বাড়ী প্রভৃতি দেশীয় আইনের ক্ষেত্রে এই বিধির যথেষ্ট প্রয়াগ হয়েছে,[১৩] অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমুদ্রের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রয়োগের

ব্যাপারে বিশেষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত তখন এর কোন প্রয়োজন ছিল না। মুসলিম আইনশাস্ত্র অনুযায়ী সমুদ্রও মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ঃ

(ক) আল্লাহ্ তো সমুদ্রকে অধীন করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের যাহাতে তাঁহার আদেশে জলযানসমূহ চলাচল করিতে পারে সমুদ্র বক্ষে এবং যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ;

তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু ; নিজ অনুগ্রহে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তো ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।[১৪]

(খ) তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্যাহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যদ্দারা তোমরা অলংকৃত হও ; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া জলযান চলাচল করে এবং ইহা এই জন্য যে তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১৫]

(১৭২) মুসলিম রাষ্ট্র যদি উহার কোন অংশ অপর কারো নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে সেক্ষেত্রে তা মুসলিম ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাহোক, এটা লক্ষ্যণীয় যে মুসলিম আইনবেত্তাগণ সর্বদাই গণ ও ব্যক্তি স্বার্থমূলক বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। গণস্বার্থমূলক বিষয়ের একচেটিয়া অধিকার ব্যক্তিবিশেষকে দেয়া যেতে পারে না ঃ

তাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস এবং এদের মত অন্যান্য বড় নদী বা উপত্যকা যা থেকে ভূমিতে পানি দেয়া হয় বা মানুষ ও পশুর পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হয় মুসলমান সবাই এর সদ্‌ব্যবহার করেন। এই সব বড় বড় নদীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহাদের তীরের সংস্কারের দায়িত্ব সরকারের। বড় নদীগুলো অন্যের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ব্যক্তিমালিকানাধীন এরূপ ক্ষুদ্র নদীগুলোর মত নয়। ... ...তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস অনুরূপ নয়, যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এগুলো থেকে

নিজভূমিতে পানি সেচ করতে পারে ; এতে নৌকা চলাচল করে, শুধু ব্যবহারের দ্বারা এর উপর কারোর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই ওঠে না।[১৬]

(১৭৩) সাধারণের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন জিনিষের 'জাগীর' দিতে নবী নিজে একাধিকবার নিষেধ করেছেন।[১৭]

(১৭৪) আন্তর্জাতিক জলপথ, এমনকি লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সংগে যোগ করার কথাও প্রাচীনকালে ভাবা হয়েছে যদিও সমরকৌশলজনিত জটিলতার ভয়ে তা কখনো কার্যকরী করা হয়নি। এ ধারণায় আমার কোন দ্বিধা নেই যে যদি সত্যি সত্যিই এ চিন্তা বাস্তবায়িত হত তবে তা পূর্ণ সত্ত্বাধিকার ও যানবাহনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্বলিত সাধারণ নদী ও খাল হতে ভিন্নরূপ হত না। খলিফা ওমরের[১৮] সময় কায়রো থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত যে বিখ্যাত খালটি খনন করা হয়েছিল তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত যদি ঐ খালটি পোর্ট সাইদের সন্নিকট ফারামা[১৯] পর্যন্ত বিস্তৃত করা হত। মুসলিম রাজ্যের নদী ও খাল এবং অন্যান্য জলপথ শান্তিপূর্ণ যানবাহনের জন্য খোলা ছিল এবং বিদেশীরা যদি জলপথে তাদের দেশ থেকে কিছু নিয়ে আসত সেজন্য চলতি নিয়মমাফিক তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করা হত।[২০]

ভূখন্ড লাভের পদ্ধতি

(১৭৫) মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক নূতন ভূখণ্ড লাভের পদ্ধতিগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায় ঃ
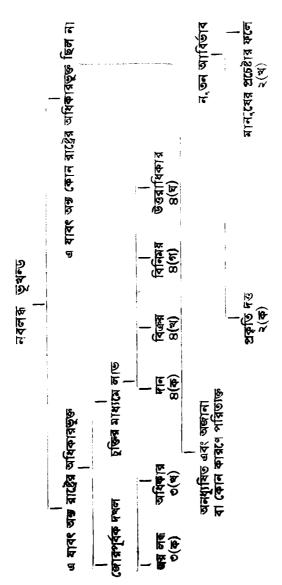
(১৭৬) (১) দূরত্ব অথবা আবিষ্কার না হওয়ার ফলে যে ভূখণ্ড এখনও কোন রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয়নি ভোগ দখলে তা লাভ করা যেতে পারে। এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত প্রাথমিক মুসলিম ইতিহাসে নেই কেবল

একটি ছাড়া। একবার একদল আরব বাত্যাহত হয়ে একটি অজানা দ্বীপে পৌঁছেছিল এবং তারা ফিরে এসে নবীর কাছে আজগুবি গল্পের বিবরণ দিয়েছিল।[২১] সংযোজন স্পষ্টতই আশা করা যেত না। পরবর্তী ভ্রমণ সাহিত্যে নির্ভীক মুসলিম নাবিক কর্তৃক নূতন নূতন দ্বীপ আবিষ্কারের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। এ সমস্ত নাবিক ছোট ছোট নৌকা নিয়ে পারস্য এবং মিশর থেকে চীন পর্যন্ত সমুদ্র পাড়ি দিত, যা ভাবলে আধুনিক নাবিকগণও বিস্ময় বোধ করে ; কিন্তু এ সমস্ত দ্বীপ দখলের কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এমনকি আরবদের আমেরিকা আবিষ্কারের[২২] কোন গুরুত্ব নেই কেবল সবেমাত্র উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয়েছে এ ছাড়া। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়ার জন্য মুসলিম কর্তৃক দক্ষিণ সাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের হাজার হাজার দ্বীপ দখলের ইতিহাস লেখা এখনও বাকী রয়েছে।

(১৭৭) (২) নূতন ভূমির আবির্ভাব দু'প্রকারের হতে পারে ঃ প্রকৃতিগত কারণে এবং মানুষের চেষ্টার ফলে। ভূ-কম্পনের ফলে অথবা নদীবাহিত পলিমাটি জমে অথবা নদীর গতি পরিবর্তনে যে সমস্ত দ্বীপের সৃষ্টি হয় তা আমরা প্রথমোক্ত পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। জলমগ্নভূমি সংস্কারের নজীর অতি পুরাতন। আবু ইউসুফের পুস্তকে এর উল্লেখ আছে।[২৩]

(১৭৮) প্রকৃতিগত কারণে যদি কোন রাষ্ট্রভূখণ্ডের পরিবৃদ্ধি হয় এবং তাতে অন্য কোন রাষ্ট্রভূখণ্ডের ক্ষতিসাধিত না হয় তাহলে সমগ্র নদীটির অর্ধেকাংশ রাষ্ট্রভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এর জন্য কোনরূপ দখল নিষ্প্রয়োজন। কোন কাল্পনিক সীমারেখার মধ্যে যদি কোন দ্বীপের উত্থান হয় তাহলে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অংশানুপাতে বিভক্ত হবে অথবা কোন চুক্তির মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি হবে।

(১৭৯) কিন্তু অপর কোন রাষ্ট্রের ক্ষতির ফলশ্রুতি হিসেবে যদি প্রাকৃতিক পরিবৃদ্ধি হয়, উদাহরণ স্বরূপ, নদীর গতি পরিবর্তন দ্বারা— মুসলিম জাতীয় আইন অনুযায়ী[২৪] সেই রাষ্ট্রই তার মালিক হবে যার অধিকারে এই পরিবৃদ্ধি ঘটেছে, তবে লাভবান রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকে

তার লাভের অনুপাতে ক্ষতিপূরণ অবশ্যই প্রদান করবে। 'লাভের সাথে ক্ষতি জড়িত' (আলগানাম, মায়া আল গায়ামি) এবং 'ক্ষতিপূরণ করতে হবে'[২৫] (আদ্দায়ারু ইয়াজালু) এই মূলনীতির উপর তা প্রতিষ্ঠিত। একই আইন মুসলিম আইনবেত্তাগণ আন্তর্জাতিক বিবাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবেন।

(১৮০) তবুও নদীর গতি পরিবর্তন যদি এত বেশী হয় যে সীমান্ত নদীর পরিবর্তে এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নদীতে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে নদীগর্ভস্থ সাবেক সীমানা সীমান্ত বলে চিহ্নিত হবে। কারণ,

"তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ইহাতে উহাদিগের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।[২৬] আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অমান্য করিলে সেতো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হইবে।[২৭]

(১৮১) নদীর গতি পরিবর্তন সংক্রান্ত বহু ঘটনা মুসলিম ইতিহাসে রয়েছে[২৮], দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমুদরিয়া। কিন্তু এর ফলে কখনো আন্তরাষ্ট্রীয় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই। এ সম্পর্কিত প্রাচীন রেওয়াজের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। ইদানিং ন্যূনপক্ষে দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেছে :

(ক) প্যারিসের দি কণ্টিনেণ্টাল ডেইলী মেইল (১লা আগষ্ট, ১৯৪৮ পৃঃ ২) পত্রিকায় 'Persia Peeps' নামক এক নিবন্ধে এই মর্মে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় : রাশিয়া এবং পারস্যের গুরজান প্রদেশের সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃত আত্রক নদীর উপকূল অপর একটি অনিশ্চিত এলাকা। এই নদী কাস্পিয়ান সাগরের দিকে প্রবাহিত কিন্তু পরবর্তীকালে উহার গতির অগ্রভাগ দক্ষিণ দিকে পরিবর্তিত হয়। রুশরা দাবী করে যে আত্রক নদীর নূতন তলদেশই সীমান্ত হবে যাতে করে তারা অতিরিক্ত ভূখণ্ড লাভ করতে পারে। পারসীকদের মতে নদীর পুরাতন গর্ভই সীমানা।

এই মতভেদের ফলে মাঝে মাঝে গুলি বিনিময় হয়ে থাকে এবং গত মার্চে একজন পারসিক সীমান্ত রক্ষী সেখানে নিহত হয়। এর ফলাফল কি হয়েছিল তা আমি জানি না।

(খ) বৃটিশ ভারত বিভক্তির পর ভারত ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অনুরূপ মতভেদ দেখা দিয়েছিল। পুরানো মুদ্রিত সরকারী মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু ঐ সকল মানচিত্র প্রকাশের পর ইতিমধ্যে অনেক নদীর গতি পরিবর্তিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে নিষ্পত্তির জন্য ১৯৫০ সালে একজন নিরপেক্ষ সালিশ নিয়োগ করা হয়। উক্ত সালিশ এই মর্মে রায় দেন যে, যে সমস্ত নদীর গতি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে নদীর পুরাতন গর্ভ সীমানা হিসেবে চিহ্নিত হবে ; এবং যে সমস্ত নদীর গতির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সীমানা নদীর গতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সালিশ মুসলমান ছিলেন না এবং নিজেকে মুসলিম আইনের অধীন বলেও মনে করেননি, তা সত্ত্বেও তার রায় একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্নটি ছাড়া প্রাচীন মুসলিম আইনবেত্তাদের মূলনীতির প্রায় অনুরূপ। উক্ত এলাকার সীমানা সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভূখণ্ড ইত্যাদি বিনিময়ের ব্যবস্থা করে ১৯৫৮ সালে অপর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(১৮২) কৃত্রিম সংস্কারের বেলায় প্রায় অনুরূপ নীতিই প্রযোজ্য। অন্যের ক্ষতিসাধন না করে যে কোনভাবে যদি তা লাভ করা যায় তাহলে তাতে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। অন্যথায়, খোলাখুলি চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব মীমাংসা আবশ্যক।

(১৮৩) (৩) যুদ্ধ এবং বিজয় অথবা দখলকৃত রাষ্ট্র কর্তৃক কোন বাধাপ্রাপ্ত না হলে কেবলমাত্র দখলের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত ভূখণ্ড বলপ্রয়োগে লাভ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র বিজয় দ্বারা অধিকার প্রতিষ্ঠা বুঝায় না। অধিকার প্রতিষ্ঠার মনোভাবেরও প্রয়োজন আছে। কেননা অন্য কোন মিত্র এবং বন্ধু রাষ্ট্রের পক্ষে অথবা কোন অন্যায় আচরণের সংশোধনের জন্য প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে সাময়িকভাবে বিজয় এবং দখলকরণ সম্ভব। দ্বিতীয়ত,

অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অবিরত ও নিরবচ্ছিন্ন শাসন ও পূর্ণ দখলসহ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ।

(১৮৪) (৪) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ভূখণ্ড লাভ, দান, বিনিময়, বিক্রয় অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে হতে পারে। দান, বিশেষ করে যৌতুকের বহু দৃষ্টান্ত অন্তত মুসলিম ভারতের ইতিহাসে আছে।[২৯] প্রধানত, সীমান্ত ব্যবস্থা জোরদারের উদ্দেশ্যে বহু ভূখণ্ড[৩০] বিনিময় হয়েছে। উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময়ের একটি বেচাকেনার ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি এক লক্ষ যুদ্ধবন্দীর বিনিময়ে বাইজেন্টাইনদের নিকট হতে মালাতিয়া খরিদ করেন।[৩১] আল-হাসান ও মুয়াবিয়ার মধ্যে একটি সত্ত্বত্যাগ চুক্তির মাধ্যমে উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই চুক্তি মোতাবেক আল-হাসান মুয়াবিয়াকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই শর্তে অর্পণ করেন যে তিনি মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর নূতন ও পুরাতন সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষিত হবেন।[৩২]

রাষ্ট্রক্ষমতার অধীন বিভিন্ন প্রকার ভূখন্ড

(১৮৫) একটি রাষ্ট্রের অধীন ভূখণ্ডের সমস্ত অংশে সব সময় একইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(ক) অধিরাজ্য ও যৌথ অধিরাজ্যের নিয়মিত অংশ

(১৮৬) আদি দখলকৃত অথবা নবসংযোজিত, জনবহুল অথবা পরিত্যক্ত, সভ্য অথবা যাযাবর এবং এমনকি অসভ্য নির্বিশেষে একটি রাষ্ট্রভূখণ্ডের অনুরূপ প্রত্যেকটি অংশ সে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। একটি রাষ্ট্র একই সময়ে অনুরূপ সমস্ত অথবা একাধিক প্রকারের ভূখণ্ড সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।

(১৮৭) আবুল ফিদা একটি যৌথ শাসিত রাজ্যের উল্লেখ করেছেন যার স্থায়িত্বকাল বহু দিন ছিল।[৩৩] এর কিছু পূর্বে ৫১৩ হিজরীতে মাহমুদ ইবনে আলপ আরসালান এবং তাঁর চাচা মনজর যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন (ইশতারিকা ফিস সুলতানাতি)।[৩৪] সঠিকভাবে বলতে গেলে এগুলিই যৌথ শাসনের দৃষ্টান্ত। দুই রাষ্ট্রের যৌথ সম্পত্তি

হিসেবে যৌথ রাজ্যের ধারণা আধুনিক। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সুদানকে এঙ্গলো-ইজিপশিয়ান অধিরাজ্য হিসেবে পরিচয় দেওয়া হত।

(খ) স্বাধীন করদ রাষ্ট্র

(১৮৮) এর দ্বারা সে সমস্ত অমুসলিম রাষ্ট্রকে বুঝায় যাকে মুসলিম রাষ্ট্র কর দিতে বাধ্য করেছে। এর ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের তরফ থেকে নিরাপত্তা পেলেও তৃতীয় কোন শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রের উপর বর্তায় না। কর প্রদান ছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রটি সব ব্যাপারেই স্বাধীন। কর প্রদান হীনতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে থিউডোমীর আরব বিজয়ীদিগকে বার্ষিক কর দিতে সম্মত হয়েছিল এবং সাথে সাথে তার স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।[৩৫] অতএব, আব্বাসী সুলতান আল-মনসুর এবং আল-মু'তাসিম পর্যন্ত তার সমস্ত উত্তরাধিকারের শাসন আমলে কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটগণ মোটামুটি নিয়মিতভাবে বাগদাদে কর প্রেরণ করত। খলিফা আল-মেহদী সম্রাজ্ঞী আইরীনের কাছ হতে কর গ্রহণ করেন এবং হারুনুর রশীদ শুধু করই নয় বরং সম্রাট নিসিযোরাস ও তার পরিবারবর্গের কাছ হতে 'জিজিয়াও' গ্রহণ করেন।[৩৬] উপরন্ত, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পত্রালাপের শিষ্টাচার অনুযায়ী সম্বোধনের বেলায় খলিফার নাম বাইজেন্টাইন সম্রাটের নামের পূর্বে উল্লেখ করতে হত যদিও ইউরোপীয় অন্যান্য সম্রাটের সাথে বাইজেন্টাইন সম্রাটের পত্রালাপের ক্ষেত্রে এর বিপরীত রীতি পালিত হত।[৩৭] তবুও এসব ক্ষেত্রে করদ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হত না।

(১৮৯) একই সঙ্গে দুই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করে কর প্রদানের ঘটনাও উল্লেখ আছে। খলিফা মুয়াবিয়া সাইপ্রাসকে পরাভূত করে এই শর্তে সন্ধি করেন যে সাইপ্রাস বাৎসরিক কর প্রদান করবে যদি এও সত্য যে সাইপ্রাস বাইজেন্টাইন সম্রাটকেও কর প্রদান করত। চুক্তির শর্তানুযায়ী এও স্থির করা হয় যে সাইপ্রাসবাসীরা মুসলমানদের সুহৃদ এবং হিতৈষী হিসেবে ব্যবহার করবে এবং বাইজেন্টাইনদের গতিবিধি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত রাখবে।[৩৮] ১৯৬০ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে

সাইপ্রাসের অভ্যুদয়ে তুরস্ক এবং গ্রীসের (কিছু মাত্রায় ইংলণ্ডের) সাইপ্রাসের উপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

(গ) নামেমাত্র অধীন

(১৯০) এর দ্বারা আমরা আব্বাসী খলিফাদের কর্তৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে যে সমস্ত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তা বুঝাতে চাই। গোটা মুসলিম বিশ্বে একই সময়ে একজন ব্যক্তিই 'আমীরুল মু'মেনীন' হতে পারেন। আবদুর রহমান আল-নাসির কর্তৃক নিজেকে 'আমীরুল মু'মেনীন' ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এমনকি স্পেনীয় রাষ্ট্রগুলোকেও আমরা পর্যায়ভুক্ত করতে পারি।[৩৯] বিশেষ করে প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে একথা সত্য। এগুলো মূলত খলিফার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হয়ে যায়, এমনকি রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা করে। পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও সাপ্তাহিক জুমা'র খোতবায় এবং বাৎসরিক দুই ঈদের জামাতে এরা প্রকাশ্যে বাগদাদের খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করত।[৪০] সাধারণত এ সমস্ত রাষ্ট্রের মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ হত।[৪১] বহুকাল ধরে খলিফার সনদ ব্যতিরেকে নূতন কোন সুলতানের সিংহাসন আরোহণের ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হত।[৪২] সম্মান পদবী লাভের ব্যাপারেও রেষারেষি ও ব্যগ্রতা ছিল।[৪৩] উত্তরকালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত খিলাফতের প্রদেশগুলির ক্ষেত্রেই শুধু নয় বরং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং বিজিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বেলায়ও একথা সত্য। পরন্তু, খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য বলে তারা নিজেরাও বিশ্বাস করতেন, যেমন ভারতের রাষ্ট্রসমূহ। এই তালিকায় আমরা সে সমস্ত রাষ্ট্রের নামও উল্লেখ করতে পারি যে দেশের রাজারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন: দৃষ্টান্তস্বরূপ ৩১০ হিজরীতে বুলগারের রাজার (রাশিয়ার অন্তর্গত আধুনিক কাজানের সন্নিকট) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।[৪৪] এই অধীনতা, আদৌ যদি একে অধীনতা বলা যায়, ছিল নেহায়েত আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত—রাজনৈতিক ও বাস্তব অর্থে নয়। তাহলে অস্বীকার করা যায় না যে, খলিফা এই সব স্বাধীন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কখনো

কখনো নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৭৫৭ হিজরীতে সুদূর ভারতে ফিরোজ শাহকে মাহমুদ শাহ বাহমনীর রাজ্য আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে খলিফার প্রভাবই যথেষ্ট ছিল। মাহমুদ শাহ বাহমনী যেভাবেই হোক খলিফার মধ্যস্থতা লাভ করেছিলেন।[৪৫]

(১৯১) কৌতুহলদ্দীপক এমনকি অনেক আপাতবিরোধী ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে রয়েছে। এসব স্বাধীন প্রাদেশিক শাসক, এমনকি শিয়াদের কেউ কেউ খিলাফতের কেন্দ্র বাগদাদ দখল করে নিজেদের রাজ্যের অংশ হিসেবে শাসন করলেও খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত।[৪৬] সালাউদ্দীন আয়ুবীকে যথার্থ এবং গুণগত কারণেই 'আমিরুল মু'মেনীনের সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারকারী' (মুহীয়্যু দৌলতি আমীরীল মুমেনীন) এই গৌরবজনক খেতাব প্রদান করা হয়েছিল।[৪৭]

(ঘ) আশ্রিত রাষ্ট্র

(১৯২) এর দ্বারা বুঝতে চাই সেই সমস্ত আংশিক সার্বভৌম রাষ্ট্র যা নীতি নির্ধারণের বহু ক্ষেত্রে অভিভাবক রাষ্ট্রের হুকুম মেনে চলে এবং প্রতিদানে অভিভাবক রাষ্ট্রের কাছ হতে আশ্রয়ের অধিকার পায়। অভিভাবক রাষ্ট্র কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করলেও আশ্রিত রাজ্যকে সরাসরি শাসন করে না; স্থানীয় শাসকই দেশ শাসন করে। নবী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বহু বিদেশী রাজার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। চিঠির মর্ম এইরূপ : "আপনি যদি আত্মসমর্পণ করেন (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন) আপনার ক্ষমতার উপর আমি হস্তক্ষেপ করব না।"[৪৮] যাদের কাছে এ ধরনের পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তন্মধ্যে বাহরাইন এবং উমানের শাসকদ্বয় এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং নবী তাঁদের দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিদের উপরও কিছুটা দায়িত্ব অর্পিত হয়, বিশেষ করে সে এলাকার মুসলমানদের দেখাশুনার ব্যাপারে তাদেরকে একচ্ছত্র অধিকার দেয়া হয়। বাদ বাকী বিষয়ে স্থানীয় শাসকগণ তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। পরবর্তী ইসলামের ইতিহাসে ভারত এবং অন্যত্র আশ্রিত রাজ্যের অসংখ্য নজীর রয়েছে। অভিভাবক রাষ্ট্র তারতম্য অনুসারে এদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

(ঙ) প্রভাব-গন্ডী

(১৯৩) এর দ্বারা আমরা বুঝি এমন একটি দেশ যার উপর ভবিষ্যতে কর্তৃত্ব আরোপের উদ্দেশ্য অন্য রাষ্ট্রের রয়েছে কিন্তু এর আশু সংযুক্তিকরণ সময়োপযোগী বলে গণ্য নয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সবল রাষ্ট্র অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সাথে লিখিত বা অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে দুর্বল রাষ্ট্রকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কচ্যুত করে এবং অবশেষে সুযোগ সুবিধামত উহা দখল করে।

(১৯৪) এ ধরনের দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসেও রয়েছে: "৯৩৯ হিজরীতে তারা (অর্থাৎ নিজাম শাহ ও আদিল শাহ) সীমান্তে পরস্পর মিলিত হন এবং বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির করেন যে, নিজাম শাহ বেরার এবং আদিল শাহ তেলেঙ্গানা রাজ্য দখল করবেন; এইভাবে তারা দক্ষিণ ভারত নিজেদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে নেন।"[৪১]

(১৯৫) এই চুক্তির প্রধান শর্ত মোতাবেক একজন বরাদ্দকৃত ভূখণ্ড দখল করলে অন্যজন তাতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তার প্রভাব-গন্ড বলে স্বীকার করে নেবে।

নিরপেক্ষীকরণ এবং লাওয়ারিশ ভূমি (Neutralisation and No-Man's Land)

(১৯৬) প্রাচীন মুসলিম আইনবেত্তাদেরও অজানা ছিল না যে, এমন অনেক ভূমি আছে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা, যার উপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কারোরই কর্তৃত্ব নেই।

অতএব রাজীউদ্দীন সুরখসী লেখেন যে, বিদ্রোহী রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে অবস্থানকারী একজন মুসলিম প্রজা তার আশ্রয়ে একজন শত্রুকে মুসলিম রাষ্ট্রে আনতে পারে। উক্ত ব্যক্তি বৈধ বিদেশী অধিবাসী হিসেবে গণ্য হবে কারণ শত্রু রাজ্যে অবস্থানকারী মুসলিমের আশ্রয় প্রদান বাতিল হলেও তবুও,

"তারা উভয়ে যখন উভয় রাজ্যসীমার মধ্যবর্তী এলাকায় যেখানে কোন পক্ষেরই কর্তৃত্ব নেই পৌঁছে তখন তারা উভয়েই শত্রু রাজ্যের

আওতামুক্ত হয়, এবং মুসলিম কর্তৃক তাকে প্রদত্ত আশ্রয় বৈধ হয় এবং সে (উক্ত মহিলা) যতক্ষণ না এমন এক স্থানে পৌঁছে যেখানে মুসলমানগণ নিজদিগকে নিরাপদ ভাবে (অর্থাৎ মুসলিম রাজ্য) যতক্ষণ সে মুসলিম রাজ্যের প্রজা নয়।"[৫০]

সামসুল আয়েম্মা সুরখ্‌সীর[৫১] অভিমতও তাই এবং একে সমগ্র মুসলিম আইন বক্তার অভিমত হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

টীকা

১। যে কোন আইন সংক্ষিপ্তসারের 'ওয়াকফ' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। তুলনীয় তায়ালিসি নং ৮৮৭ ; ইবনে হাম্বাল ৫, ৪২, ৪৮ এবং বিশেষ করে ১৬৫।

৩। তিরমিজী 'ফিল আমাম' পরিচ্ছেদ ; তুলনীয় ৪১ অনুচ্ছেদ।

৪। সুরখ্‌সী, আল মাবসুত, ১০, ৯৩।

৫। তিরমিজী ; তুলনীয় ৪১ অনুচ্ছেদ।

৬। সুরখ্‌সী, আল মাবসুত, ১০, ৯৩।

৭। পরিত্যক্ত এবং লাওয়ারীশ সম্পত্তিও সরকারের মালিকাধীন (আমওয়াল, আবু ওবায়েদ, ৬৭৪, ৬৯০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৮। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বেলায়ও মুসলিম আইনবেত্তাগণ একই নীতি অবলম্বন করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য।

৯। তুলনীয় কাসানী বাদা ই', ৬, ১৮৯-৯০।

১০। ইবান আবিদীন, রাহুল মুখতার সরজু আল দুররীল মুখতার, ৩, ২৬৬—৭।

১১। ঐ, ২, ৪২৩—৪।

১২। আবু ইউসুফ কিতাবুল খরাজ, পৃঃ ৫৭ ; আল কাসান, বাদাই উসমানায়ী ৫৬, ১৯৫।

১৩। আবু ইউসুফ, পূর্বে উল্লেখিত, ৫৭।

১৪। আল-কুরআন, সূরা জাছিয়া, ১২-১৩।

১৫। ঐ, সূরা নাহ্‌ল, ১৪।

১৬। আবু ইউসুফ, ঐ, ৫৫-৫৬।

১৭। একটি ঘটনার জন্য তুলনীয় ইবনে সাদ ১/২, পৃঃ ৫৮ এবং ইবনে আব্‌দাল বারর্‌, ইনতিয়াব নং ৩৬৩১ ; অন্যটির জন্য আবু ওবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল, ৬৮৩, ৬৯৩ অনুচ্ছেদ।

১৮। তাবারী, ইতিহাস, ১, ২৫৭৭ ; সুয়ূতী, হুস্‌নু আল মুহাদারা 'খালিজ আমীরুল মু'মেনীন' পরিচ্ছেদ।

১৯। তুলনীয়, মাসুদী, মরুজুজ—যাহাব (ইউরোপীয় সংস্করণ), ২, ৩৩৭ ; আবদুল ফিদা তাক্‌ভীম, ১০৬ পৃঃ।

২০। আবু ইউসুফ, পূর্বে উল্লেখিত, ৭৮ পৃঃ।

২১। মুসলিম শরীফ ৫২ ঃ ১১৯—২২।

২২। তুলনীয়, আমার প্রবন্ধ, "L' Afrique decourse L' Amerique avant Christophe Colomb ; Presence Africicaine এ প্রকাশিত (প্যারিস, নং ১৭-১৮, ফেব্রুয়ারী, মে, ১৯৫৮) ; এবং সোলায়মান নাদভী, আরব আওর আম্‌রিকা (মাসিক উর্দু মা'রিফ, আজমগড়, ভারত, মার্চ—এপ্রিল, ১৯৩৯ ; ইসলামিক কালচার, জুলাই, ১৯৩৯, পৃঃ ৩৮২—৩)।

২৩। খরাজ, পৃঃ ৫২-৫৩ (পরিচ্ছেদ, তাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস উপদ্বীপ ; ইয়াহিয়া ইবনে আদম আল-কুরাইশী, খরাজ ১৫ পৃঃ)।

২৪। সরহু মজাল্লাতীল আহ্‌কামীল আদ্‌লীয়া, প্রথম খণ্ড।

২৫। মজাল্লাতীল আহ্‌কামীল আদ্‌লীয়া, ১ম পরিচ্ছেদ।

২৬। আল-কুরআন, সূরা কাসাস, ৮৬।

২৭। ঐ, সূরা আহ্‌যাব, ৩৬।

২৮। এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম, আমুদরিয়া ; বার্থল্ড, তুর্কীস্তান।

২৯। ১৫৬৪ খৃঃ নিজাম শাহ আদীল শাহকে শোলাপুর দুর্গ হস্তান্তর করেন।

৩০। আবুল ফিদা, ইতিহাস, (ইউরোপীয় সংস্করণ) ৩, ২৬৪, ৪৬৪, ৬০৮ ; ৪, ৩৬, ৫৬। টিপু সুলতান তুর্কীদিগকে বাঙ্গালোরের সাথে বসরা বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। (তুলনীয়, প্রথম দাক্ষিণাত্য ইতিহাস সম্মেলনে পঠিত আমার প্রবন্ধ) ;

৩১। আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে জাফর, আ'য়্নুল-মা'য়ারিফ ওয়া ফনুন্‌ল আখবারিল খালায়েফ (পাণ্ডুলিপি, তোফকাপি সরাই, ইস্তাম্বুল, নং ২৭৯১)।

৩২। ইবনে আবি খাইছামার বরাত দিয়ে ইবনে কাছির (বিদায়াই, ৮, ৪১) চুক্তির এই ধারাটি উল্লেখ করেছেন। তাবারী এ সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

৩৩। আবুল ফিদা, ইতিহাস, হিঃ ৫৮৮।

৩৪। ইবনে সিনাহ্‌, ৮, ১৯৪ (Emile Tyan কর্তৃক Sultanat et califat. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪-এ উল্লেখিত)।

৩৫। গিবন, Decline and Fall, পঞ্চম খণ্ড, ৫৬৬ ; এস, পি, স্কট Moorish in Europe, উর্দু অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, ২৬৩।

৩৬। গিবন, ঐ ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৯-৪০ ; ফরিদ রিফা'য়ী, আমরুল মা'মুন ১ম খণ্ড, ১২৯ ; শিব্‌লী, আল-মা'মুন পরিচ্ছেদ, সমকালীন রাষ্ট্র।

৩৭। Brehier, Institutions de L' Empire byzantin, প্যারিস, ১৯৪৯, ২৮৪ পৃঃ।

৩৮। আবু ওবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল, ৪৬৭ অনুচ্ছেদ ; বালাজুরী, ফুতুহুল বুলদান, সাইপ্রাস ; তুলনীয় ইবন্‌ল আছীর, তৃতীয় খণ্ড, ৭৪-৫, ১০৭ ; সুরখ্‌সী, সারহ্‌ আস-সিয়ার আল-কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৩০৩।

৩৯। শুরুতে তারা 'খুলাফা' নামে আখ্যায়িত হয় ; তুলনীয়, মাসুদী, মারুজ (মিশরীয় সংস্করণ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০।

৪০। ইবনে হায়কাল, আল মাসালিক ওয়া আলমাসালিক পৃঃ ২২৭-৮ ; ইবনে জুবায়ের, রিহ্‌লা, পৃঃ ৫০-১। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যেও অন্‌রূপ রেওয়াজ ছিল বলে মনে হয় ঃ

"বাইজেণ্টাইন সম্রাটই কেবল 'বেসিলিয়াস' উপাধি গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি একাই সারা বিশ্বে, অন্তত খৃষ্ট জগতের আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। সমস্ত গীর্জার প্রার্থনায় তাঁর নাম নিতে হত।" Brehier পৃঃ ২৮২-৩।

৪১। Numismatiechronide, ১৮৮৫, পৃঃ ২৫-২৭, গুলামান, তুগলক, খলজী, লোদী, জোনপুর, মালওয়া এবং বাংলার রাজবংশের মুদ্রা ; তুলনীয় Catalogue of coins Indian Museum, কলিকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৭ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ২০ ; Catalogue of Indian coins in British Museum ; মুসলিম দেশ, ১৮৮৫ ইত্যাদি।

৪২। মোহাম্মদ হাবীব, Sultan Muhmud of Ghaznah, পৃঃ ৩-৪।

৪৩। সুলতান মাহমুদ গজনীও পদবীর জন্য লালায়িত ছিলেন, তুলনীয়, সিয়াসতনামা, নিজামুল মুল্ক, পৃঃ ১৩২ ইত্যাদি।

৪৪। ইবনে ফাদলান (রিসালত) রিহলা, দামেস্ক সংস্করণ, ১৯৬০ ; ইয়াকুত মুয়াজমুল বালদান বুলগার। ইবনে ফাদলাল্লাহ ও ৭৬৪ হিজরীতে মুসলিম রাজাদের তালিকায় বুলগারের রাজার নাম উল্লেখ করেন।

৪৫। আবদ আল জাব্বার 'মাহবুবুল ওয়াতন' ২৩৯ পৃঃ। (দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস)

৪৬। আমি এখানে শিয়া বুহিদ এবং সুন্নী সেলজুকদের উল্লেখ করেছি।

৪৭। ইবনে জুবায়ের, 'রিহলা', ৫০-১ পৃঃ।

৪৮। ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে একই বাক্য বাহ্‌রাইনের মুনজির ইবনে সাওয়া, ইয়ামামার হায়দাহ্‌ ইবনে আলী এবং ওমানের জাফর এবং আবুদের নিকট লিখিত পত্রে ব্যবহৃত হয়। 'আত্মসমর্পণ করুন, তাহলে আপনি নিরাপদ' এই বাক্যটি সম্রাট নিগাদ, হিরাক্লিয়াস এবং কসরিনের নিকট লিখিত পত্রে ব্যবহৃত হয়। 'ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর' এর অর্থেও 'আসা শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে।

৪৯। তারিখ-এ-ফিরিশ্‌তা (পুনায় মুদ্রিত ১২৭৪ হিঃ) দ্বিতীয় খণ্ড, ২১২ পৃঃ।

৫০। আলমুহীত, প্রথম খণ্ড, ফলিও ৬০৩ খ (পাণ্ডুলিপি, ওয়ালিউদ্দীন, নং ১০৫৬, ইস্তাম্বুল)।

৫১। সুরখ্‌সী, সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, ৩৪২ (নব-সংস্করণ)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখতিয়ার

(১৯৭) স্বাভাবিক অবস্থায় বহু বস্তু ও ব্যক্তি রাষ্ট্রের এখতিয়ারে আসে :

১। বস্তু :

(ক) রাষ্ট্র ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সরকার ও উহার প্রজাদের সম্পত্তি,

(খ) ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জলজ সম্পদ,

(গ) উন্মুক্ত সমুদ্রে বা আকাশে অবস্থানরত রাষ্ট্র বা তার প্রজাদের মালিকানাধীন নৌযান ইত্যাদি,

(ঘ) বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহ,

২। ব্যক্তি :

(ক) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বসবাসকারী মুসলিম প্রজা,

(খ) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বসবাসকারী অমুসলিম প্রজা,

(গ) বিদেশে সাময়িকভাবে বসবাসকারী প্রজা,

(ঘ) এক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা অন্য রাষ্ট্রে,

(ঙ) অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজা,

(চ) মুসলিম রাজ্যে বিদেশী বাসিন্দা,

এদের প্রত্যেকের বেলায় এখতিয়ার এক রকমের নয়।

বস্তু

(১৯৮) বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। মুসলিম রাষ্ট্রের বিচারপতিগণ মুসলিম আইন অনুসারে বস্তু সংক্রান্ত মামলার বিচার করবেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা অস্বাভাবিক ও লা-ওয়ারিশ ভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। নিম্নে ব্যক্তি শিরোনামায় মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। চুক্তি, বন্ধক প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

(ক) স্বদেশে মুসলিম প্রজা

(১৯৯) বিদেশীদের দেশীয়করণের ব্যাপার ছাড়া প্রথম পর্যায়ের ব্যক্তিগণ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। "বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভাই ভাই"[১] এই কুরআনের নীতি অনুযায়ী অমুসলিম রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিক অপর কোন মুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে আগমনের সাথে সাথেই মুসলিম রাষ্ট্রে পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করে; অন্যান্য মুসলিম নাগরিকের ন্যায় সেও সমান দায়িত্ব ও অধিকার লাভ করে। এ প্রসংগে আমরা পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত নবীর এই নির্দেশটি উল্লেখ করতে পারি। "তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বল। তারা যদি সম্মত হয় তাহলে তাদের আর বিরক্ত করো না। তাদেরকে বল মুসলিম এলাকায় চলে আসতে। তারা যদি কথামত কাজ করে তাহলে তারা মুসলমানদের ন্যায় সমান অধিকার ও দায়িত্ব লাভ করবে। তারা যদি দেশ ত্যাগ করতে অসম্মত হয় তাহলে তাদেরকে বলে দাও তারা যাযাবর বা অবাসিন্দা মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। অন্যান্য বিশ্বাসীর ন্যায় তাদেরকে অবশ্য ঐশী আদেশ পালন করতে হবে; জিহাদে শরীক হওয়া ব্যতীত তারা মুসলিম সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগীদার হবে না।"[২]

(২০০) এ প্রশ্নটির সংগে কিছুটা সম্পর্কযুক্ত একটি বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদেশে সফররত যে কোন মুসলমান দৈনন্দিন পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারে কিছুটা রেয়াত পায়। কিন্তু সে যদি কোন স্থানে পনর দিন অবস্থানের মনস্থ করে সেক্ষেত্রে সে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে গণ্য হয় এবং তাকে প্রদত্ত রেয়াত প্রত্যাহার করা হয়। কসর আল-সালাত নামে অভিহিত এই বিধিটি কুরআনের একটি আয়াতের[৩] উপর প্রতিষ্ঠিত। এ আয়াত সম্পর্কে নবীর অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি এ কথার উপর জোর দিতে চাই যে, মূলত যে কোন বিদেশী মুসলিমের স্থায়ী এবং নিয়মিত নাগরিকত্ব লাভের জন্য অন্ততঃ এক পক্ষকাল অবস্থানের অভিপ্রায় মাত্র প্রয়োজন ছিল। অধুনা ভৌগোলিক জাতীয়তা কিছু ভেদাভেদের সৃষ্টি করেছে এবং এমনকি

গোঁড়াপন্থী সউদী আরবও তার রাষ্ট্রে বিদেশী মুসলমানের নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করেছে। প্রচলিত আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন হয়েছে।

(খ) মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা

(২০১) মুসলিম আইন মুসলিম ও অমুসলিম প্রজাদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বজায় রেখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষোক্ত প্রজারা বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। তারা জাকাত[৪] প্রদান থেকে অব্যাহতি পায় যা প্রতিটি মুসলিম, নারী পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে দু'শত দিরহাম বা আনুমানিক আড়াই পাউণ্ডের[৫] উর্ধ্বে তার বাৎসরিক আয়ের জন্য শতকরা আড়াই ভাগ হারে দান করে। তারা বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব[৬] পালন থেকেও মুক্ত অথচ সমস্ত মুসলমান সামরিক কাজে যোগদান করতে বাধ্য। তারা এক ধরনের স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করে তাদের যাবতীয় বিষয় তাদের নিজস্ব আইন মাফিক স্বধর্মী দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।[৭] মুসলিম প্রজাদের মতই তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্বও মুসলিম রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত।[৮] এসবের বিনিময়[৯] তাদেরকে নিম্নোক্ত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া মাথাপিছু তার থেকে আটচল্লিশ দিরহাম বাৎসরিক কর প্রদান করতে হয়।

"শুধু পুরুষদের কাছ থেকেই 'জিজিয়া' আদায় করা হয়। নারী ও শিশুরা এর থেকে মুক্ত। ধনীদের কাছ হতে ৪৮ দিরহাম এবং সাধারণ আয়ের লোকদের ২৪ এবং যারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে যথা, কৃষক তাদের কাছ থেকে মাত্র ১২ দিরহাম বছরে একবার আদায় করা হয়। নগদ অর্থের বিনিময়ে তারা উহার মূল্য প্রদান করতে পারে……অধিকন্তু, নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কাছ হতে 'জিজিয়া' আদায় করা হয় না; যথা, অভাবগ্রস্ত যারা দান গ্রহণ করে, অন্ধ যাদের কোন জীবিকা নেই এবং কাজ করে না, চিররুগ্ন এবং দান গ্রহণ করে, পংগু, মঠের সন্ন্যাসী, নিঃস্ব এবং কর্মে অক্ষম অতি বৃদ্ধ, উন্মাদ—তবে অন্ধ, চিররুগ্ন এবং পংগুদের মধ্যে কেউ ধনী হলে তারা ব্যতিক্রম।………হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ আপনাকে

সাহায্য করুন! নবী যাদেরকে জিম্মী হিসাবে গণ্য করেছেন তাদের প্রতি (অর্থাৎ অমুসলিম প্রজা) সদয় হওয়া এবং তাদের হাল-অবস্থা সম্পর্কে খবর নেওয়া আপনার কর্তব্য যাতে তারা অত্যাচারিত ও উত্যক্ত না হয়, তাদের উপর সাধ্যাতীত কর চাপানো বা ঋণের দায় ছাড়া তাদের কোন সম্পত্তি জবর দখল করা হয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী বলেন, যে কেউ অমুসলিমদের উপর অত্যাচার করে বা তাদের উপর সাধ্যাতীত কর চাপায় বিচারের সময় আমি তার বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করব।" এবং ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর মৃত্যু শয্যায় অন্তিম বাণীতে নিম্ন উক্তি করেনঃ নবী কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদত্ত (অমুসলিম প্রজা) ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে আমি আমার উত্তরসূরীকে উপদেশ দিচ্ছি। চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দিতে হবে, যুদ্ধ করে হলেও তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কর ধার্য করা চলবে না। ওমর একদা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এক বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখেন। ওমর পিছন থেকে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেনঃ তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? সে উত্তর দিলঃ ইহুদী। তিনি বললেনঃ কেন তুমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছো? সে উত্তর দিলঃ আমাকে 'জিজিয়া' দিতে হয়, আমি গরীব এবং বৃদ্ধ। এ কথা শুনে ওমর তাকে হাত ধরে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং নিজস্ব তহবিল হতে কিছু দান করেন। অতঃপর তিনি বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষের নিকট নির্দেশ পাঠানঃ তার এবং তাদের মত লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহর শপথ! আমাদের পক্ষে কখনই ন্যায় হবে না যদি আমরা কারো যৌবনকে নিঃশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করি। 'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের জন্য (কুরআন ৯, ৬০) 'নিঃস্ব' (ফুকারা) মানে মুসলমান এবং এ কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি (মাসাকীন)। এবং ওমর এর এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের জন্য 'জিজিয়া' মাফ করে দেন।[১০]

(২০২) পুনরায়, দাসদিগকেও 'জিজিয়া' থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।[১১] যদি কোন অমুসলিম স্বেচ্ছায় সামরিক কাজে যোগদান

করে তাহলে সে ব্যক্তি কার্যরত সময়ের জন্য 'জিযিয়া' হতে মুক্তি পায়।[১২] প্রশংসনীয় জনকল্যাণকর কাজের জন্য চিরজীবনের জন্য 'জিজিয়া' মাফ করে দেওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কায়রো থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করার সময় স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য খলিফা ওমর একজন অমুসলিম প্রজাকে চিরজীবনের জন্য 'জিজিয়া' মাফ করে দিয়েছিলেন।[১৩]

(২০৩) নবীর এক নির্দেশক্রমে অমুসলিমদের আরব মূল ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি নেই।[১৪] অন্যথায়, তাদের চলাচল এবং স্থায়ী বাসস্থানে কোন বাঁধা নেই। যদি কোন অমুসলিম বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বা এক বৎসরের অধিক কালের জন্য বসবাস করতে চায় তাহলে তাকে জিজিয়া দিতে হয়।

(২০৪) মক্কার বিষয়টি একটু জটিল। কুরআনের এক আয়াতে (সূরা তওবা, ২৮) উল্লেখ আছে যে, অংশীবাদীরা অপবিত্র; সুতরাং তারা যেন মস্‌জিদুল হারামের নিকট না আসে। সুরখ্‌সীর মতে,[১৫] অমুসলিমদের কাবার গন্ডির মধ্যে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ার উদ্দেশ্য হল তারা যাতে মুসলমানদের কিব্‌লা হিসেবে সংরক্ষিত কাবার আঙ্গিনায় মূর্তি পূজা না করতে পারে। এছাড়া এর পিছনে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কে না জানে এমনকি কাবার মসজিদে জুমার খুতবা প্রদান কালে খলিফা ওমর খৃষ্টানদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন?[১৬] পরবর্তীকালের লেখকগণ যদিও সকল অমুসলিমের মক্কায় বসবাস নিষিদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন (খুব সম্ভবত মুসলিম শাসকের মক্কা উপস্থিতিতে অমুসলিম রাষ্ট্রদূতের প্রবেশে বাধা আরোপ করা হয়নি) আমার কাছে সুরখ্‌সীর অভিমতই ঠিক বলে মনে হয়। শুধু এই কারণে যে, প্রাচীন রেওয়াজে তার মক্কাবাসী মুসলমানের অমুসলিম দাস, বিশেষ করে উম্মে আওলাদ (যে দাসী প্রভুর ঔরসজাত সন্তানের মাতা) আবার স্থায়ী সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এ অচিন্ত্যনীয় যে, প্রভু এবং দাস একই স্থানে বসবাস করত না। আজরাকী[১৭] মক্কার বিবরণ দিতে গিয়ে খৃষ্টানদের একটি গোরস্থানের কথাও উল্লেখ করেন এবং এর সাথে

অবশ্যই স্পষ্টতঃ মক্কার মুসলমানদের দাসদের সম্পর্ক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইবনে সা'দ কর্তৃক উল্লেখিত হিজরীর প্রথম শতকের শেষের দিকে মক্কার জনৈক খৃষ্টান চিকিৎসক আবু দায়ূদ আবদুর রহমানের ঘটনাটি সর্বজনবিদিত।[১৮] সে জুবায়ের ইবনে মুত্ইমের 'মাওলা' (আশ্রিত ব্যক্তি) ছিল। কাবা মসজিদের মীনারের নীচে সাফা পাহাড়ের উপরে একটি দোকানে সে ডাক্তারী করত। তৃতীয়তঃ, ইবনুল কায়য়ূম (আহকাম আহ্‌ল আল জিম্মাহ, পাণ্ডুলিপি, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, পৃঃ ১৪৯) নবী এবং তার সাহাবীদের সময়ে, বিশেষ করে মক্কা এবং মদীনায়, খৃষ্টানদের মৃত্যুর পর তাদের মুসলিম সন্তানগণ কর্তৃক তাদেরকে কবর দেওয়ার বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, কাবাগৃহ সংক্রান্ত জটিল কারিগরী কাজের জন্য আব্বাসী খলিফাগণ কর্তৃক দক্ষ অমুসলিম প্রকৌশলী মক্কায় পাঠানো হত।

(২০৫) কোন নির্দিষ্ট এলাকা থেকে অমুসলিমদের রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কার করা আর ধর্মীয় কারণে বহিষ্কার করা এক কথা নয়। কার্যতঃ সাহাবীদের সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনের তাগিদে মক্কায় একজন খৃষ্টান চিকিৎসকের অবস্থানকে বিনা দ্বিধায় সহ্য করেন।

(২০৬) শামী নবীর জীবনীতে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেন। বদরের পরাজয়ের পর মক্কার অমুসলিমগণ আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মক্কার মুসলিম মোহাজেরদেরকে তাদের হস্তে অর্পণ করার অনুরোধ করে নিগাস-এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা বানচাল করার উদ্দেশ্যে নবী আমর ইবনে উবাই আল-জামারীকে (তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি) তাঁর দূত হিসেবে নিগাস-এর দরবারে প্রেরণ করেন।

(২০৭) ইহা সর্বজনবিদিত যে, সাফী মতাবলম্বী আল-মাওয়ার্দি এবং হাম্বালী মতাবলম্বী আবু ইউলা আজ-কাররার মতে চূড়ান্ত ক্ষমতা কোন মুসলিমের হাতে ন্যস্ত থাকা সাপেক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক

পদে যে কোন অমুসলিম নিযুক্ত হতে পারে। এমনকি তাঁরা তাদের মন্ত্রীপদে নিয়োগও অনুমোদন করেন (অবশ্য যে ধরনের সরকারে রাষ্ট্র প্রধান প্রধান কার্যনির্বাহক এবং নামেমাত্র প্রধান নয়)।

(২০৮) হানাফী আইনের বিখ্যাত সংকলন 'আল বাহরুররাইখ'-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের কবরের ন্যায় অমুসলিমদের কবরের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ; জীবদ্দশায় তাদের জান-মাল ও মর্যাদার ন্যায় মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষও সম্মানিত।

(২০৯) আবু হানিফা এবং শাফী একমত যে, যদি কোন অমুসলিম কুরআন, রসূলের হাদীস বা মুসলিম আইন সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চায় তাহলে তাকে তা থেকে বিরত করা যাবে না।

(২১০) ইবনে সা'দ উল্লেখ করেন যে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর খেলাফতকালে শত্রু কর্তৃক বন্দী অমুসলিম প্রজাদিগকে মুসলিম প্রজাদের মত সরকারী খরচে মুক্ত করার নির্দেশ দেন।

(২১১) সরকারী খরচায় অমুসলিম প্রজাদের সামাজিক নিরাপত্তার[২০] ব্যবস্থা বহু পূর্বে হযরত আবুবকর-এর সময়ে চালু হয়, একটি সরকারী দলিলে (তুলনীয় আবু ইউসুফ, খরাজ। ৮৪-৮৫ পৃঃ) সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ আল হিরা শহর বিজয়ের সংবাদ খলিফাকে জানাতে গিয়ে বলেনঃ আমি পুরুষ জনসংখ্যা গণনা করেছি। তাদের সংখ্যা সাত হাজার। আরও অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, তন্মধ্যে এক হাজার চিররুগ্ন অসমর্থ। সুতরাং, আমি তাদেরকে জিজিয়া হতে অব্যাহতি দিয়েছি এবং এরূপে জিজিয়ার উপযোগীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় হাজারে………। শারীরিক দুর্বলতাহেতু জীবিকা অর্জনে অসমর্থ যে কোন বৃদ্ধ বা যে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বা যে ধনী ব্যক্তি বর্তমানে এত নিঃস্ব যে, জীবিকার জন্য অন্যের দানের উপর নির্ভরশীল আমি তাকে জিজিয়া হতে অব্যাহতি দিয়েছি এবং যতদিন পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করবে ততদিন পর্যন্ত তার ও তার পরিবারবর্গের ব্যয়ভার মুসলিম রাষ্ট্র বহন করবে বলেও সম্মতি দিয়েছি, যদি তাদের দাসদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে নীলামে

বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয়ের জন্য কোনরূপ কর আদায় করা হবে না. এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা মূল মালিককে দেওয়া হবে। সামরিক পোষাক. এবং যে পোষাক পরিধানে মুসলিম বলে মনে হতে পারে সেটা বাদ দিয়ে যে কোন পোষাক পরিধানের অধিকার তাদের রয়েছে………। ওমর তাঁর বিখ্যাত ভাতা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সময় অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করেন।[২১]

শাসন ক্ষমতা বহির্ভূত শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সক্রিয় থাকে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, পোষাক-পরিচ্ছদে তারা তাদের শাসকদের অনুকরণ করে। এর ফলে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি বিনষ্ট হয়। অমুসলিম প্রজাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে অমুসলিমদিগকে পোষাক পরিচ্ছদে এবং অনুরূপ অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপে মুসলমানদের অনুকরণ করতে নিষেধ করার মধ্যে অমুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রের উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২১৩) আল-মাকারিজী (ইমতা, প্রথম খণ্ড, ৩২৩) একটি মজার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন যে, খাইবার বিজয়ের পর নবী যুদ্ধলব্ধ বাইবেলের সমস্ত কপি পরাজিত ইহুদীদের কাছে ফিরিয়ে দেবার আদেশ দেন।

(২১৪) আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে 'জিজিয়া' আইন মূলত আল-কুরআনে নাজেল হয়।[২২] এই শব্দটি (আহ্‌লে কিতাব) ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর প্রযোজ্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়। আল-কুরআন এ প্রসংগে অন্যান্য অনৈসলামী ধর্ম সম্পর্কে নীরব। যাহোক, নবী[২৩] এবং গোঁড়া খলিফাদের[২৪] আচরণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমস্ত অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে গণ্য হতে পারে। অতএব, ওসমান বারবারদের এবং আবদুল মালিক লিংগায়েত ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করেন। আবু হানিফার মতে সমস্ত অমুসলিম একই সম্প্রদায়ভুক্ত; শায়েবানীও[২৫] অনুরূপ ভাষায় মন্তব্য করেন (আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদাতুন কুল্লুহু)। এখানে উল্লেখ্য যে, এই মন্তব্যগুলো জিজিয়া আলোচনা প্রসংগে করা হয়নি বরং অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে করা হয়। সুরখসী এক সুদীর্ঘ এবং সারগর্ভ আলোচনার উপসংহারে বলেন ঃ

এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল-কুরআনে আহ্‌লে কিতাবে এর উল্লেখ আইনকে সীমিত করার জন্য নয় বরং আহ্‌লে কিতাব-এর কাছ থেকে 'জিযিয়া' গ্রহণ করা যেতে পারে, এটা বুঝানো।[২৬]

আবু ইউসুফের বক্তব্য আরও বিশদ ঃ

একমাত্র ইসলাম ধর্মত্যাগী এবং আরবের মূর্তি পূজারিগণ ছাড়া ম্যাজিসিয়ান, মূর্তি, আগুন বা পাথর পূজারী, সেরিয়ান, সামারিটান নির্বিশেষে সকল অমুসলিমের কাছ থেকে 'জিযিয়া' গ্রহণ করা হয়।[২৭]

(২১৫) আবেদনক্রমে দেশীয়করণ ঃ

যদি কোন বিদেশী ইসলামী রাষ্ট্রে আসে এবং নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করে, কর্তৃপক্ষ তার আবেদন মঞ্জুর করতে পারে। বদরুদ্দীন ইবনে জুম'আর সময়ে যখন অমুসলিমদের দেশীয়করণ মঞ্জুর করা হয়, তাদের নাম, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, বয়স এবং ধর্ম একটি বিশেষ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হত। তাদের বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মৃত্যু, ভ্রমণ, বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন, বয়ঃপ্রাপ্ত কাল প্রভৃতির খবরাখবর রাখার জন্য এবং বাৎসরিক 'জিযিয়া' আদায়ের সময় তাদের দেখাশুনা করার জন্যও তাদের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হত।[২৮]

(২১৬) কোন রকম পরীক্ষাকালের পরামর্শ আইনবেত্তারা দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তবুও জাতীয়করণের আবেদন মঞ্জুর অথবা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা যেমন স্পষ্টতঃ সরকারের হাতে ন্যস্ত, তেমনি সাময়িক ছাড়পত্র মঞ্জুর করার ক্ষমতাও সরকারেরই।

বিবাহের মাধ্যমে দেশীয়করণ ঃ

(২১৭) ইসলাম অনুযায়ী স্ত্রী আপনা হতেই স্বামীর দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।[২৯] এইভাবে একজন বিদেশী অমুসলিম নারী, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নারী একজন মুসলিমকে বিবাহ করলে সে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যায়। যদি কোন বিদেশী দম্পতি ইসলামী রাষ্ট্রে আসে এবং স্বামী মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে সে ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য; তার স্ত্রীও মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে।[৩০] যদি কোন বিদেশী অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক এমন কোন নারী বিবাহ করে সেক্ষেত্রে উক্ত বিদেশী

আপনা থেকেই মুসলিম নাগরিক হবে না।[৩১] বরং তার স্ত্রী মুসলিম নাগরিকত্ব হারাবে যদি তাকে মুসলিম রাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে হয়।

(গ) বিদেশী রাজ্যে মুসলিম ঃ

(২১৮) মুসলিম আইন অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত এবং স্থান কাল নির্বিশেষে জীবনের সব কাজই এর আওতাভুক্ত। আমরা এই পরিচ্ছেদের ১৯৯ অনুচ্ছেদে দেখেছি যে, নবী প্রবাসী মুসলিম সে যেখানেই থাক তাকে মুসলিম আইন মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর থেকেই আবু ইউসুফের[৩২] সূত্রের উদ্ভাবন যে, একজন মুসলিম যেখানেই থাক ইসলামের আইন অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে সে বাধ্য. এ না বললেও চলে যে. বিদেশে একজন মুসলমান কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে তার উপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।[৩৩] আমরা এখনই এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব। তবুও একথা বলার প্রয়োজন আছে যে, মুসলিম আইনবেত্তাগণ তাঁদের নিজস্ব আইনের উপর জোর দিলেও তাঁরা একদিকে একজন মুসলিমের উপর মুসলিম বিচারালয় এবং বিদেশী বিচারালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে এবং অন্যদিকে নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করেন। বিদেশে কৃত কোন অপরাধের জন্য তাঁরা তাকে মুসলিম বিচারালয়ে দায়ী করেন না। একই ভিত্তির উপর তাঁরা একজন বিদেশী অমুসলিমকে বিদেশে কৃত তার অপরাধের জন্য এমনকি তা যদি মুসলিম প্রজার বিরুদ্ধেও হয়ে থাকে, যেমন খুন বা চুরি, শাস্তি না দিয়ে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন।[৩৪] এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে সুরখসী বলেন ঃ

"যদি কোন মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করে এবং টাকা ধার দেয় বা তাদের কাছ থেকে টাকা কর্জ করে বা তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা তার নিজ সম্পত্তি খোয়ায় সে বিচার মুসলিম রাষ্ট্রে হবে না ; কেননা ঘটনাস্থল মুসলিম এখতিয়ার বহির্ভূত। অনুরূপ কাজ করবে না বলে অংগীকার করার পরও যে মুসলিম তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে তার বিচার মুসলিম আদালতে হওয়ার কারণ, সে তার নিজের অংগীকার ভংগ করেছে, মুসলিম শাসকের নয়। তথাপি মুসলিম আইনবেত্তাগণ তাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে উপদেশ দেবে

যদিও মুসলিম বিচারালয় তাকে তা করতে বাধা করবে না। যে সমস্ত বিদেশী তাদের স্বদেশে মুসলিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে তাদের সম্পর্কে অভিযোগ মুসলিম আদালতে শ্রবণ না হওয়ার কারণ যে, উক্ত ব্যক্তিরা যে স্থানে তাদের অংগীকার ভংগ করেছে তা মুসলিম এখতিয়ার বহির্ভূত। অতএব, তারা যদি তাকে হত্যাও করে মুসলিম আদালতে তারা দায়ী হবে না। তারা যদি তার সম্পত্তি বিনষ্ট করে বা তা আত্মসাৎ করে সেক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য। এর কারণ হল যে, মুসলিম এখতিয়ারভুক্ত এলাকা ত্যাগ করে বিদেশে যাওয়ার ফলে উক্ত মুসলিম নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করেছে। টাকা পয়সা কর্জের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য ......। যদি কোন মুসলিম অনুমতি-ক্রমে অমুসলিম রাষ্ট্রে যায় এবং সেখানে কারো সম্পত্তি বা জীবন বিনষ্ট করে এবং প্রতিপক্ষ যদি বিচারের জন্য মুসলিম রাজ্যে আসে মুসলিম আদালতে সে দায়ী হবে না; কারণ, তারা যদি একই ধরনের অপরাধ তার বিরুদ্ধে করত সেক্ষেত্রে তারা মুসলিম এখতিয়ারভুক্ত নয় এই নীতির ভিত্তিতে মুসলিম আদালতে দায়ী হত না। সুতরাং তাদের প্রতি অপরাধের জন্য সেও দায়ী হবে না। তবুও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমের পক্ষে তাদের সংগে অংগীকার ভংগ করা অনুচিত; কেননা অংগীকার ভংগ করা নিষিদ্ধ। নবী বলেছেন, যে কেউ অংগীকার ভংগ করে সে যে বিশ্বাসঘাতক তা নির্দেশ করার জন্য কিয়ামতের দিন তার মাথার উপরে একটি পতাকা উত্তোলিত হবে। সেহেতু যদি কোন মুসলিম তাদের সংগে অংগীকার ভংগ করে সম্পত্তি লাভ করে এবং তা যদি মুসলিম রাজ্যে আনয়ন করে অন্য মুসলিমের পক্ষে জ্ঞাতসারে তা খরিদ করা সমীচীন নয়। কেননা এ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অর্জিত হয়েছে এবং এর ক্রয়ের ফলে অন্যায়কারী অনুরূপ কাজ করতে পুনরায় প্রলুব্ধ হবে; মুসলিমের পক্ষে তা অনুচিত। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আল মুগীরা ইবনে শুবাহ তার সহচরদিগকে হত্যা এবং লুটপাট করে তাদের মালপত্র নিয়ে মদীনায় আসে; ইসলাম গ্রহণের পর মুগীরা নবীকে উক্ত লুটের মাল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে এবং উহার এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য গ্রহণ করতে

বলে। নবী এর জবাবে বলেনঃ তোমার ইসলাম গ্রহণে আমরা আপত্তি করিনি কিন্তু তোমার সম্পদের বেলায় আপত্তি আছে, কেননা ইহা প্রতারণাপূর্বক অর্জিত এবং আমাদের এর প্রয়োজন নেই। ক্রয়ের ব্যাপারে এই নিষেধ সুনিশ্চিত নয় ; কিন্তু ক্রয় কেবল অনুচিত।"[৩৫]

(২১৯) মুসলিমগণ যেখানেই থাকে তারা তাদের নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য, এর উপর মুসলিম আইনবেত্তাগণ জোর দেওয়া সত্ত্বেও এ অস্বীকার করা যায় না যে, বিদেশী রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানরা তথায় মৌন অনুমতির উপর বাস করে এবং তারা দ্বিগুণ বাধার অধীন। প্রথমতঃ মুসলিম আইন স্বয়ং তাদের আইনগত ক্ষমতা হ্রাস করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, উক্ত মুসলিম বিদেশে থাকাকালে কোন অমুসলিমকে আশ্রয় দিতে পারে না, যা সে মুসলিম রাষ্ট্রে থাকলে করতে পারত।[৩৬] দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে তথাকার আইনও মেনে চলতে হয়। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

(২২০) নবীর আমলে মুসলমানগণ কয়েক বছরের জন্য আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা যখন আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেয় তখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। তবে তাদের নির্বাসন থেকে ফেরার সময় মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, আবিসিনিয়ায় মুসলমানগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। নবী মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারটি অনুমোদন করেছেন এই বলে যে, তথাকার শাসক ন্যায়পরায়ণ। মোহাজেরদের কথায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা নিয়মমাফিক ধর্ম-কর্ম পালন করত, প্রাত্যহিক নামাজ পড়ত এবং কেউ তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার বা গালমন্দ করেনি। তাদেরকে প্রত্যর্পণ করার জন্য মক্কা প্রতিনিধিদের দাবী নিগাস প্রত্যাখ্যান করেন এবং উভয় পক্ষ শ্রবণের পর তার রাজ্যে মুসলিমদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।[৩৭]

(২২১) অন্যদিকে নবীর একই আমলে মা'নএর বাইজেণ্টাইন শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে রুষ্ট হয়ে বাইজেণ্টাইন সম্রাট তাঁকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলেন এবং তিনি তা করতে অস্বীকার করলে তাঁর শিরচ্ছেদ হয়।[৩৮] ঐতিহাসিকগণ একজন উচ্চ পর্যায়ের খৃষ্টান ধর্মজাযকের উল্লেখ

করেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা করায় বাইজেন্টাইন জনতা কর্তৃক নিহত হন।[৩৯]

পরবর্তীকালে মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ভাল বা মন্দ ব্যবহারের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যার কিছু আমরা এখনই উল্লেখ করব। এ সমস্ত ঘটনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভাল বা মন্দ ব্যবহার এবং সামঞ্জস্যমূলক কোন সুনির্দিষ্ট আইনভিত্তিক ছিল না বরং শাসকদের মর্জির উপর নির্ভর করত।

(২২৩) বিদেশে অবস্থানকারী মুসলিমদের প্রশ্নটি শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের বিষয়টির উদ্ভাবন করেছে যার কিছুটা বর্ণনার প্রয়োজন আছে।[৪০] সঠিক তথ্যের অভাবে আমরা আপাতত এর থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে কিছু ঘটনার উল্লেখ করব।

(২২৪) ১। ৩১ হিজরীতে নুবীয়ার রাজার সংগে মুসলমানদের এক চুক্তি হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী এই স্থির হয় যে, যদি মুসলমানরা তার রাজ্যে যায় বা তার রাজধানী জংগালা-এর মসজিদে নামাজ পড়ে তাতে সে আপত্তি করবে না। অপরাধী প্রত্যর্পণের ব্যবস্থাও এই চুক্তিতে করা হয়।[৪১]

(২২৫) ২। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় অনেক মুসলমান ইরাক থেকে পালিয়ে মালাবারে আশ্রয় নিতে গেলে স্থানীয় সর্দাররা তাদের উপর স্থানীয় পোষাক পড়বার এবং স্থানীয় প্রথা মেনে চলার শর্ত আরোপ করেন। এ সম্পর্কে যা জানা যায় তা নিম্নে প্রদত্ত হল:[৪২]

"(নির্যাতীত মুসলমানরা) নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছে। তাদেরকে ভিন্ন জাতির লোক বলে হিন্দুরা অবতরণে বাধা প্রদান করে। পরিশেষে, বহু অনুনয় বিনয় ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠান পালন ও পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানের অংগীকারে তারা উক্ত এলাকায় বসবাসের অনুমতি লাভ করে। গরীব মুসলমানরা অনন্যোপায় হয়ে 'যেমন দেশ তেমন বেশ' প্রবাদ অনুযায়ী হিন্দুদের পোষাক গ্রহণ করে, মূর্তিপূজারীদের সংগে মিলে মিশে জীবন যাপন করতে থাকে; সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী জীবিকা অবলম্বন করে···;

আজান ও কুরআন তেলাওয়াত তারা এমনিভাবে করত যাতে কোন হিন্দু শুনতে না পায়।"

(২২৬) ৩। খলিফা উমরের আমলেই মুসলমানরা বোম্বাই ও সিন্ধুর সমুদ্রকুলবর্তী এলাকায় প্রবেশ করেছিল।[৪৩] হিন্দুরা যখন সিনদান পুনরুদ্ধার করে মসজিদটি তারা মুসলিম অধিবাসীদিগের অধিকারে ছেড়ে দেয়। তথায় মুসলমানরা জুম'আর নামাজ আদায়, এমনকি খলিফার জন্য প্রার্থনাও করতে পারত।[৪৪]

(২২৭) ৪। হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দশকে মাসূদী ভারত সফর করেন। তিনি লিখেন, "৩০৪ হিজরীতে আমি সাইমোরে (অধুনা চয়োল) গমন করি। সাইমোর লার (গুজরাট) এর অংশ এবং বালহারাদের (ভালাভাই) দ্বারা শাসিত। চাঞ্চা নামে এক রাজকুমার তখন দেশ শাসন করত। সিরাফ, ওমান, বসরা, বাগদাদ এবং অন্যান্য এলাকার অধিবাসী যারা বিবাহপূর্বক স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল তারা এবং 'বায়াসিরাহ' সহ প্রায় দশ হাজার মুসলমান সেখানে বসবাস করত। তাদের মধ্যে মুসা ইবনে ইসহাক সানদালুনীর ন্যায় ধনী বণিকও ছিল! সানদালুনী সে সময়ে 'হুনারমাহ' পদে অধিষ্ঠিত ছিল। 'হুনারমাহ' বলতে মুসলিমদের সর্দারের পদকে বোঝায়। কেননা এই দেশে রাজা বিশিষ্টতম মুসলিমকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তাদের বিষয়াদি দেখা-শুনার জন্য তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন। 'বাইসার'[৪৫] শব্দের বহুবচন 'বায়াসিরাহ' দ্বারা বোঝাতো মুসলিম মাতাপিতার সেই সমস্ত সন্তানকে যাদের জন্ম ভারতে হয়েছিল।"[৪৬]

একই গ্রন্থকার বলেন, "সমগ্র সিন্ধু এবং ভারতে এমন কোন রাজা ছিল না যে, মুসলমানদিগকে বালহারার চেয়ে অধিক সম্মান করত। তার রাজ্যে ইসলাম প্রবল এবং নিরাপদ। সেখানে ছোট মসজিদও আছে, বড় মসজিদও আছে এবং সবগুলিই মুসলিমে ভরপুর। এই দেশের রাজারা চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর এমনকি এর চেয়েও বেশী সময় রাজত্ব করেন। সে দেশের জনগণের ধারণা যে, মুসলমানদের প্রতি ন্যায় বিচার ও বদান্যতার দরুনই রাজাগণ দীর্ঘজীবী হন।"[৪৭]

(২২৯) ৫। নাবিক বুজ্র্গ ইবনে শাহ্রিয়ার (হিজরীর চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি) নামক অপর একজন প্রাচীন লেখক উল্লেখ করেন যে, ভারতে সাধারণত চুরির শাস্তি প্রাণদণ্ড। চোর মুসলমান হলে 'হুনারমান' কর্তৃক মুসলিম আইন অনুযায়ী তার বিচার হয়। 'হুনারমান' মুসলিম দেশের কাজীর ন্যায়। মুসলমানদের মধ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হন।[৪৮]

(২৩০) একই লেখক বলেন যে, "একদা একজন নবাগত আরব নাবিক সাইমুর-এ এক মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে। মন্দিরের এক পুরোহিত তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে সাইমুর-এর রাজার নিকট উপস্থিত ক'রে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। নাবিকও অপরাধ স্বীকার করে। তার চারিপার্শ্বে সমবেত লোকদেরকে রাজা জিজ্ঞেস করেনঃ একে নিয়ে আমাদের কি করা উচিত? কেউ বললঃ হাতীর পায়ের তলে ফেলে পিষ্ট করা হোক। অন্যরা বললঃ এর অংগচ্ছেদ করা হোক। রাজা বললেনঃ না, তা হয় না; কেননা সে একজন আরব এবং তাদের সংগে আমাদের চুক্তি রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে একজন মুসলমানদের 'হুনারমান' আল-আব্বাস ইবনে মাহান-এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করঃ মসজিদে অনুরূপ অবস্থায় একজনকে পেলে আপনি কি করতেন? এবং দেখ তিনি কি বলেন।"[৪৯]

(২৩১) ৬। ইবনে হাইকালও ভারত এবং অন্যান্য দেশে একই প্রথার সমর্থন করেন। তিনি বলেনঃ বালহারাদের কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত হয়ে একজন মুসলিমই আজকাল তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলিম উপনিবেশকে) শাসন করে। খাজার, সারির, লান, ঘানা এবং কোখা-এর ন্যায় বহু অমুসলিম অধিকারভুক্ত দেশে আমি এ প্রথার প্রচলন দেখেছি। এ সমস্ত দেশে মুসলিম সম্প্রদায়, এমনকি সংখ্যায় নিতান্ত স্বল্প হলেও, এদের প্রধান, এদের বিচারক এবং তাদের মামলার সাক্ষী হিসেবে কোন অমুসলিমকে গ্রহণ করে না। এর কোন কোন দেশে মুসলিমদেরকে বিশ্বস্ত অমুসলিম সাক্ষী উপস্থিত করতে আমি দেখেছি। অপর পক্ষ সম্মত হলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়, নতুবা তাদের স্থলে মুসলিম সাক্ষী উপস্থিত করা হয়।[৫০]

(২৩২) ৭। প্রাক-ইসলাম যুগের আরবদের সংগেও মালাবারের সংযোগ ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী মুসলিম উপনিবেশগুলির স্থায়িত্বকাল নবীর সাহাবীদের আমল থেকে।[৫১] এই দীর্ঘকালের মধ্যে মালাবারের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। হাই-কালের পরবর্তী পর্তুগীজ আক্রমণের সময়কার জনৈক লেখক জয়নুদ্দীন আলমাবারী বলেনঃ সমগ্র মালাবারে মুসলমানদেরকে শাসন করার মত তাদের নিজস্ব কোন শাসক নেই। বরং অমুসলিমরাই তাদেরকে শাসন করে, তাদের যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করে এবং অপরাধ করলে তাদেরকে শাস্তি দেয়। তা সত্ত্বেও এ দেশের অধীবাসীদের মধ্যে মুসলমানগণ পরম শ্রদ্ধা ও ক্ষমতা ভোগ করে। কারণ, প্রধানত তাদের জন্যই এদের শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয়। মুসলমানগণ জুমা ও ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারে। স্থানীয় প্রধানগণ কাজী ও মুয়াজ্জীনদের বেতন প্রদান করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে শরীয়তের আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে সহায়তা করেন এবং জুমা'র নামাজ বন্ধ থাকুক তা তাঁরা চান না। যদি কেউ তা বন্ধ করতে চায়, তাঁরা তাকে শাস্তি দেন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরিমানা করেন।[৫২] মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি তাদের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের অপরাধ করে সেক্ষেত্রে তারা মুসলমান প্রধানদের অনুমতিক্রমে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। অতঃপর মুসলমানগণ মৃতদেহ নিয়ে আসে এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী উহার সৎকার করে………। প্রচলিত দশমাংশ অথবা তাদের আইন অনুয়ায়ী জরিমানাযোগ্য অপরাধ ছাড়া তারা মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত কর বা জরিমানা ধার্য করে না। কৃষি-জীবী এবং বাগান মালিকদের উপর মোটেই কর ধার্য করা হয় না, এমনকি তারা বড় রকমের সম্পত্তির মালিক হলেও। বিনা অনুমতিতে তারা মুসলমানের গৃহে প্রবেশ করে না, এমনকি খুনী গ্রেপ্তার করতেও। তারা তার গৃহ অবরোধ করে রাখে এবং সর্বক্ষণ প্রহরা এবং অনাহার প্রভৃতি দ্বারা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। তারা কাউকেও ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করে না এবং নব্য মুসলিমদিগকে অপরাপর মুসলিমের ন্যায় সম্মান করে, এমনকি নব্য

মুসলিম তাদের নিম্ন শ্রেণীর লোক হলেও। প্রাচীন কালে মুসলিম ব্যবসায়িগণ অনুরূপ ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত চাঁদা দিতেন।[৫৩]

(২৩৩) পর্তুগীজ লেখক বারবারোসাও এ কথা উল্লেখ করেন যে, তাঁর আমলে কালিকুটে বিদেশী মুসলিমদের একজন স্বধর্মী গভর্নর ছিল এবং তাদের ব্যাপারে রাজাও হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি তথায় একজন 'শাহ মিসরীর'ও (মিসরীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি) উল্লেখ করেন। (তুলনীয় W. H. Moreland-এর নিবন্ধ The shah bandur in the Eastern seas J R A S, লণ্ডন, ১৯২০—৫১৭-৩৩ পৃঃ)

(২৩৪) ৮। চীন সম্পর্কে মাস্‌উদী উল্লেখ করেন যে, একদা জনৈক চীনা অফিসার খানফুতে একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর উপর জুলুম করে। উক্ত ব্যবসায়ী দেশের শাসকের ন্যায়বিচারে অস্থাবান হয়ে অবিলম্বে রাজধানীতে গমন করেন এবং ফরিয়াদীর লাল পোষাক পরিধান করে রাজ দরবারে উপস্থিত হন। যথাসময়ে তাকে রাজার সামনে হাজির করা হয়। রাজা তাঁর গোয়েন্দা বিভাগীয় বিভিন্ন কর্মচারীর কাছ হতে এ ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করে অভিযুক্ত কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করেন এবং মুসলিম ব্যবসায়ীকে রাজ উপঢৌকন প্রদান করে বলেন, "আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মাল ন্যায্যমূল্যে আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারেন, অন্যথায় আপনার মাল সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার রইল। সুতরাং, স্বেচ্ছায় জিনিষ পত্র বিক্রি করে এখানে থাকতে পারেন অথবা যেখানে খুশী নির্বিবাদে যেতে পারেন।"[৫৪]

(২৩৫) ৯। এ সম্পর্কে অপর লেখকের (হিজরী তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকের) বক্তব্য আরও বিশদঃ ব্যবসায়ী সুলেমান বর্ণনা দেন যে, ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রস্থল খানফুতে আগত মুসলিমদের মধ্যকার বিবাদ মিটানোর দায়িত্ব শাসক জনৈক মুসলিমের উপর অর্পণ করেন। চীনের রাজার অভিপ্রায়ও তাই ছিল। পর্বের দিনে উক্ত প্রধান মুসলমানদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, তাদেরকে উপদেশ দেন এবং খলিফার জন্য দোয়া করেন। ইরাকের ব্যবসায়িগণ তাঁর সিদ্ধান্তের

বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। বস্তুত তিনি কুরআন এবং মুসলিম আইনের অনুশাসন অনুযায়ী ন্যায়বিচার করেন।[৫৫]

(২৩৬) ১০। কাস্পিয়ান সাগর এলাকার অধিবাসী সম্পর্কে মাসূদী উল্লেখ করেনঃ খাজার রাজ্যের মুসলমানগণ অভিজাত শ্রেণী-ভুক্ত; কেননা তাদের দ্বারাই রাজার সৈন্যদল গঠিত। তারা তথায় 'লারসীয়া' নামে পরিচিত। তারা খাওয়ারীজমের অধিবাসী। বহুদিন পূর্বে তাদের ইসলাম গ্রহণের পর, তাদের দেশ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা দেশ ত্যাগ করে খাজারে বসতি স্থাপন করে। তারা সেরা সৈনিক এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে খাজারের বাদশাহ আস্থাশীল। তারা কতগুলো চুক্তিবদ্ধ শর্তে খাজার রাজ্যে বসতি স্থাপন করে; যথা ১। প্রকাশ্যে ধর্ম পালন, মসজিদে গমন ও আজান দিতে পারবে, ২। তাদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে, ৩। কোন মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে নিয়োগ করা হবে না, এ ছাড়া যে কোন জাতির বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে। রাজার দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তারা করে ………। তাদের মুসলিম কাজী রয়েছে। খাজারের রাজধানীতে রেওয়াজ অনুযায়ী সাতজন বিচারপতি রয়েছে, দু'জন মুসলমান, দু'জন খাজারী, দু'জন খৃষ্টান এবং বাকী একজন স্লাভ, রুশ ও অন্যান্য সাধারণ লোকের জন্য ………। কোন জটিল প্রশ্ন দেখা দিলে তারা সবাই মুসলমান হাকিমদের নিকট উত্থাপন করে এবং এ সম্পর্কে মুসলিম আইনের বিধানকে তারা মেনে নেয় ………। তাদের অনেক মসজিদ রয়েছে যেখানে ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।[৫৬] পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ শতকে লিথোয়ানিয়া ও পোলাণ্ডে মুসলমানগণ অনুরূপ সুবিধা ভোগ করত।

(২৩৭) সাধারণত মুসলিম আইন ও নীতি শাস্ত্র দৃষ্টান্তমূলকভাবে আইন মেনে চলার জন্য বিদেশে -সাময়িকভাবে বসবাসকারী মুসলিমদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেয়; যেমন, তাদের ছাড়পত্রের শর্ত-গুলো পুরোপুরি মেনে চলতে এবং যেকোন প্রতারণামূলক কাজ হতে বিরত থাকতে। তা এতদূর অবধি যে, বিদেশে অবস্থানরত অবস্থায় যদি

তার নিজ দেশের সাথে উক্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে সেক্ষেত্রে মুসলিম নাগরিক যতক্ষণ শত্রুরাষ্ট্রে থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ এবং শঠতামূলক কাজ হতে অবশ্যই বিরত থাকবে।[৫৭] ছাড়পত্রের শর্তগুলো তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলবে ; অঙ্গীকার ভংগ না করে এবং কোনরূপ শঠতার আশ্রয় না নিয়ে, যদি সম্ভবপর এবং কার্যকরী হয়, তারা তাদের সহনাগরিকদের প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবে।[৫৮] যাহোক, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মুসলিম আইন সোচ্চার এবং এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টার জন্য প্রবাসী মুসলিমদের তাগিদ করে। এই আইনে বিধান রয়েছে যে, প্রবাসী মুসলিম যে রাষ্ট্রে অবস্থান করছে সে রাষ্ট্র কর্তৃক যদি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্ত্রী-পুত্র, মুসলিম অথবা অমুসলিম, এমনকি বিদ্রোহী হোক না কেন, বন্দী হয় সেক্ষেত্রে প্রবাসী মুসলিম ইচ্ছা করলে স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অভয়পত্র প্রত্যাখ্যান ক'রে তার দেশবাসীর স্ত্রীপুত্রদের উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করতে পারে।[৫৯] নারী ও শিশুদের ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার কারণ হল যে, তৎকালে দাস প্রথার বেশ প্রচলন ছিল এবং প্রাপ্তবয়স্ক সৈনিকদের চেয়ে এদের ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল বেশী। তবুও দু'টি কথা মনে রাখা উচিত ঃ প্রথমতঃ ভ্রমণ অনুমোদনকারী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অভয়পত্র প্রত্যাখ্যান করার পূর্ব নোটিশ ছাড়া পরিকল্পিত কাজে লিপ্ত হওয়া অনুমোদিত নয়। দ্বিতীয়তঃ নারী ও শিশুদিগকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল মুসলিম নারী ও শিশুদের বেলায় সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম এবং মর্যাদা নির্বিশেষে মুসলিম রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের বেলায় তা প্রযোজ্য।

(২৩৮) আত্মরক্ষা অথবা আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রের শত্রুপক্ষ কর্তৃক প্রবাসী মুসলিমদের নিরপেক্ষতার প্রতি সম্মান না দেখাবার আশঙ্কা ছাড়া প্রবাসী মুসলিমদের জন্য স্থানীয় সরকারের সাথে উহার শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্যদলে যোগদানের অনুমতি নেই।[৬০] আত্মরক্ষার বেলায় স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধলিপ্ত রাষ্ট্রে অমুসলিম বা বিদ্রোহী মুসলিম হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই।[৬১]

(ঘ) এক মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক অপর মুসলিম রাষ্ট্রে

(২৩৯) পূর্বোক্ত (ক) ধারায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সমস্ত মুসলমান এক ও অভিন্ন জাতিভুক্ত। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, বাস্তবতার চাপে মুসলিম আনইবেত্তাগণ একই সংগে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।[৬২] প্রাচীনকালে এক মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিক অপর মুসলিম রাষ্ট্রে গেলে তাদের প্রতি বিশেষ ব্যবহার করা হত বলে জানা নেই। সুতরাং আমি নিম্নে ইবনে জুবায়েরের একটি মনোজ্ঞ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ সম্পর্কে ইহাই একমাত্র লেখা যা এযাবত আমার গোচরীভূত হয়েছে।

(২৪০) পুরান ও নূতন কায়রোর মাঝখানে আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তুলুনের নামে পরিচিত একটি মসজিদ রয়েছে। কারুকার্যময় এই বিশাল সৌধটি একটি পুরাতন মসজিদ। সুলতান সালাহ্উদ্দীন ইহা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার গরীবদের জন্য অবাসগৃহ হিসেবে বরাদ্দ করেন। তারা সেখানে বসবাস ও লেখাপড়া করত। তিনি তাদের জন্য মাসিক বৃত্তিও বরাদ্দ করেন। অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় যে, তাদেরই একজন আমাকে বলেছে সুলতান তাদের বিষয়াদি মীমাংসার ভার তাদেরই উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং এতে অন্য কারুর হাত নেই। অতএব, তারা তাদেরই একজনকে সালিশ হিসেবে নির্বাচন করে এবং তিনি তাদের মধ্যকার সকল বিরোধ মীমাংসা করেন। তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে।[৬৩]

(২৪১) আব্বাসী সাম্রাজ্য এবং স্পেনের পণ্ডিত ও ব্যবসায়ীদের এক দেশ ত্যাগ করে অক্লেশে এবং বিনা বাধায় বা কোন সুযোগ সুবিধা ছাড়া একে অপরের দেশে বসতি স্থাপনের বহু নজীর রয়েছে। সন্দেহ-ভাজন গুপ্তচরদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার বিষয়টি আমাদের এ আলোচনার আওতাবহির্ভূত। পণ্যদ্রব্য ও পাণ্ডুলিপি ক্রয়-উদ্দেশ্যে শাসকগণ কর্তৃক বিশেষ প্রতিনিধিদল প্রেরণের বহু দৃষ্টান্তও রয়েছে। তাদের প্রতি ব্যবহার সংক্রান্ত কোনরূপ আইন-বিধি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

(২৪২) বর্তমানে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বিদেশীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিধি রয়েছে এবং উহা মুসলিমদের বেলায়ও প্রযোজ্য, এগুলোকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন আমাদের নেই ; কারণ এগুলো মুসলিম আইন-বিধি নয়। এতদসত্ত্বেও অস্বীকার করা যায় না এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে যে, যে কোন বিদেশী মুসলিম বিশ্বের যে কোন মুসলিম দেশে নিজকে নিরাপদভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে নিকট আত্মীয়ের ব্যবহার পায়। এমনকি সরকারী কর্মচারিগণও ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যানুযায়ী তাকে সাহায্য করেন।

(ঙ) অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজা

(২৪৩) আইনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ের বিদেশী মুসলমান ও উপরোক্ত বিদেশী মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আমরা ইতিপূর্বে এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাষ্ট্র শিরোনামাধীন আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, মুসলিম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কবিশিষ্ট স্বাধীন অমুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মুসলিম আইন স্বীকার করে। সেখানে উল্লেখিত কুরআনের উদ্ধৃতি থেকে আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, একটি অমুসলিম রাষ্ট্র তার দেশের মুসলমানদের জন্য যথেচ্ছা আইন প্রণয়নে কতখানি স্বাধীন, এবং কোন মুসলিম রাষ্ট্রের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। সে অনুযায়ী ছাড়পত্রের শর্তাবলী প্রণীত হবে এবং সাময়িক উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের বেলায় উহা প্রযোজ্য হবে।

(২৪৪) নবীর আমলে ইসলামী রাষ্ট্র এবং মক্কানগর রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শান্তি ও প্রত্যর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং মক্কায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর অসহ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের কথা জানা সত্ত্বেও নবী তাঁর নিকট আশ্রয়প্রার্থী মক্কার মুসলমানদেরকে প্রত্যর্পণ করেন।[৬৪]

(চ) মুসলিম রাজ্যে বিদেশী বাসিন্দা

(২৪৫) এদের বেলায় প্রযোজ্য সাধারণ বিধিগুলো আলোচনায়

পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ দু-চারটি মন্তব্য। এগুলো মূলতঃ যে পটভূমিকায় প্রণীত হয়েছিল তা বুঝার পক্ষে সহায়ক হবে।

(২৪৬) আদি ইসলামী যুগে ছাড়পত্রের আইন এই ছিল বলে মনে হয় যে, কোন চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের অধিবাসীকে মুসলিম রাষ্ট্রে আগমনের জন্য[৬৫] কোন অতিরিক্ত অনুমতির প্রয়োজন হত না। তদুপরি তৃতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসী যার মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার আছে, সেও নির্বিবাদে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারত।[৬৬] এ দুই বিদেশীর মধ্যে মৈত্রী বন্ধন থাকার ফলে হোক বা আমাদের মিত্র রাষ্ট্র তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তৃতীয় রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিরাপত্তা প্রদানের ফলেই হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। অন্য কথায় বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু হিসেবে গণ্য হত। স্পষ্টত: তৃতীয় রাষ্ট্র তথা মিত্রের মিত্র যদি মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে প্রকৃত যুদ্ধে লিপ্ত থাকত সেক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হত না। এমন কোন রাষ্ট্রের নাগরিক যার সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের মৈত্রী সম্পর্ক বা বৈরীতা নেই সেক্ষেত্রে তাদের যথার্থ নাগরিকতা প্রমাণ সাপেক্ষে তাদেরকে নাজেহাল না করে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার রেওয়াজ নবীর আমলে ছিল। সুতরাং, বোখারী উল্লেখ করেন যে, একদা জনৈক বিদেশী অমুসলিম এক পাল ভেড়া ও ছাগলসহ পূর্ব অনুমতি ছাড়াই মদীনায় প্রবেশ করেন। শুধু যে তাকে নাজেহাল করা হয়নি তাই নয়, এমন কি, নবী তার কাছ থেকে একটি ছাগলও খরিদ করেন।[৬৭] নবীর যুগে ও তার পরে মদীনায় 'নাবাতীন' কাফেলার আগমনের উল্লেখ আছে।[৬৮] স্পষ্টতই তারা মুসলিম রাষ্ট্রের বাইরে, হয় সিরিয়া নয়তো মোসোপটেমিয়া থেকে আসে। যাহোক, শত্রুরাষ্ট্রের কোন নাগরিক পূর্ব অনুমতি ছাড়া অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের কোন মিত্র রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম না করে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে, মুসলিম রাষ্ট্রে তাকে দাস অথবা অন্য যে কোনরূপ ব্যবহার করতে পারত।[৬৯] তাদের সম্পদের বেলায় শেষোক্ত নীতিই প্রযোজ্য ছিল। বলাবাহুল্য যে, রাষ্ট্রদূতগণ সর্বদাই এই আইনের ব্যতিক্রম ছিলেন। এই শেষোক্ত পর্যায়ের মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশকারী শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিক সম্পর্কে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে যথাযথ আলোচনা করা হবে।

(২৪৭) তাছাড়া আদি মুসলিম আইনবেত্তাগণ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা নিরূপণে স্থানের উপর গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেন। সুতরাং কোন বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক দখলীকৃত শত্রু এলাকায় পাওয়া গেলে, সে যদি মুসলমানদের শত্রুতা না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে থাকে, তাহলে সে মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক দখলীকৃত শত্রু এলাকায় প্রাপ্ত মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের মতই নিরাপদ।[৭০] সে অবশ্যই নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পাবে।[৭১] কিন্তু বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিককে শত্রু রাষ্ট্র যদি আইনসংগতভাবে, যথা যুদ্ধবন্দী হিসেবে এনে দাসে পরিণত করে থাকে তাহলে তার অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকবে।[৭২]

(২৪৮) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ছাড়পত্র বাতিল হতে পারত :

১। নির্ধারিত সময়ের অতিক্রমে [৭৩]

২। ছাড়পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত[৭৪] অথবা প্রত্যেক ছাড়পত্রে উহ্য উহার বতিলকারী শর্তাবলী লংঘনে।[৭৫]

৩। জাল ছাড়পত্র প্রমাণে,

৪। শত্রুর কাছে মুসলিম রাষ্ট্রের গোপন তথ্য সরবরাহে।[৭৬] কিন্তু শুধু অপরাধ, এমনকি হত্যা করলেও ছাড়পত্র আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায় না। অনুরূপ ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীকে বিচার ও শাস্তি প্রদান করবে।[৭৭]

(২৪৯) সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলিম আইন মুসলিম রাষ্ট্রের বিদেশী অমুসলিম বাসিন্দা এবং অন্যান্য আগন্তুককে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের সমমর্যাদা দেয়। সায়বাণী স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

(মুসলিম আইনের) নীতি অনুযায়ী যে সমস্ত বিদেশী অনুমতি-পূর্বক প্রবেশ করে তারা যতদিন (মুসলিম) রাষ্ট্রে আছে ততদিন তাদেরকে রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা মুসলিম শাসকের কর্তব্য যেমন অমুসলিম প্রজাদেরকে দেখা তাঁর কর্তব্য।[৭৮]

উপরন্তু "তারা জিম্মীদের সমমর্যাদার অধিকারী এবং তাদেরকে অন্যায় ও উৎপীড়নের হাত হতে রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলিম শাসকের উপর রয়েছে।"[৭৯]

(২৫০) একজন বিদেশী আগন্তুক মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান কালে মুসলিম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত[৮০] তবুও কিছু কিছু কাজ যা মুসলিম আইনে দণ্ডনীয় যথা, মগুপান তাতে তাদের বাধা নেই। এ ব্যাপারে অবশ্য আবু ইউসুফ ও সায়বানীর মধ্যে মতানৈক্য আছে। আবু ইউসুফের মতে একমাত্র মগুপান ব্যতীত সমস্ত ব্যাপারেই একজন বিদেশী মুসলিম দণ্ডবিধির অধীন কিন্তু সায়বানী 'হাক্কুল্লাহ' ও 'হাক্কুল ইবাদ'-এর মধ্যে পার্থক্য করে এই মত পোষণ করেন যে, একমাত্র 'হাক্কুল ইবাদ' হানিকর অপরাধ যথা, মানহানি, হত্যা ইত্যাদির বেলায় বিদেশী মুসলমানগণকে শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।[৮১]

(২৫১) সায়বানী লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

আতীয়া ইবনে কায়েস আল্-কিলাবী উল্লেখ করেন, নবী বলেছেন যে, যদি কেউ হত্যা, ব্যভিচার বা চুরি করে (আমাদের রাজ্যে) এবং পালিয়ে যায় এবং পুনরায় অনুমতি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে সেক্ষেত্রে সে যে অপরাধের জন্য পালিয়ে গিয়েছিল তারই বিচার হবে এবং তার জন্যই শাস্তি ভোগ করবে। কেউ যদি শত্রু রাষ্ট্রে হত্যা বা ব্যভিচার বা চুরি করে এবং অনুমতিক্রমে ফিরে আসে সেক্ষেত্রে সে শত্রুর রাষ্ট্রে কৃত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হবে না।[৮২]

সুরখ্সী আরও উল্লেখ করেন ঃ

ইহাই আমাদের অর্থাৎ হানাফী মতাবলম্বী পণ্ডিতদের ভিত্তি।

(২৫২) এই মূলনীতি অনুযায়ী মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধই শুধু নয় বরং মুসলিম রাষ্ট্রে ভ্রমণরত তার স্বদেশীর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধও মুসলিম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত।[৮৩] কোন্ অপরাধের বিচার স্থানীয় আইন অনুযায়ী হবে আর কোন্টার বিচার হবে তার বিদেশীয় আইনে তা নির্ভর করে চুক্তির শর্তাবলীর উপর। সায়বানী মুসলিম বিচারপতিগণ কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রে বৈধভাবে প্রয়োগযোগ্য বিদেশী রাষ্ট্রের আইনগুলো বার বার উল্লেখ করেছেন। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুরখ্সী, শরহু সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২-৪০, ৬৭, ১৫১, ২০১, ২৩১, ২৮৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।) সংক্ষেপে, একজন বিদেশী আগন্তুক ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকালে

যাবতীয় অপরাধের জন্য মুসলিম বিচারালয়ের নিকট দায়ী কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের বাইরে ঘটিত অপরাধ মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের বিরুদ্ধে হলেও উহার আওতাধীন হবে না।[৮৪]

(২৫৩) একজন বিদেশী আগন্তুকের স্থানীয় মুসলিম নাগরিকের বিরুদ্ধেও মুসলিম আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার রয়েছে।[৮৫] প্রাথমিক যুগের মুসলিম আইনবেত্তাদের মতে তার এই অধিকার অবস্থানরত মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে তার স্বদেশের যুদ্ধ বাধার দরুন ক্ষুণ্ণ হয় না।[৮৬] উক্ত বিদেশীর দেশে অবস্থানরত মুসলিম প্রবাসিগণ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও এই নীতি বহাল থাকবে। কারণ, 'কেহ কাহারও ভার বহন করিবে না' (কুরআন, সূরা আনয়াম, ১৬৪) এবং মুসলমানগণ অবশ্যই তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে।[৮৭]

(২৫৪) বিদেশী আগন্তুক ও মুসলিম নাগরিকের মধ্যকার ঋণ, জামানত, বন্ধকী জিনিষ, বন্ধকী সম্পত্তি, উত্তরাধিকার এবং উইল প্রভৃতি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা সম্ভবতঃ জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিসংগত। এ প্রসংগে পরিশিষ্ট 'খ' অথবা সুরখ্‌সীর সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫, ৬৭, ২৮৩, ২৮৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(২৫৫) বিদেশী বা বৈদেশিক মালের উপর ধার্যকৃত আমদানী শুল্ক বা অন্যান্য কর স্থানীয় আইন ও লিখিত চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সায়বানী বলেন, মুসলিম রাষ্ট্রের নাবালক ও মহিলা নাগরিক যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে আমদানী শুল্ক থেকে রেহাই পায় তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকও মুসলিম রাষ্ট্রে অনুরূপ সুবিধা পাবে।[৮৮]

(২৫৬) দেশী, বিদেশী নির্বিশেষে অমুসলিমদের এখতিয়ারের একটি বিশেষ দিক আছে। 'বিশেষ সুবিধা' এই শিরোনামায় পরে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব (২৬৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

এখতিয়ার সংক্রান্ত অসাধারণ বিষয়াদি

(২৫৭) সাধারণতঃ যে কোন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূখণ্ড সেই রাষ্ট্রের বিচার ক্ষমতাধীন ; কিন্তু এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম এবং অসাধারণ বিষয়াদি রয়েছে যা এখনই আলোচিত হবে।

১। রাষ্ট্রপ্রধান

(২৫৮) ইহা অনস্বীকার্য, রাষ্ট্রপ্রধানগণ রাজ্যের মধ্যে অনুপম মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু মুসলিম আইন অপরাপর আইন ব্যবস্থার ন্যায় 'রাজা কোন অপরাধ করতে পারে না' এই নীতি স্বীকার করে না। একজন মুসলিম শাসক, শাসক হিসেবে যথা বিচার কার্য নির্বাহ কালে যে কোন কাজ করেন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় না। অপর দিকে, শাসক যদি ব্যক্তিগত ক্ষমতায় কোন কাজ করেন তাহলে অন্যান্য মুসলিম নাগরিকদের মত তিনিও সাধারণ মুসলিম বিচারালয়ের বিচারাধীন। কারণ শাসকগণও অন্যান্য নাগরিকেদের মতই আইনের অধীন। অতএব নবী তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও অভিযোগ শ্রবণ করেছেন। খলিফাদের সময় শহর কাজী অথবা শাসক যেখানে অবস্থান করতেন সেখানকার কাজীর নিকট অভিযোগ পেশ করা হত এবং আবু বকর, ওমর, আলী ও উমাইয়া এবং আব্বাসীদের বহু খলিফা বিচারকের শমনে আদালতে হাজির হন।[৮৯] এই নীতি অনুযায়ী শাসকের কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ থাকলে নিজে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ না করে প্রতিপক্ষের ন্যায় আদালতে মামলা দায়ের করতেন। শেষোক্ত ধরনের ঘটনাবলী প্রথম চার খলিফার সময়েই দেখা যায়। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে অনুরূপ কোন ঘটনার বিষয় আমার জানা নেই।

(২৫৯) বিষয়টির অসাধারণ গুরুত্ব থাকার কারণে উক্ত ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা আমি প্রয়োজন মনে করি, যাতে পাঠকবর্গ উহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন।

নবীর আমল

(২৬০) শামী লিখিত নবীর জীবনী থেকে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো সংগৃহীত হয়েছে ঃ[৯০]

(ক) হাবীব ইবনে মুস্‌লেমার বরাত দিয়ে ইবনে আসাকীর উল্লেখ করেন ঃ একদা নবীর অজান্তে এক ব্যক্তি নবীর দ্বারা তার গায়ে ব্যথা পায়। সে উহার বদলা দাবী করে। অতঃপর জীবরাইল এসে

নবীকে বললেন ঃ হে মোহাম্মদ, আল্লাহ্ তোমাকে অত্যাচারী বা উদ্ধত করে পাঠান নি। ইহাতে হযরত বেদুঈনের নিকট এসে বললেন ঃ আমার উপর প্রতিশোধ নাও।

(খ) ইবনে ইসহাক নবীর জনৈক সাহাবীর বরাত দিয়ে নিম্ন ঘটনার উল্লেখ করেন ঃ

সাহাবী বলেন ঃ হুনাইয়েনের দিন আমি তাড়াহুড়া করে চলছিলাম। আমার পায়ে ছিল ভারী স্যাণ্ডেল। উহা দ্বারা আমি হযরতের পা মাড়াই। হযরতের হাতে ছিল একটি চাবুক। তিনি উহা দ্বারা আমাকে আঘাত করেন………। পরদিন প্রত্যূষে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আশিটি ছাগল দিয়ে বললেন ঃ উহার জন্যে এগুলি গ্রহণ কর।

(গ) ইবনে হিব্বান উল্লেখ করেন ঃ একদা বদরের দিনে নবী সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন এবং কেউ যথাস্থানে না থাকলে তাকে যথোপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে বাহিনীর গঠন বিন্যাস করছিলেন। একজন সৈনিক লাইন থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিল। নবী তার হাতের ছোট লাঠিটি দিয়ে তার পেটে গুতো মারেন। সে অভিযোগ করে এবং বদ্‌লা দাবী করে। নবী তাঁর জামা তুলে গুতো মারার জন্য পেট এগিয়ে দেন। (কাহিনীটি ইব্‌নে হিশামও উল্লেখ করেছেন পৃঃ ৪৪৪)

(ঘ) আবু হুরাইরা এবং আবু সাঈদ খুদ্‌রীর বরাত দিয়ে আদ্ দারিমী ইবনে হুমায়েদ ও আবদুর রাজ্জাক উল্লেখ করেন ঃ একদা মক্কা নগরীর জনৈক মুসলিম বৃদ্ধ নবীর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ করতে চায়। এক অভিযানের উদ্দেশ্যে নবী যাত্রার উদ্যোগ করছিলেন। যাত্রার দিন ভোর বেলায় ফজরের নামাজে ইমামতের উদ্দেশ্যে তাঁবুতে যাওয়ার জন্য তিনি যখন উটে আরোহণ করেন, ঠিক সেই সময়ে বৃদ্ধ লোকটি নবীর পথ আগলিয়ে দাঁড়ায় এবং তার কথা না শুনে এগুতে বাধা দেয়। নবী তাকে বেত্রাঘাতে সরিয়ে দিয়ে চলে যান। নামাজের পর বিমর্ষ বদনে জমায়েতে ফিরে এসে তিনি বলেন ঃ এইমাত্র আমি যাকে বেত্রাঘাত করলাম সে কোথায়? এবং কয়েকবার তিনি একই প্রশ্ন

করেন। লোকটি ভীত হয়ে ক্ষমা চাইতে থাকে। কিন্তু নবী বললেন: তাকে আসতে দাও এবং সে যখন এল তিনি বললেন: এই সেই চাবুকটি, নাও এবং তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বলল: অসম্ভব আমি আল্লার নবীকে বেত্রাঘাত করব: নবী বললেন: তোমাকে তাই করতে হবে যদি না ক্ষমা কর।

(ঙ) আবু সাঈদ আল্-খুদ্রীর বরাত দিয়ে ইবনে হাম্বাল, আবু দায়ূদ এবং আন-নাসায়ী উল্লেখ করেন: একদা নবী যখন কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণ করছিলেন এক ব্যক্তি এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে। তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মুখে আঘাত করেন। এরপর নবী তাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেন।

(চ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্দ ওমামা আল্-বাহিলীর বরাত দিয়ে ইবনে কানী উল্লেখ করেন: বিদায় হজ্জের সময় আমি নবীর নিকটে আসি এবং তাঁকে উটে আরোহিত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি দু'হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরি। তিনি আমাকে বেত্রাঘাত করেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্র নবী, প্রতিশোধ চাই। তিনি চাবুকটি আমার হাতে এগিয়ে দেন। আমি তখন তাঁর পা চুম্বন করি।

(ছ) মোহাম্মদ ইব্নে ওমর আল আস্লামী অর্থাৎ আল্-ওয়াকাদী উল্লেখ করেন: নবী যখন তায়ীফ থেকে আল জায়রানা যাচ্ছিলেন আবু রুহম উটে চড়ে নবীর পাশে পাশে যাচ্ছিলেন। তাঁর জুতা নবীর পায়ের সংগে ঘর্ষণ লাগে এবং তিনি ব্যথা পান। নবী আবু রুহম্কে বলেন: তুমি আমার পায়ে আঘাত দিয়েছ, তুমি পা সরিয়ে নাও এবং তিনি আমার পায়ে বেত্রাঘাতও করেন। আবু রুহম্ বলেন: আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ি, না জানি কুরআনে আমার এ আচরণ সম্পর্কে কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে আমাকে কলংকিত করে দেয়। যদিও আমার পালা ছিল না তবুও নবী পাছে আমাকে ডেকে পাঠান এই ভয়ে আমি সেদিন উট চরাতে চলে যাই। বিকেলে যখন পশু পাল নিয়ে আমি শিবিরে ফিরি, লোকেরা বলল: নবী আমায় খোঁজ করেছিলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি নবীর

নিকটে যাই। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে পায়ে ব্যথা দিয়েছ এবং আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করেছিলাম। সুতরাং, আমার আঘাতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই ছাগলগুলি গ্রহণ কর। আবু রুহম বলেনঃ সমগ্র পৃথিবী ও উহার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবের চেয়ে নবীর সন্তুষ্টিই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

(জ) নবী তাঁর জীবনের প্রায় অন্তিম মুহূর্তে এক গণসমাবেশে ভাষণ দান কালে বলেনঃ

হে আমার উম্মতগণ! আমার কাছে তোমাদের পাওনা থাকতে পারে। যদি আমি কারুর পিঠে বেত্রাঘাত করে থাকি সে আমার পিঠে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করুক। যদি আমি কাউকে তিরস্কার বা মানসম্ভ্রমে আঘাত করে থাকি সে আমার নিকট হতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আমি যদি কারো সম্পত্তি নিয়ে থাকি, আমার সম্পত্তি রইল, তাকে নিতে দাও এবং তার দর কষাকষির ভয়ও নেই; কেননা এ আমার অভ্যাস নয়। বস্তুতঃ সে আমার নিকট অধিক প্রিয়, যে আমার কাছ হতে তার ন্যায্য প্রাপ্য গ্রহণ করে অথবা আমাকে ক্ষমা করে। এইভাবে নিষ্কলুষ চিত্তে আমি আমার আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে চাই। এক ব্যক্তি দাবী করেন যে, নবী তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাকে সে টাকা দেওয়া হয়।[১১]

(ঝ) সোয়াদ ইবনে আমর বলেনঃ একদিন আমি এমন জাঁকাল রঙের পোষাক পরিধান করেছিলাম যা কেবল মেয়েদেরকেই মানায়। আমি যখন নবীর সম্মুখে গেলাম তিনি বিরাগ প্রকাশ করে তাঁর হস্তস্থিত ছড়ি দিয়ে আমার পেটে গুতো দেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র নবী, আমি এর প্রতিশোধ নেব। এ কথার পর তিনি তাঁর পেট উম্মুক্ত করে দেন। (কাদী ইয়াদ, আল-সিকা পৃঃ ৩১১)

(ঞ) আল্‌-বাইহাকী, ইবনে হিব্বান, আল্‌ তাবারানী এবং আবু নুয়াইম উল্লেখ করেনঃ একদা জায়ীদ ইব্‌নে সা'না নামে এক ইহুদী নবীর নিকট এসে অতি সত্বর ধারের টাকা পরিশোধের দাবী করে এবং

কড়া কথা শুনায়। হযরত ওমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তা বরদাশত করতে পারেন নি। হযরত ওমরের হস্তক্ষেপে নবী বলেনঃ ওমর, তোমার উচিত ছিল সংগতভাবে টাকা চাইতে তাকে পরামর্শ দেওয়া এবং আমাকে পরামর্শ দেওয়া যাতে আমি ঠিকভাবে ধার পরিশোধ করতে পারি।[৯২] এর মধ্যে নবী কর্তৃক তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তিকে সালিশ মানার ইঙ্গিত রয়েছে। যাহোক, নবীর মর্যাদা ছিল অনন্য এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে তিনি কোনরূপ অন্যায় করতে সম্পূর্ণ অপারগ। এমন কি যেসব ব্যাপারে তিনি নিজেও একটি পক্ষ। কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে নবীর প্রতি আল্লাহ্‌র তিরস্কারের কথা উল্লেখ আছে তাতে এরই সমর্থন পাওয়া যায় যে, নবীর কোন ভুল-ত্রুটি আল্লাহ্‌ সংগে সংগে সংশোধন করতেন এবং নবীকে ভ্রান্তির মধ্যে থাকতে দিতেন না।

(২৬১) খলিফাদের আমল—নবীর ইন্তিকালের পর পরই খলিফাদের আমলে এই নীতি গ্রহণ করা হয় যে, বাদী বা বিবাদী ও বিচারক একই ব্যক্তি হতে পারবে না, এমনকি তিনি খলিফা হলেও।[৯৩] সেহেতু ব্যক্তিগত পর্যায়ে খলিফাদের যখন কোন মামলা দায়ের করতে হত বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হত সে ক্ষেত্রে স্থানীয় আদালত অভিযোগ শ্রবণ করতেন। হযরত আবু বকর,[৯৪] ওমর,[৯৫] ওসমান,[৯৬] আলী,[৯৭] আব্বাসীয় খলিফা আল্ মনসুর,[৯৮] স্পেনীয় আল্-হাকাম ইবনে হিশাম ইবনে আবদুর রহমান আল্-দাখিল[৯৯] প্রমুখ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অন্যান্যদের সম্পর্কে এ ধরনের মামলার যে উল্লেখ আছে এর সব কটাতেই এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। এ সব মামলার বিশদ বিবরণ এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিছু কিছু মামলা এবং আলোচনার জন্য আল-মোয়ার্দী দ্রষ্টব্য।

(২৬২) অবশ্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যখন কোন রাজা নিজ রাজ্য ছাড়া কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হন সেক্ষেত্রে তিনি শেষোক্ত রাষ্ট্রের সাধারণ আইনের এখতিয়ারভুক্ত। খাসানের শাসক যাবালা ইব্‌নে আল্-আইহামের ঘটনাটি এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা

যেতে পারে। মক্কায় তিনি একজন বেদুঈনের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন। বেদুইনকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি খলিফা ওমর কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং অন্যথায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী তিনি শাস্তি ভোগ করবেন।[১০০] এও লক্ষ্যণীয় যে, ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এই নীতিটি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

২। দূত ও রাষ্ট্রদূত

(২৬৩) পরে ভিন্ন পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৩। আন্তর্জাতিক বিচারক ও সালিশ

(২৬৪) হযরত আলী ও মুয়াবীয়ার মধ্যকার গৃহযুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ থেকে একজন করে দু'জন সালিশ নিযুক্ত করা হয়। যুধ্যমান উভয় পক্ষ কর্তৃক এই সালিশদ্বয়কে বিশেষ সুবিধা, ন্যূনপক্ষে জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে (অনুচ্ছেদ ২৯৯) আমরা এই বিষয় সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করব।

৪। সরকারী সশস্ত্র বাহিনী

(২৬৫) যখন কোন সশস্ত্র বাহিনী শত্রুভাবাপন্ন হয়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে, স্পষ্টত তারা স্থানীয় এখতিয়ারভুক্ত নয়। কিন্তু এ ধরনের সেনাবাহিনীর ছাউনি, সাময়িকভাবে সেনাবাহিনী যে রাষ্ট্রের অধীন সে রাষ্ট্রে ভূখণ্ড হিসাবে পরিগণিত হয় কিনা এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব মুসলিম আইনবক্তাগণ দিয়েছেন।

মুসলিম সেনাবাহিনী

(ক) "খলিফা অথবা সিরিয়ার গভর্নর যদি কোন যুদ্ধ অভিযানের ভার গ্রহণ করেন········তার ছাউনি মুসলিম ভূখণ্ড বলে গণ্য হবে।"[১০১]

(খ) "মুসলিম সেনাবাহিনী যদি শত্রু রাষ্ট্রে প্রবেশ করে মুসলিম ছাউনি মুসলিম ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য হবে।"[১০২]

(গ) "তারা যদি প্রত্যুত্তরে বলেঃ একজন দাস ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলিম ছাউনিতে আশ্রয় নেওয়ার পর আজাদ, তা নয় কি? এবং তোমাদের মতে কেবল ইসলামী রাষ্ট্রেই একজন আজাদী প্রাপ্ত হতে পারে। এর জবাবে আমরা বলবঃ মুসলিম ছাউনির অবর্তমানে

যদি কোন দাস সে স্থানে যায় তাহলে সে আজাদ প্রাপ্ত হবে না। সে কেবল আজাদ প্রাপ্ত হয় তখনি যখন সে মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে আশ্রয় নেয় এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর আশ্রয় দেওয়ার মত প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি থাকে।"[১০৩]

(ঘ) "মুসলিম রাজ্যের বিদেশী বাসিন্দাদের রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব। সেহেতু যদি কোন শত্রু রাষ্ট্র মুসলিম ভূখণ্ড আক্রমণ করে এবং বিদেশী বাসিন্দাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিম প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রম করে তখন মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ বন্দী হলে মুসলমানগণ তাদের উদ্ধারের জন্য যা করত তেমনি বিদেশী বাসিন্দাদের বেলায়ও তাই তাদের উপর প্রযোজ্য।"[১০৪]

(ঙ) "সেনাবাহিনীও তেমনি আশ্রয় দেয় যেমনটি ভূখণ্ড দেয়।"[১০৫]

শত্রুবাহিনী ঃ

"বিধর্মী শত্রু সেনাবাহিনী যদি মুসলিম রাজ্যে প্রবেশ করে তাদের সাথে কোন মুসলিমের লেনদেন করতে হলে অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত ; কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটি তাদের রাজ্যে যাওয়ার সামিল বলে গণ্য হবে। এও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সামরিক ছাউনির প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। শত্রু রাজ্য যেমন ইসলামী এখতিয়ারভুক্ত নয় তেমনি তাদের সামরিক ছাউনিও। "......... তোমরা কি লক্ষ্য করনি মুসলিম সেনাবাহিনী শত্রু রাজ্যে প্রবেশ করার পর সেখানে যদি কোন লেনদেন হয় তা আইনের দৃষ্টিতে মুসলিম রাজ্যে সংঘটিত লেনদেনের অনুরূপ বলে গণ্য করা হয়?"[১০৬]

(২৬৬) কিন্তু মিত্র রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে মিত্র রাজ্যে প্রবেশের ফলে সেনাবাহিনী স্থানীয় শাসনের এখতিয়ারভুক্ত হবে কিনা এই প্রশ্নের সঠিক জবাব প্রাচীন প্রমাণের ভিত্তিতে দেওয়া যায় না। তবে যা-ই হোক কোন দেশের অভ্যন্তরে মিত্র দেশের সেনাবাহিনীকে যে চুক্তির বলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় সে চুক্তির শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে যে তারা সাধারণ বিদেশী বাসিন্দা বা আগন্তুক হিসেবে গণ্য হবে

অথবা স্বায়ত্বশাসনাধিকার ভোগ করবে। সরখসী মত প্রকাশ করেছেন যে, এমনকি যদি বিনা চুক্তিতেও এরূপ প্রবেশ ঘটে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি বিদেশী সেনাবাহিনীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তারা যদি দুর্জয় ও প্রতিরোধক্ষম হয় তাহলে তারা স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার (অর্থাৎ মুসলিম আদালতের) এখতিয়ারে আসে না।[১০৭]

৫। নিরপেক্ষ ও লা-ওয়ারিশ ভূমি

(২৬৭) সম্পত্তি বিষয়ক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচিত হয়েছে এবং আমরা চতুর্থ খণ্ডে নিরপেক্ষতা শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

৬। বিশেষ সুবিধাদি, শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ, (Capitulation) অতিরাষ্ট্রিকতা (Exterritorality):

(২৬৮) বাণিজ্যিক ও অন্যান্য পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে স্মরণাতীত কাল থেকে বিদেশীদেরকে বিশেষ সুবিধাদি ওপ্রলোভনের দ্বারা আকৃষ্ট করা হয়েছে। কথিত আছে যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও মিসরের ফেরাউন এ্যামিসিস নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রীকদেরকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের বাইরে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিজেদের আইন অনুসারে নিজেদের বিচারক দ্বারা মীমাংসার অধিকার দিয়েছিলেন।[১০৮] (২২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

(২৬৯) অমুসলিমদের ব্যাপারে অনুরূপ নীতি অবলম্বনের জন্য কুরআন মুসলিম শাসকদের আদেশ করেছে।[১০৯] নবীকে সর্বাধিনায়ক করে মক্কার অধিবাসী, মাদানী আরব এবং ইহুদী সম্বলিত মদিনা নগর রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহুদিগণ বিচার ক্ষমতা তাদের হাতে রাখে এবং যেসব ব্যাপার তারা তাদের খুশীমত নবীর কাছে পাঠাত সে ব্যাপারে নবীকে চূড়ান্ত বিচারক বলে গণ্য করত।[১১০] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ ইহুদী, এমন কোন সালিশ নবীর কাছে উত্থাপন করা হলে নবী তাদের নিজস্ব আইন মাফিক বিচার করতেন।[১১১] এ সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে।

। যদি তোমার নিকট আসে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কারও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায় বিচার করিও। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন। তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচার ভার ন্যস্ত করিবে যখন তাহাদের নিকট রহিয়াছে তওরাত যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে? ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা বিশ্বাসী নহে। বল, 'হে কিতাবিগণ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।"[১১২]

(২৭০) নাজারান (ইয়ামান) ও আইলার (আকাবা) খৃষ্টানগণ এবং খাইবার ও মাক্না্র ইহুদিগণ যখন মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তখন নবী, যেসব ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত, সে সব বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য তাদেরকে বিচারাধিকার দেন। কিন্তু মামলার এক পক্ষ মুসলিম হলে তা জাতীয় আন্তর্জাতিক আইনের আওতাধীন হওয়ার দরুন তার বিচার সাম্প্রদায়িক আদালতে না হয়ে সরকারী আদালতে হত।

(২৭১) গোঁড়া খলিফাদের আমলে এ ব্যবস্থার আরো উন্নতি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য:

মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা যেকোবীরা (Jacobites) আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়েছিল তা হল এই যে, প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বশাসিত বলে স্বীকৃতি এবং এসব সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতাদেরকে বেশ পরিমাণে পার্থিব ও বিচার ক্ষমতা প্রদান।[১১৩]

(২৭২) খলিফা হযরত ওমরের আমলে সিরিয়া বিজয়ের মাত্র পনর বছর পর জনৈক নাস্তারী ধর্মযাজক তার বন্ধুর নিকট লিখিত এক পত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় অপর একটি সমসাময়িক দলিলে উল্লেখ করেন:

এইসব আরব যাদেরকে আল্লাহ্ এই যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন তারা আমাদেরও প্রভু হয়েছেন। কিন্তু তারা খৃষ্ট ধর্মের

সাথে আদৌ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না, বরং তারা আমাদের ধর্ম রক্ষা করে, আমাদের ধর্মযাজক ও সাধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আমাদের গির্জা ও মঠে চাঁদা প্রদান করে।[১১৪]

(২৭৩) আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।[১১৫] সব সময় কুরআনের একই নীতি প্রযোজ্য হয়েছে, এমন কি দ্বিতীয় সুলতান মোহাম্মদ কনষ্টান্টি-নাপোল বিজয়ের পর যখন বিশেষ অধিকারের দাবী মেনে নেন এবং যা পরবর্তী কালে তুরস্ক ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে বহুল অপব্যবহৃত শর্তাধীন চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৭। প্রত্যর্পণ

(২৭৪) প্রত্যেক রাষ্ট্র আপন ভূখণ্ডে অবস্থিত সব কিছুর উপর এখতিয়ার প্রয়োগের অধিকারের উপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক স্বার্থে প্রায়ই অপরাধী প্রত্যর্পণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রত্যর্পণের ব্যাপারটি সময় সময় পারস্পরিক এবং কদাচিৎ একতরফা হয়। ৬ হিজরীতে মক্কা নগর-রাষ্ট্র এবং নবীর মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি শেষোক্ত প্রকারের চুক্তির প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। সেই সূত্রেঃ "মাওলার অনুমতি ভিন্ন কুরাইশদের যে কোন ব্যক্তি মোহাম্মদের নিকট গেলে মোহাম্মদ তাকে তাদের নিকট প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু মোহাম্মদের দলভুক্ত কেউ কুরাইশদের নিকট গেলে তারা তাকে প্রত্যর্পণ করবে না।"[১১৬]

৩১ হিজরীতে সুদানের রাজার সংগে সম্পাদিত চুক্তিটি অপর এক প্রাচীন নজীর। এই চুক্তির ফলে সুদানের রাজা এই শর্ত পালনে রাজী হন যেঃ "সমস্ত পলাতক দাসদেরকে মুসলিম রাজ্যে তাড়িয়ে দেওয়াও আপনার উপর অপরিহার্য। উপরন্তু, মুসলিমদের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত কোন মুসলিম আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থী হলে তাকে তাড়িয়ে দেবেন। আপনার রাজ্য হতে বিতাড়িত করে তাকে মুসলিম রাজ্যে ফিরিয়ে দেবেন। তার প্রতি সদয় হবেন না এবং তাকে রক্ষা করবেন না।"[১১৭]

(২৭৫) পারস্পরিক প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত চুক্তির জন্য আল্-কাল্-কাসান্দী দ্রষ্টব্য।[১১৮]

টীকা ঃ

১। আল-কুরআন, সুরা হুজুরাত, ১০।

২। সহিহ, মুসলিম, পঞ্চম খণ্ড; ১৩৯—৪০।

৩। আল-কুরআন, সুরা নিসা, ১০১। তুলনীয়। এই আয়াত সম্পর্কে তাবারীর তফসীর।

৪। আস-সায়বানী, কিতাবুল উসুল; আবদুল আজীজ ইবনে মোহাম্মদ আররাহাবী; আবু ইউসুফ, কিতাবুল খরাজ পৃঃ ৭০। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জাকাত দান নয় বরং রাষ্ট্র কর্তৃক মুসলমানদের উপর আরোপিত কর। বিশদ আলোচনার জন্য Pak History Journal, করাচী, তৃতীয় খণ্ডে (১৯৫৫) প্রকাশিত লেখকের 'নবীর আমলে বাজেট ও কর প্রথা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। সায়বানীর মতে অমুসলিমরা গরু, ভেড়া, ও উটের পালের জন্য দেয় কর হতে মুক্ত। স্পষ্টতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পশুপালের উপর ধার্য কর জাকাত বলে অভিহিত হবে না। অবশ্য এ নয় যে, তাদের সম্পত্তির উপর কোনরূপ কর ধার্য হবে না যদি পশু পালের সংখ্যা বেশীও হয়।

৬। তুলনীয়, তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৪৯৭, ২৬৬৫।

৭। আল কুরআন, সুরা মায়িদা ৪৪-৪৮। খলিফা ওমরের আমলের রেওয়াজ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য dictionnaire d' Histoire et Geographie Ecclesiastique পৃঃ ৫৯৪। পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িক নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ইবনে ফদলুল্লাহ্ আল-উমারী, التعريف بالمصطلح الشريف পৃঃ ১৪২-৬।

৮। আবু ইউসুফ কর্তৃক উল্লিখিত নবীর নির্দেশ, কিতাবুল খরাজ পৃঃ ৭১। সরখ্সী, সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ৫২ দ্রষ্টব্য।

৯। এই বিষয়টির উপর গভীরভাবে আলোচনা করলে অমুসলিম প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করার অন্যান্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তারা (অমুসলিম প্রজা) তাদের সঞ্চিত টাকা, পরিমাণে যতই হোক, এর জন্য কোন কর দেয় না। সুদ গ্রহণেও তাদের কোন

বাঁধা নেই ; বস্তুতঃ সাধারণ ব্যবসায়ের চেয়ে সুদ গ্রহণের মাধ্যমেই পুঁজি বেশী বৃদ্ধি পায়। মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত ছিল; সেই হেতু মুসলমানদের তুলনায় জিম্মীদের উপর ধার্য আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ ছিল।

১০। আবু ইউসুফ, কিতাবুল খরাজ পৃঃ ৬৯-৭২।

১১। ইবনে রুশদ, বিদায়িতুল মুজতাহিদ, প্রথম খণ্ড, ৩৭১।

১২। তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৪৯৭, ২৬৬৫।

১৩। আস-সুইয়ূতী,

حسن المحاضرة فى اخبار مصر و القاهرة,

পরিচ্ছেদ, خليج امير المؤمنين

১৪। তুলনীয়, ৬৫ অনুচ্ছেদ।

১৫। সরখ্সী, সিয়ারুল কবীর, প্রথম খণ্ড, ৯৩।

১৬। আবু ইউসুফ—কিতাবুল খরাজ, পৃঃ ৭৯।

১৭। তারীখু মক্কা পৃঃ ৫০১।

১৮। তাবাকাত, পঞ্চম খণ্ড, ৩৬৫।

১৯। আল আজরাফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৯, ৩৩৬,৩৯৬; আল বালাজুরী, ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৫৪।

২০। এম, ইউসুফুদ্দীন, Social Security in Islam, Congress of Orientalists, ইস্তাম্বুল, ১৯৫১।

২১। ইবনে জানযুয়াই, কিতাবুল আমওয়াল (পাণ্ডুলিপি, বুরদুর, তুরস্ক)।

২২। আল-কুরআন, সূরা তওবা; ৮৯।

২৩। সরখ্সী, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ১১৯ ; আবু ইউসুফ কিতাবুল খরাজ, পৃঃ ৭৪ ; ইবনে মাযাহ্, ১৭ঃ ৪১; তিরমিজী, ১৯ঃ ৩১; সাফী আল-উম্ম, চতুর্থ খণ্ড, ৯৬।

২৪। সায়বানী কর্তৃক উদ্ধৃত, আল-আমলু, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪১-২।

২৫। ঐ।

২৬। আল মাবসুত, দশম খণ্ড, ১১৯।

২৭। কিতাবুল খরাজ, পৃঃ ৭৩।

২৮। বদরুদ্দীন ইবনে জুমআহ, তাহরীরুল আহ্‌কামী ফি তাদবীর আহলিল ইসলাম।

২৯। সরখ্‌সী, সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ১১৫; আল-কাসানী, بدائع الصنائع, সপ্তম খণ্ড, ১১০।

৩০। সরখ্‌সী, সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ১১৫।

৩১। ঐ।

৩২। সরখ্‌সী কর্তৃক উদ্ধৃত, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯৫; সিয়ারুল কবীর। চতুর্থ খণ্ড, ১২৮, ১৩০।

৩৩। কুরআন (সূরা ইউসুফঃ ৭৫) অনুযায়ী প্রেটিয়ার্ক যোসেফের আমলে মিশরে এমনকি ফৌজদারী মামলায়ও বিদেশীদেরকে তাদের নিজস্ব আইন মাফিক বিচার করা হত।

৩৪। সরখ্‌সী, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯৫।

৩৫। ঐ, দশম খণ্ড, ৯৫-৭, ২৫১ অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

৩৬। ঐ, পৃঃ ৭০।

৩৭। ইবনে সা'দ, ১/১, পৃঃ ১৩৬; ইবনে হিশাম, পৃঃ ২১৭; তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৬০৩; ইবনে হাম্বাল, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮; Revista degli Studi Orientali, দশম খণ্ড (১৯২৩) পৃঃ ৯০-৮।

৩৮। ইবনে সা'দ, ১/২ খণ্ড, পৃঃ ৩১—ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৫৮।

৩৯। তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৫৬৭।

৪০। Islamic Research Association Miscellany, ফৈজী সম্পাদিত, বোম্বাই, পৃঃ ৬৭-৭০, "Ex territorial Capitulations in Favour of Muslims in Classical Times" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪১। মাকরিজী, খিতাত, বুলাফ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ২০০।

৪২। আবদুল জাব্বার খান, মাহ্‌বুবুল ওয়াতান, পৃঃ ৪০।

৪৩। আল-বালাজুরী, ফুতুহুল বুলদান, পরিচ্ছেদ 'সিন্ধু বিজয়"; কুদামা ইবনে জাফর, কিতাবুল খরাজ, পরিচ্ছেদ 'সিন্ধু বিজয়' (পান্ডুলিপি নং ১০৭৬, কপরুলো, ইস্তাম্বুল)।

৪৪। কুদামা, পূর্বোল্লিখিত, ইস্তাম্বুল পান্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ১৯ খণ্ড।

৪৫। আমি নিশ্চিত যে, "বাইসার" পারসিক "পিসার" শব্দের আরবীকরণ। অন-আরব মাতার গর্ভে আরবদের যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পারসিক ভাষাভাষী দেশে জন্ম গ্রহণ করত, তাদেরকে 'পিসার' বলে অভিহিত করা হত। এদের মধ্যে অদ্ভুত মিল ছিল যে, অপারসিক মাতার গর্ভে পারসিকদের কোন সন্তান হলে তাদেরকে ইবনুন অর্থাৎ পুত্র, বহু বচনে ইবনা বলে অভিহিত করা হত।

৪৬। মুরুজ আজ-জাহাব (ইউরোপীয় সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৫-৬।

৪৭। ঐ, প্রথম খণ্ড, ৩৮২।

৪৮। Merveilles de L' Inde, পৃঃ ১৬০-১।

৪৯। ঐ, পৃঃ ১৪৩।

৫০। ইবনে হাউকাল, আল-মাসালিক ওয়াল মাসালিক, পৃঃ ২২৭-৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩২০)।

৫১। Revue des Etudes Islamiques (১৯৩৮) পৃঃ ১০৪।

৫২। পশ্চিম ঘাটে অউন্ধ নামে একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাষ্ট্রে অনুরূপ পরিস্থিতি লেখক নিজে ১৯৩৯ সালে প্রত্যক্ষ করেন। সেখানকার রাজা প্রধান কাজীর ভূমিকা পালন করতেন এবং মুসলমানগণ জুম'আর নামাজ অবহেলা করলে জরিমানা করতেন। কোচিন পরিস্থিতির জন্য Christian College Magazine, মাদ্রাজ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১২, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩-এ প্রকাশিত কাদির হুসেন খান-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫৩। তোহফাতুল মুজাহিদীন ফি বায়দি আখবারিল বুর্তুকালীন (লিসবন সংস্করণ) পৃঃ ৩৫-৬/৩৮-৩ (তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশ)।

৫৪। মুরুজ (ইউরোপীয় সংস্করণ), প্রথম খণ্ড, ৩০৭-১২।

৫৫। রীনদ, Relations des voyages du marchand Soleyman, পৃঃ ১৩-৪।

৫৬। মুরুজ (ইউরোপীয় সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ড, ১০-১২।

৫৭। আস-সরখসী, মাবসূত, দশম খণ্ড, ৯৮।

৫৮। ঐ

৫৯। ঐ

৬০। ঐ পৃঃ ৯৭-৮।

৬১। আস-সায়বানী, আল-আসলু।

৬২। তুলনীয়, ১৪৮-১৫০ অনুচ্ছেদ।

৬৩। ইবনে জুবায়ের, রিহলা, পৃঃ ৫২।

৬৪। তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৫৪৭, ১৫৫১।

৬৫। আস-সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, পরিচ্ছেদ ১৬০, ১৬৩, ১৭৩ এবং বিশেষভাবে চতুর্থ খণ্ড, ৫১ এবং ১৩৩। ঐ, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৮৯, হোদাইবার সন্ধির সময় আবু সুফিয়ানের মদীনা গমন সংক্রান্ত উল্লেখ প্রসঙ্গে।

৬৬। আল-কাসানী, বাদায়িউস্‌ সানায়ি, সপ্তম খণ্ড, ১০৯; সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৮।

৬৭। বুখারী, বুইয়ু', পরিচ্ছেদ, আশ্‌শিরা ওয়াল বাইয়্‌ মায়াল মুশরিকীনা; আতয়িমা, পরিচ্ছেদ, মাল আকালা হাততা শাবিয়া।

৬৮। মাস্‌উদী, তাম্বীহ্, পৃঃ ২৪৮, আবু ওবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল, ১৩৯৭; আল-কাসতালানী, আল-মায়াওয়াহিবুদ্‌ দীনিয়া, ১ম খণ্ড, ২২৩।

৬৯। সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৯।

৭০। ঐ, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৮৯; ঐ, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৯।

৭১। কাসনী পূর্বোল্লিখিত, ৭ম খণ্ড, ১১০।

৭২। সরখ্‌সী, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৮৮; কাসানী, ৭ম খণ্ড, ১০৯; ফতোয়াই আলমগিরীয়া, পৃঃ ২২২; সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৯।

৭৩। কাসানী, ৭ম খণ্ড, ১১০।

৭৪। সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ২২৬-৭।

৭৫। ঐ, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯৩।

৭৬। আবু ইউসুফ, খরাজ, পৃঃ ১১৭; তুলনীয়, রাজীউদ্দীন আস-সরখ্‌সী, আল-মুহীত, ৩৬১ (পাণ্ডুলিপি) হায়দ্রাবাদ ষ্টেট লাইব্রেরী।

৭৭। সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ২২৬;

৭৮। ঐ, ঐ, চতুর্থ খণ্ড, ১০৮।

৭৯। ঐ, ১৩৩।

৮০। ঐ, ১০৮।

৮১। ঐ ; ঐ, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৫৫, ৯৯।

৮২। ঐ, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ১০৮।

৮৩। ঐ, ১০৯ ; রাজীউদ্দীন আস্-সরখ্সী, পূর্বোল্লিখিত।

৮৪। সরখ্সী, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯৩।

৮৫। ঐ

৮৬। কাসানী, পূর্বোল্লিখিত, ৭ম খণ্ড, ১০৭।

৮৭। তৃতীয়-খণ্ডের, যুদ্ধ শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮৮। আস্-সায়বানী, আল-আস্লু, প্রথম খণ্ড, ১৫০, পরিচ্ছেদ, জাকাত। সরখ্সী, শরহুল সিয়ারুস কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৬৭, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬ দ্রষ্টব্য।

৮৯। ২৬১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯০। কারাবী মসজিদে আমি পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছি।

৯১। আস-সামী কর্তৃক উদ্ধৃত নয়। তুলনীয়, ইব্নুল আছির, কাবিল, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪১ ; ইব্নে হাম্বাল, মস্নদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৭, তৃতীয় খণ্ড, ৩৩ ; তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৮০১-২।

৯২। আস্-সামীর পুস্তক হতে নয়। শিবলীর 'সিরাতুন্নবী', দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৫-৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ) হতে উদ্ধৃত।

৯৩। সরখ্সী, মাব্সুত, ষষ্ঠদশ খণ্ড, ৭৩।

৯৪। ইব্নে সা'দ, ১।২, পৃঃ ৯৭।

৯৫। ঐ ; সরখ্সী, মাবসুত, ষষ্ঠদশ খণ্ড, ৭৩-৪ ; আবু ইউসুফ, খরাজ, পৃঃ ৬৫।

৯৬। সর্খসী, মাবসুত, ষষ্ঠদশ খণ্ড, ৭৪।

৯৭। ঐ, পৃঃ ১২২।

৯৮। আল্-কিন্দী, উলাতু মিস্র, পৃঃ ৩৭৪।

৯৯। আল-মাক্কারী, নাফাহুত্ তীব, প্রথম খণ্ড, ৫৫৭ (ইউরোপীয় সংস্করণ)।

১০০। ইব্‌নে সা'দ, ১।২, পৃঃ ২০, শিব্‌লী, আল-ফারূক, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৯।

১০১। কাসানী, পূর্বোল্লিত, ৭ম খণ্ড, ১০২।

১০২। দাবুসী, আল-ইস্‌রার।

১০৩। ঐ

১০৪। সরখ্‌সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ১১২।

১০৫। ঐ, আল-মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯৪।

১০৬। ঐ, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ১৩২।

১০৭। ঐ, পৃঃ ১৩৩-৪।

১০৮। তুলনীয়, Zelts chrift der Akademie fuer Deutsches Recht, মিউনিখ, (অক্টোবর ১৯২৬), পৃঃ ৯৪৪; Die Fremden-gerichtbarkeit in Aegypten, by Dr. Walter Simon।

১০৯। আল-কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ ৪৩, ৫০, ৩৬-৬৯।

১১০। মূল বচনের জন্য ইব্‌নে হিশাম দ্রষ্টব্য।

১১১। ইব্‌নে হিশাম পৃঃ ৩৯৩-৫; আবু দায়ূদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫২; বুখারী, ৬১ঃ২৬, ৯৭ঃ৫১; মাস্‌উদী, তান্‌বীহ, পৃঃ ২৪৭; আবু দায়ূদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬১; তাবারী, তফ্‌সীর, পঞ্চম খণ্ড, ১২৭; মুসলিম, ২৮ঃ১৫; বুখারী, ৪৪ঃ১; Wensinck, মিফ্‌তাহু কুনুজীস্‌ সুন্নাহ দ্রষ্টব্য।

১১২। আল কুরআন, সূরা মায়িদা; ৪২-৪৩, ৬৮।

১১৩। Karalevski, in: Dictionnaire Histoire et Geographic Ecclesiastiques,

১১৪। Assemani, Bible, Orient, III, ২, p. xcvi; De Goeje, Memerire Surla conquete de la Syrie (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১০৬।

১১৫। ইব্‌নে ফদ্‌লুল্লাহ আল-উমারী আত্‌-তারিফ বিল মুস্‌তালাহিশ্‌ শরীফ ও আল-কাল্‌কাসান্দি, সুবহুল আ'শা দ্রষ্টব্য।

১১৬। পূর্ণ বিবরণীর জন্য ইব্‌নে হিশাম, পৃঃ ৭৪৭-৮ দ্রষ্টব্য।

১১৭। আল্‌-মাক্‌রিজী, সিতাত দ্রষ্টব্য।

১১৮। সুব্‌হুল আ'শা, চতুর্থ খণ্ড, ৮।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মর্যাদার সমতা

(২৭৬) রাষ্ট্রের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মুসলিম আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা স্বীকার করে। এই তত্ত্বমূলক মর্যাদার সমতা ছাড়া যেমন নাগরিক বিশেষের মধ্যে তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও বাস্তব সমতার অভাব রয়েছে। বিভিন্ন রাজাদেরকে সম্বোধনের বেলায় পদবী ব্যবহারে এবং এদের প্রতি আতিথেয়তায় মিত ও অমিতব্যয়িতা এবং এদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগের ব্যাপারে এবং এ ছাড়াও অন্যান্য বহু ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা যায় না।

(২৭৭) নবীর আমলে বিদেশী শাসকদেরকে সম্বোধন করার রীতি সম্পর্কে নবীর পত্রের সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।[১] ইবনে ফদ্‌লুল্লাহ্ আল-উমারীর গ্রন্থ 'আত্‌-তারিখ বিল মুস্‌তালাহিশ্‌ শরীফ' ও আল-কাল্‌কাসান্দির 'সুর্‌হুল আ'শা' পাঠে পরবর্তী কালের রীতি সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। একইরূপে সম্রাট সপ্তম কন্‌স্টেনটাইনকৃত গ্রীক গ্রন্থ Book of Ceremonies হতে আমরা সমসাময়িক মুসলিম শাসকদের প্রতি বাইজেন্টাইন সম্রাটগণের আচরণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।

(২৭৮) সাধারণ শিষ্টাচার সম্পর্কে নবীর একটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: ছোটরা বয়োজ্যেষ্ঠকে, প্রস্থানরত ব্যক্তি বিশ্রামার্থ এবং উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং ছোট বড় দলকে সালাম করবে।[২] প্রথম কে সালাম করবে এর বিধান এর থেকে পাওয়া যায়। উপকুল অতিক্রম করার সময় উপকুলের সাথে জাহাজের সম্পর্ক সম্বন্ধেও সমাধান এই সূত্রের দ্বিতীয় অংশ থেকে পাওয়া যায়।

———

টীকা:

১। লেখকের Corpusdes Traites, প্যারিস, ১৯৫৫

২। বুখারী, ৭৯ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কূটনীতি

(২৭৯) বিদেশী রাজদরবারে সাময়িকভাবে দূত প্রেরণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রে গুপ্তচর নিয়োগের দৃষ্টান্ত স্মরণাতীতকাল থেকেই মানব ইতিহাসে আছে। সুতরাং, আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি এই উভয় প্রকারের ব্যক্তির খোঁজ মুসলিম ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে নবীর আমলে পাওয়া যায়। সামরিক উদ্দেশ্যে প্রেরিত গুপ্তচর ছাড়াও, মক্কায়[১] আল-আব্বাস, আওতাসে[২] (তাইফের সন্নিকট) আনাস ইব্নে আবি মারছাদ্ আল-গানাবী এবং নায্দে[৩] আল-মুনজির ইব্নে আমর আস্-সাইদী ওরফে 'আ'নাক-লিয়ামুত' নবীর গুপ্তচর হিসেবে নিয়োজিত এবং তারা এই সমস্ত দেশের অবস্থা সম্পর্কে নবীকে ওয়াকিফহাল রাখতেন বলে উল্লেখ আছে। আমর ইব্নে ওমাইয়া আদ্ দামরী নামক একজন অমুসলিম খুব সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কোরাইশরা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিম বাস্তুহারাদেরকে তাদের হস্তে অর্পণ করার জন্য নিগাসকে প্ররোচিত করছিল। তাদের এই দুরভিসন্ধি বানচাল করার উদ্দেশ্যে নবী দুই হিজরীতে আমর ইব্নে ওমাইয়া আদ্-দামরীকে আবি-সিনিয়ায় প্রেরণ করেন।[৪]

(২৮০) জীবনোপকরণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেলায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা যখন ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে পারস্পরিক নির্ভরতার পর্যায়ে পৌঁছে রাষ্ট্রসমূহ বাণিজ্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য তৎপর হন। কূটনীতি সম্পর্কে লেখা আরবী সাহিত্যে খুবই কম। ইবনুল ফার্রা নামে পরিচিত আবু আলী আল-হুসাইন ইব্নে মোহাম্মাদ বিরচিত 'রসুলুল্ মুলুকি ওয়ামান য়াস্লুহু লির্‌রিসালাতি ওয়াস্ সিফারাহ্'ই একমাত্র পুস্তক

যে সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। ১৯৪৭ সালে কায়রোতে এটি প্রকাশিত হয়। প্রশাসনিক ও আদালতের দৃষ্টিকোণ থেকেও বাণিজ্য সম্পর্কের প্রশ্নটি প্রাচীন লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(২৮১) বিদেশী রাষ্ট্রে নিয়োজিত বাণিজ্য-প্রতিনিধিদের সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করা এখনও আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। পরীক্ষামূলকভাবে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নির্ভীক ব্যবসায়িগণ তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্র বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে কোনরূপ কূটনৈতিক অথবা সরকারী সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বেই বিদেশী রাষ্ট্রে যেতে অভ্যস্ত। প্রাচীন কালে ভ্রমণকারী বণিকদল আজকালকার চেয়ে অধিককাল একদেশে অবস্থান করত। বিদেশী বণিকদের বিষয়াদি দেখাশুনা এবং তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় শাসকগণ 'হুনারমান', 'শাহেবন্দর'[৫] এবং 'মালিক-উত-তুজার' নামে অভিহিত কার্মচারীদের নিয়োগ করতেন। এরাই 'ক্রুসেডে'র সময় ইউরোপীয় 'কন্‌সালে' রূপান্তরিত হয়। এবং এইভাবে স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং দূত প্রেরণের বহু পূর্বে স্থায়ী বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগের প্রচলন হয়।

(২৮২) ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে নবী স্বয়ং উদ্যোগী ছিলেন। এমনকি এর জন্য সরকারী তহবিল থেকে খরচ হলেও। তাঁর রাজ্যস্থিত সকল প্রকারের আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক তিনি বিলোপ করেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সংগে তিনি যে সমস্ত চুক্তি করেছিলেন তাতেও উল্লেখ আছে যে, তারা এ সম্পর্কে তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল।[৬] বৈদেশিক বাণিজ্য অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী শুল্কের আওতাভুক্ত ছিল।[৭] ওমরের আমলে মানবিজের ব্যবসায়ীদের উপর শুল্ক ধার্য সংক্রান্ত চুক্তিটিই এ ধরনের প্রধান চুক্তি বলে বলা হয়।[৮] আরবী ভাষা হতে ধার করা ইউরোপীয় ভাষায় প্রচলিত 'টেরিফ' (tariff), 'দুয়ান' (douane) এ শব্দগুলির নিজস্ব ইতিহাস আছে। ইসলামী রাষ্ট্রে নাবালকের অথবা স্ত্রীলোকের অথবা দাসদের কাছে গচ্ছিত বাণিজ্যপণ্য সময় সময় বাণিজ্য শুল্ক হতে রেহাই পেত বলে আশ্-সায়বানীর লেখায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৯] পুনরায়, দু'শত ড্রাক্‌মার (drachma) কম মূল্যমানের

পণ্য দ্রাব্যাদি বাণিজ্য-শুল্কমুক্ত ছিল।[১০] হজরত ওমর এবং তাঁর গভর্ণর আবু মূসা আল্-আশ্‌য়ারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক মজার পত্রালাপের উল্লেখ আবু ইউসুফ করেছেন।

আল্-আশ্‌য়ারী লিখেন: আমাদের বণিকদের কেউ অমুসলিম রাষ্ট্রে গেলে তাদেরকে কর দিতে বাধ্য করা হয়। ওমর জবাব দেন: তাদের উপরও কর চাপাও তারা যেমন মুসলিম বণিকদের উপর কর চাপিয়েছে।[১১]

(২৮৩) অববিক্রয় (dumping) এবং প্রাচুর্য সত্ত্বেও কৃত্রিম মহার্ঘ[১২] সম্বন্ধে আবু ইউসুফ অবহিত থাকলেও তিনি অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দ্রব্য মূল্যে হস্তক্ষেপ না করার জন্য নবীর নির্দেশ তিনি উল্লেখ করেন।[১৩]

(২৮৪) পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং প্রতিনিধিত্ব প্রথম দিকে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে রক্ষা করা হত না। আমীর আলী তাঁর "A short History of the Saracens" গ্রন্থে বলেন:

যখন প্রদেশিক শাসনকর্তাগণ সাম্রাজ্যের জায়গীরদারে পরিণত হন এবং খলিফার প্রত্যক্ষ শাসনকর্তৃত্ব মোটামুটি রাজনৈতিক প্রভুত্বে পরিণত হয় তখন এই বিশ্বস্ত সংবাদবাহকগণ পোপের লেগেটের (Legates) ন্যায় খলিফার দূত বলে পরিগণিত হয় এবং তারা নিশাপুর, মাউ, মসুল ও দামিশ্‌ক প্রভৃতি রাজদরবারে খলিফার স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে থাকে। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ দিকে পোপের লেগেটদের মত এরা যে রাজাদের দরবারে প্রেরিত হত তাদের সামরিক অভিযানে তাদের সংগে যেত। আমরা তাদেরকে আল্‌প্‌ আর্সলান ও মালিক শাহের শিবিরেই দেখতে পাই না, বরং নূরুদ্দীন মাহমুদ ও সালাহ্‌উদ্দীনের শিবিরেও সদাকর্মব্যস্ত, কখনো অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে, আবার কখনো যেমন পরবর্তী আইয়ূবীদের সময় কলহরত রাজাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে এবং গৃহ-বিবাদ মীমাংসা করতে দেখতে পাই। (তুলনীয়: খলিফার বিশেষ দূত আবুল ফিদা আল-মালিকুল মুজাফফরের পুত্রদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেন)।

প্রত্যেক রাজা নিজের পক্ষ হতে খলীফার দরবারে 'শাহানা' নামক একজন প্রতিনিধি রাখতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের পক্ষে কূটনৈতিক চালবাজি লক্ষ্য রাখা এদের কাজ ছিল, কারণ পোপের আমলের রোমের মত বাগদাদেও সকল আইনসম্মত ক্ষমতার উৎসের উপর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি স্থাপন করার জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। শাহানাগণ রাজধানী ছাড়াও সচরাচর ওয়াসিয়াত, বসরা, তিকরিত প্রভৃতি স্থানে মোতায়েন হত।[১৪] পরিশিষ্টে একই লেখক বলেন:

আব্বাসী সুলতানগণ প্রতিবেশী রাজাদের সহিত গোপনীয় কাজ সম্পন্ন করার বেলায় সর্বদাই বিশেষ দূত নিয়োগ করতেন। তারা নিজামুল হাদ্রাতাইন বলে অভিহিত হত।[১৫]

(২৮৫) ৬৫৬ হিজরীতে মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের পর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে স্থায়ী দূতাবাসের শূন্যতা দেখা দেয়, সেকালে এমনকি ইউরোপেও স্থায়ী রাষ্ট্রদূত ছিল না।

দূতেদের অভ্যর্থনা

(২৮৬) নবীর আমলে যখনই কোন বিদেশী দূত বা প্রতিনিধি-দল আসত নবী তাদেরকে স্থানীয় শিষ্টাচার অনুযায়ী অভ্যর্থনা করার পূর্বে একজন কর্মচারী অতিথিদেরকে অনুষ্ঠান প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞাত করতেন।[১৬] মাঝে মাঝে দূতেরা এসব গ্রাহ্য করত না।[১৭] ওমরের আমলে বিদেশী রাজদরবারে মুসলিম দূতদের কিছু কিছু স্থানীয় আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি বিশেষ করে, ভূমিতে শায়িত হয়ে অভিবাদন করার নীতিকে অগ্রাহ্য করার এবং এ নিয়ে মনকষাকষির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।[১৮]

(২৮৭) মদীনায় থাকাকালে নবী বিদেশী দূতগণকে বড় মসজিদে অভ্যর্থনা করতেন। দূতাবাসের স্তম্ভগুলি আজও সেই স্থানটির পরিচয় বহন করছে। বিদেশী দূতগণকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময় নবী

ও তাঁর সঙ্গিগণ সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন বলে কথিত আছে।[১৯] ওমরের নিকট প্রেরিত বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রদূত যিনি খলিফাকে পরিষদ-বিহীন মাটিতে একাকী ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান[২০] এবং বাগদাদে[২১] আল-মুক্‌তাদিরের রাজদরবারে একই সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের মধ্যে প্রাথমিক যুগের সরলতা ও পরবর্তীকালের আড়ম্বরের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি ভাল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

(২৮৮) দূতগণ সাধারণতঃ তাদেরকে যে রাজদরবারে পাঠান হত সেই দেশের শাসকের জন্য তাদের নিজেদের রাজাদের তরফ থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসত।[২২] এ ধরনের জিনিষ সরকারী তহ্‌বিলে প্রেরিত হত। একদা খলিফা ওমরের স্ত্রী তাঁর উপহারের প্রতিদানে কনষ্টান্টিনেপোলের সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে এক উপঢৌকন পান; কিন্তু খলিফা তাও সরকারী তহ্‌বিলে জমা দেন এবং খলিফার স্ত্রীকে তাঁর মূল উপঢৌকনের মূল্য কেবল প্রদান করা হয়।[২৩] এমন ঘটনারও উল্লেখ আছে যে, নবী বিদেশী রাজাদের কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তা তাঁর সরকারী ক্ষমতাবলে ব্যবহার করেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ তাঁর কাছ থেকে কিছুই পাবে না এবং তাঁর যা কিছু ছিল সবই সরকারী তহ্‌বিলে যাবে—নবীর এই অনুশাসন ইহাই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত বলতে তাঁর কিছুই ছিল না।[২৪]

(২৮৯) দূতগণকে যে রাজাদের কাছে পাঠানো হত সে রাজাদের কাছ থেকে তারাও উপঢৌকন পেত। নবী তাঁর জীবদ্দশায় যেমন দূতগণকে স্বয়ং উপঢৌকন দিতেন তেমনি যেন তাঁর উত্তরসূরীর দূতগণের প্রতি ব্যবহার করে এই মর্মে তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় ওয়াছিয়াত করে গেছেন বলে উল্লেখ আছে।[২৫] ওমান থেকে আগত এক দূতকে নবী একদা পাঁচশত ড্রাকাম, এবং অন্য এক দূতকে সোনা ও রূপার কটিবন্ধ দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী কম বেশী দূতদের সবাইকে তিনি উপঢৌকন দিতেন।[২৬] এ সাধারণ-ভাবে স্বীকৃত যে, বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে মুসলিম দূত যদি কোন উপঢৌকন পায় তা সরকারী তহবিলে জমা হবে।[২৭]

(২৯০) দূতদিগকে সরকারী খরচায় আপ্যায়িত করা হয়। নবীর আমলে বিশেষ করে বিদেশী অতিথি সংকারের জন্য মদীনায় অনেকগুলি প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। এ প্রসঙ্গে ইব্‌নে সা'দ এর গ্রন্থে রামালাহ্‌ বিনতুল হারিছের বাড়ীটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।[২৮] অন্য একটি বাড়ী অতিথি ভবন নামে পরিচিত ছিল।[২৯] আবিসিনিয়ার দূতদেরকে[৩০] আপ্যায়নের জন্য নবী স্বয়ং যে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কেননা ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে তিনি যখন মক্কায় চরম বিপদের সম্মুখীন হন এই দেশকেই তিনি পরম বন্ধু-রাষ্ট্র হিসেবে পান। সাধারণভাবে বলতে গেলে, দূতদের নিজ নিজ রাজা ও তাদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা অনুসারে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হত।[৩১]

দূতগণের বিশেষ সুবিধাবলী

(২৯১) দূতগণ তাদের দলের অন্যান্য লোকসহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করে : তাদেরকে কখনো হত্যা[৩২] অথবা তাদের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার বা উৎপীড়ন করা যাবে না। এমনকি দূত অথবা তার দলের কেউ যদি, যে রাষ্ট্রে তারা প্রেরিত, সেই রাষ্ট্রের একজন অপরাধীও হয় তাকে দূত হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। 'তোমরা যদি দূত না হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে শিরশ্চেদ করার আদেশ দিতাম', প্রতারক মুসাইলিমার দূতদের প্রতি নবীর এই উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৩৩]

(২৯২) উপাসনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য দূতদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। নবী তাঁর নিজস্ব মস্‌জিদে নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদলকে তাদের ধর্মকর্ম করার অনুমতি দেন। কৌতূহল মিটাবার উদ্দেশ্যে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, এইসব খৃষ্টান পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করেন।[৩৪]

(২৯৩) কেবলমাত্র অসাধারণ ক্ষেত্রে দূতদেরকে আটক বা কারারুদ্ধ করা।[৩৫] সুতরাং মক্কার রাষ্ট্রদূতদেরকে নবী আটক করে রেখেছিলেন যতক্ষণ না মক্কায় আটককৃত মুসলিম রাষ্ট্রদূতকে হুদাইবায়, যেখানে নবী ছাউনি ফেলেছিলেন, নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৩৬]

(২৯৪) আবু দাউদ একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন (সুনান, জিহাদ পরিচ্ছেদ) যে একদা (স্পষ্টতঃ, বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পর ২ হিজরীতে) মক্কাবাসীরা নবীর সংগে আলাপ-আলোচনার জন্য আবু রফীকে তাদের দূত হিসেবে মদীনায় পাঠায়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। নবী বলেন: "আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না, দূতদেরকে আটকিয়েও রাখি না; সুতরাং তুমি ফিরে যাও; যদি তোমার মনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তবে তুমি ফিরে আসতে পার" তিনি তাই করেন। ইব্‌নে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী লক্ষ্যণীয় যে, আবু রফী তখন একজন দাস ছিলেন। বদরের যুদ্ধে আটককৃত কুরাইশ যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধারের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

(২৯৫) মুসলিম রাষ্ট্রে[৩৭] দূতদের সম্পত্তির উপর আমদানী শুল্ক আরোপ করা হয় না যদি অনুরূপ সুবিধা মুসলিম দূত সেই রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়।[৩৮] সুতরাং, আশ্‌-সায়বানীর[৩৯] মতে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ যদি মুসলিম দূতদেরকে বাণিজ্য শুল্ক এবং অন্যান্য কর থেকে মুক্তি দেয় অনুরূপ রাষ্ট্রের দূতগণও মুসলিম রাষ্ট্রে সেই রকমের সুবিধাদি ভোগ করবে। অন্যথায়, মুসলিম রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে বিদেশী আগন্তুকদের ন্যায় সাধারণ শুল্ক আদায় করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

(২৯৬) আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই কূটনীতির লক্ষ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ কি আইনগত অথবা রাজনৈতিক অথবা অন্য কিছু তা বিবেচ্য বিষয়। এখানে আমাদের আলোচনা কেবল এদের মীমাংসার বিভিন্ন পন্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(২৯৭) (ক) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছা হ'ল প্রথম এবং সহজতম পন্থা। স্থায়ী অথবা বিশেষ এবং অসাধরণ দূতদের মারফৎ এ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

(২৯৮) (খ) মীমাংসাকরণ, মধ্যস্থতা, এবং প্রভাব বিস্তার (good offices) এই সব বিভিন্ন পরিভাষা দ্বারা এমন একটি তৃতীয় পক্ষের কথা বুঝায় যা বিবদমান উভয় রাষ্ট্রের বন্ধু এবং যা পারস্পরিক সমঝোতার যোগসূত্র হিসেবে বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বন্ধুসুলভ পরামর্শ ও উপদেশ দান করে। ইব্‌নে হিশাম উল্লেখ করেন যে, ১লা হিজরীতে নবী মক্কা নগর-রাষ্ট্রের কাফেলার বিরুদ্ধে প্রথম অথবা প্রথম দু'টির একটি অভিযান হাম্‌জা নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। ইয়ান্‌বু সমুদ্র উপকূলে হাম্‌জা শত্রুর সম্মুখীন হন। শত্রুপক্ষের নেতৃত্ব করছিল আবু জাহ্‌ল্। যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু মাজ্‌দী ইবনে আম্‌র, যার সাথে মক্কা ও মুসলিম উভয় রাষ্ট্রের সদ্ভাব ছিল, হস্তক্ষেপ করায় তাদের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি হয় এবং উভয় দল নীরবে যার যার পথে প্রস্থান করে।[৪০] উবাই ইব্‌নে সালুলের ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মুসলিম নাগরিক হলেও ইহুদী কাইনুকা গোত্রের একজন পুরানো মিত্র হিসেবে নবীর নিকট তাদের পক্ষে ওকালতি করেন এবং নবীও তার অনুরোধ রক্ষা করেন।[৪১]

(২৯৯) (গ) তৃতীয় এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল সালিশী। সালিশী বললে বুঝায় বিবদমান দল কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক সালিশের রায়ের মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধের বিচার-নিষ্পত্তি। 'যে তাহাকে হাকাম (সালিশ) নিয়োগ করেছে'[৪২] এর অর্থ হল বিবদমান দুটি দলের মধ্যে রায় প্রদানের নির্দেশ এবং উক্ত রায় উভয় দলের মধ্যে কার্যকরী করার সম্মতি। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক তাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে এই শর্ত সাপেক্ষ ইহুদী বানু কুরাইজা গোত্রের লোকেরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে যে সালিশী হয় নবীর আমলে তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা। নবী এই সালিশীর রায় সম্পূর্ণরূপে পালন করেন।[৪৩] কিয়ৎ পরিমাণে জটিল অপর একটি মামলা নিয়ে উল্লেখ করা গেল। বাবুল আন্‌বার গোত্র পূর্ব আরবের তামিমীদের একটি শাখা। এরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করত এবং আলোচ্য ঘটনার সময়কাল

পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, এদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ার দরুন এরা পশুচারণের উদ্দেশ্যে খোজা গোত্রের এলাকায় আসে (খোজারা মুসলমান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাস করত)। নবী কর্তৃক প্রেরিত তহ্‌শীলদার সে এলাকায় কর আদায় করতে এসে আন্‌বারীদের কাছ থেকেও মুসলমান প্রজাদের সমপরিমাণ কর দাবী করেন। এরা এতে সশস্ত্র বাঁধা প্রদান করে, ফলে তহ্‌শীলদারকে মদীনায় পালিয়ে যেতে হয়। খোজাগণ তাদের ঝামেলা সৃষ্টিকারী অতিথিদেরকে রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে বলাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। তারাও তাদের কথামত কাজ করে। কিছু দিন পর নবী কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের কতককে বন্দী করে মদীনায় ফিরে যায় এবং আন্‌বারীদের বাকী সব লোক পালাতে সক্ষম হয়। বেশীদিন পরে নয়, আন্‌বারীদের এক প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে রাজী করা হয়। অতঃপর তারা তাদের যে সমস্ত জ্ঞাতি শাস্তিমূলক অভিযানের ফলে যুদ্ধবন্দী হয় তাদের সম্পর্কে বলে। ধর্মান্তরিত হবার পূর্বেকার কোন অপরাধের জন্য তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে নবী যদি অস্বীকার করতেন ন্যায়ত তাঁকে বলবার কিছুই ছিল না; কিন্তু তিনি তাদের প্রতি সদিচ্ছা প্রকাশ করেন ; এবং প্রতিনিধিদলের একজন সদস্যের উপর বিষয়টির ভার অর্পণ করে বলেন, তিনি এ ব্যাপারে যে রায় দেবেন তাই কার্যকারী করা হবে। উক্ত সালিশ এই রায় দেন যে, বন্দীদের অর্ধেককে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দেওয়া হোক এবং বাকী অর্ধেককে যুদ্ধবন্দী-রেওয়াজ অনুযায়ী মুক্তিপণে মুক্তি দেওয়া হোক। (তুলনীয়, ইমতা, মাকরিজী, প্রথম খণ্ড, ৪০৪-৯)। আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার বিখ্যাত সালিশ-নিষ্পত্তির বিষয়টি অপর এক প্রাচীন দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে আরোপিত শর্তাবলীসহ মূল দলিলটি হুবহু আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।[৪৪] খলিফা ওসমানের হত্যার পর—তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবে তাই বিচার্য বিষয় ছিল। আলী মদীনাবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা মোয়াবিয়া এর বৈধতা অস্বীকার করে নিজেই

খলিফার পদপ্রার্থী হন। সালিশদ্বয় একমত হন যে, আলী ও মোয়াযিয়া উভয়কে পদচ্যুত করে মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নতুন খলিফা নির্বাচন করা উচিত। সে অনুযায়ী সালিশগণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের রায় জানাতে আসেন। প্রথমে আলীর মনোনীত সালিশ ঘোষণা করেন যে, তিনি আলী ও মোয়াবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করেন যাতে একজন নতুন খলিফা নির্বাচিত হতে পারে এবং মুসলিম সম্প্রদায় পুনরায় এক হতে পারে। তারপর মোয়াবিয়ার মনোনীত সালিশ দাঁড়িয়ে বলেন যে, অন্য পক্ষের সালিশের তার নিজ প্রার্থী ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা নেই; এবং তিনি মোয়াবিয়ার মনোনীত সালিশ হিসেবে তাঁকে পদচ্যুত করেন না বরং অন্য পক্ষে তাঁকে তার পদে বহাল করেন। সালিশদ্বয় ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারায় হজরত আলী এই রায়কে মেনে নিতে নিজকে বাধ্য মনে করেন নি এবং [৪৫] পুনরায় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেত যদি না আলী একজন নৈরাজ্যবাদী কর্তৃক নিহত হতেন।[৪৬] আবু ইউসুফের একটি বক্তব্য আলীর ব্যাপারেও সুন্দরভাবে প্রযোজ্য ঃ

দলসমূহ যদি দু'জন সালিশের ব্যাপারে একমত হন ... ... রায় যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে তা বাতিল হবে যদি না উভয় দল এদের যে কোন একটি রায়কে মেনে নেয়। যদি এক পক্ষ এক জনের রায় মেনে নেয় এবং অন্য পক্ষ না মানে তাহলে সালিশী বাতিল বলে গণ্য হবে। দুই দলের প্রত্যেকেই যদি সালিশদ্বয়ের একজনের রায় মেনে নিতে সম্মত হয় তাহলেও সালিশী বাতিল বলে গণ্য হবে।[৪৭]

(৩০০) আবু ইউসুফের মতে নিম্নোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিগণ সালিশ হিসেবে নিযুক্ত হবার যোগ্য নয় যেমন সম্মানীত মহিলাদেরকে অপবাদ দেওয়ার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত মুসলিম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, স্ত্রীলোক, দাস, অন্ধ, 'ফাসেক', সন্দেহ চরিত্র অথবা সর্বজন পরিচিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি, এমন কোন মুসলিম যে সালিশীর অন্যপক্ষের হস্তে বন্দী, বিপক্ষ দলের রাজ্যের মুসলিম ব্যবসায়ী, বিপক্ষ অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজা, নিজের দেশে থাকুক কিংবা মুসলিম শিবিরে থাকুক।[৪৮]

আমাদের এই লেখকের মতে একজন সালিশ অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী হবেন ঃ

"বিভিন্ন কার্যকলাপে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মীয় ব্যাপারে নিষ্ঠাবান, মুসলমানদের মধ্যে আস্থাভাজন বলে যার প্রাধান্য রয়েছে এবং আইনে যার গভীর জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তিকে এরূপ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং আদালতে যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না তাদেরকে এ ধরনের ব্যাপারে সালিশ মনোনীত করা যায় কি ভাবে?"[৪৯]

(৩০১) আবু ইউসুফ এমত পোষণ করেন যে, একজন অমুসলিম প্রজা সালিশের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয় কিন্তু অন্যান্য আইনবেত্তারা তার এই মত সমর্থন করেননি। আল-কাসানী[৫০] স্পষ্টভাবেই বলেন যে, একজন অমুসলিম প্রজাকে সালিশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তাঁর আলোচনার ধারা থেকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, তাঁর মতে এমনকি নিরপেক্ষ অমুসলিম সালিশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

(৩০২) আবু ইউসুফ বলেন,[৫১] এমন কোন রায় যা কার্যতঃ তদবস্থা (status quo) রক্ষা করে তা বাতিল এবং একথা বলার সামিল যে 'আমরা সালিশ হতে চাই না'। সুতরাং, মুসলমানদেরকে অমুসলিম প্রভুত্বাধীনে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রায়ও বাতিল বলে গণ্য হবে। এই বিষয়টির উপর তিনি এত গুরুত্ব দেন যে, তার মতে[৫২] সালিশীর অন্যপক্ষ যদি মুসলিম শিবিরে মুসলিম বন্দী, ইসলামে বিশ্বাসী দাস এবং অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজাদেরকে এনে থাকে তাদেরকে কিছুতেই অমুসলিম রাজ্যে ফিরে যেতে দেওয়া যায় না, কেননা 'শত্রুভাবাপন্ন এবং বিধর্মীদের রাজ্যে মুসলমানদের ফিরিয়ে দেবার কোন বিধান নেই।' হুদাইবার চুক্তিতে নবী মুসলমানদিগকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন এই কারণে অন্যান্য আইনবেত্তারা তার এই মত গ্রহণ করেন নি। সালিশদের মৃত্যু অথবা তাদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে যদি সালিশ ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে তদবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং আপোষ আলোচনার ফলে প্রতিপক্ষের মনে যে নিরাপত্তা বোধ জন্মাতে পারে তজ্জনিত অবহেলা ও অসতর্কতার কোন অন্যায় সুযোগ নেওয় চলবে না।[৫৩]

টীকা ঃ

১। ইব্‌নে আব্‌দ আল-বার, আল্‌-ইস্‌তিয়াব, নং ২০৩৪; কাত্তানী, আত-তারতীব আল-ইদারীয়া, প্রথম খণ্ড, ৩৬৩।

২। ইব্‌নে আব্‌দ আল-বার, নং ২০; কাত্তানী, প্রথম খণ্ড, ৩৬৩; ইব্‌নে হাজার, আল-ইসাবাহ্‌।

৩। মূসা ইব্‌নে ওকবাহ্‌, কিতাবুল মাগাজী।

৪। আদ্‌-দাম্‌রী যে তখনও অমুসলিম ছিলেন আশ-শামী তাঁর নবী চরিতে সে কথা উল্লেখ করেছেন। অমুসলিমরা যে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে সরখ্‌সীও সে কথা উল্লেখ করেছেন। শরহুল সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, ২৯১।

৫। মূরল্যাণ্ডের মতে (JRAS. ১৯২০, পৃঃ ৫১৭-৩৩) 'শাহেবন্দর' শব্দটির বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন তাৎপর্য ছিল, যেমন, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান, বাণিজ্য প্রতিনিধি (Consul), বন্দরে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (harbour master)। দূর প্রাচ্যের সুমাত্রা দ্বীপে কেবল প্রথম দুটির ব্যবহার ছিল। মসৌলিপটম (দক্ষিণ-পূর্ব ভারত) এবং মোচা (ইয়ামান) এলাকার মধ্যে 'হারবার মাষ্টারদের' দেখতে পাওয়া যায়। টেভালিয়ার সমুদ্র উপকূল হতে বহুদূরে গোলকুণ্ডায়ও একজন 'শাহেবন্দরের' উল্লেখ করেন।

৬। তুলনীয়, Corpus, নির্ঘণ্ট, "dimes, et exemptionde".

৭। আবু ইউসুফ, খরাজ, পৃঃ ৭৮, ১১৬।

৮। ঐ। পৃঃ ৭৮।

৯। আশ্‌-সায়বানী, আল-আস্‌লু, প্রথম খণ্ড, ফলিউ ১৫০ (পাণ্ডুলিপি, ওয়াফা, আতিফ, ইস্তাম্বুল)।

১০। আবু ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬-৭; সরখ্‌সী চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪, ২৮৫।

১১। আবু ইউসুফ, পৃঃ ৭৮।

১২। ঐ, পৃঃ ২৮।

১৩। ঐ

১৪। আমীর আলী, A Short History of the Saracens (১৯২১ সংস্করণ) পৃঃ ৪০৭-৮।

১৫। ঐ

১৬। ইব্‌নে হিশাম, পৃঃ ৯১৬; তাবারী, ইতিহাস, প্রথম খণ্ড. ১৬৯০।

১৭। ঐ

১৮। তুলনীয়, ইব্‌নে আল-আছীর, কামীল, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৯; ব্রুমহল, Islam in China, পৃঃ ১৭।

১৯। ইবনে সা'দ, ১/১, পৃঃ ১৫৩ ; মাফ্‌রিজী, ইম্‌তায়া ১ম খণ্ড, ৫০৯।

২০। কিতাবুন ফিল জিহাদ ওয়াল মাগাজী।

২১। আল্ খাতিব আল্-বাগদাদী, তারিখু বাগদাদ, প্রথম খণ্ড, ১০০-৫; আল্-কাদির আর-রশীদ, আজ্-জাখাইর ওয়াত্‌তুহাফ, পৃঃ ১৩০-৯; মিসকাডী, তাজারিবুল ওমাম, পঞ্চম খণ্ড, ৫৩।

২২। শেরুয়েহ ইব্‌নে শাহ্‌রিয়ার আদ্-দাইলামী, রিয়াদুল ইন্‌মে লিউ কালায়িল ইন্‌মে (পাণ্ডুলিপি. ৪৮. ইতিহাস, কায়রো) ফলিউ ৩৯ বি; তিরমিজী, কাবুলুল হাদায়া আল-মশরিকীন; তাবারী. পূর্বোল্লিখিত, প্রথম খণ্ড, ২১৬৩ ; ইব্‌নে হিশাম, পৃঃ ৯৫৮; লেখকের আল-ওয়াসায়িফুল সিয়াসিয়াত নং ২৪, ২৮ বি, ৫০; ইবনে সা'দ, ১/১, পৃঃ ১৫১-২।

২৩। তাবারী, প্রথম খণ্ড, ২৮২২-৩; ইব্‌নুল আছীর, পূর্বোক্ত ৩য় খণ্ড, ৭৪।

২৪। তাবারী, ১ম খণ্ড, ১৮২৬।

২৫। বুখারী, ৫৬ ঃ ১৭৬; কাত্তানী পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, ৪৫১।

২৬। ইব্‌নে সা'দ, ১।২, পৃঃ ৪০, ৪৩, ৬৬; তাবারী, ১ম, খণ্ড, ১৫৭৪; কাত্তানী, প্রথম খণ্ড, ৩৯০।

২৭। সরখ্‌সী, পূর্বোল্লিত, পরিচ্ছেদ ১২৫, বিশেষ করে—চতুর্থ খণ্ড, ৭২; ফতোয়ায়ে আলমগিরীয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫-৬৯ আল-মারগিনানীর মতে (আজ্-জাহিরাতুল বুরহানীয়া, পাণ্ডুলিপি,

ইয়ানিষামী, ইস্তাম্বুল, পরিচ্ছেদ (১৮) দূতদেরকে সময় সময় উপঢৌকন হিসেবে তারা যা পেত নিজেদের কাছে রাখতে দেওয়া হত।

২৮। ইবনে সা'দ পরিচ্ছেদ, ওয়াফুদ, কাত্তানী, পূর্বোল্লিখিত, প্রথম খণ্ড, ৪৪৫।

২৯। কাত্তানী, প্রথম খণ্ড ৪৪৫।

৩০। আবদ্ আল্-বাকী, আত্-তারাজুল মানকুশ, পৃঃ ৪৫-৬।

৩১। হাসান ইবনে আবদাল্লাহ, আছারুল আউয়াল ফি তারতিবী দিওয়াল (৭০৮ হিঃ সম্বলিত), কুল্লু রাসুলিন আলা মিক্দারিহি ওয়া মিক্দারি-মুরসালিহি।

৩২। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৬৫, ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, ৩৯০-১, ৩৯৬, ৪০৪, ৪০৬ ; আবু দাউদ, ১৫।১৬৫ ; আদ্দারিমী, ১৭।৫৯ ; সরখ্সী, মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯২ শরহুল সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, ১৯৯ ; চতুর্থ খণ্ড, ১৩, ৬৬।

৩৩। ঐ, সরখ্সী, মাবসুত, দশম খণ্ড, ৯২।

৩৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪০২ ; ইবনে সা'দ, ১।২, পৃঃ ৮৫।

৩৫। বিশদ আলোচনার জন্য তুলনীয় সরখ্সী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৩২০।

৩৬। হালাবী, ইন্সানুল উয়ূন, তৃতীয় খণ্ড, ২৬ ; কেরামত আলী, সিরাহ, পরিচ্ছেদ হুদাইবিয়া ; দাহ্লান, সিরাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬। কুরাইশগণ হজরত ওসমানকে আটক করেছিল, তাই নবীও কুরাইশদের দূত সোহাইলকে আটক করে রেখেছিলেন।

৩৭। আবু ইউসুফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১১৬।

৩৮। সরখসী, শরহুল সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ৬৭।

৩৯। ঐ।

৪০। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪১৯।

৪১। ঐ, পৃঃ ৬৮৮, তাবারী, পূর্বোল্লিখিত, ১৪৯১।

৪২। তাজুল ওরুস দ্রষ্টব্য।

৪৩। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৮৮-৯ ; আবু ইউসুফ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১২৪।

৪৪। মূল বচনের জন্যে দ্রষ্টব্য তাবারী, ১ম খণ্ড, ৩৩৩৬—৮ : আদ্-দীনাওয়ারী, আল্-আস্‌বারুত্‌ তিওয়াল, পৃঃ ১৯৬-৯ : লেখকের আল্-ওয়াসায়িকু আস্‌-সিয়াসিয়াহ নং ৩৭২ ; আল-জাহিজ, তাসভিবু আলী ফিল হিক্‌মাইন, আল-মাশরিক, বায়রূত, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৫১-৭২ : শরহুনাহ্‌জিল বালাগাহ্‌, প্রথম খণ্ড, ১৯০-১।

৪৫। তুলনীয়, ৪০ হিঃ পূর্বেকার ঘটনাবলী সম্পর্কে যে কোন ইসলামের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৪৬। আবুল ফিদা, ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪। কথিত আছে যে, তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে চল্লিশ হাজার লোক আলীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা তাঁর পক্ষে আমরণ যুদ্ধ করবে এবং আলীও মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

৪৭। আবু ইউসুফ, পূর্বোল্লিত পৃঃ ১২৪।

৪৮। ঐ, পৃঃ ১২৫-৬।

৪৯। ঐ, পৃঃ ১২৫।

৫০। আস্‌-সানায়িউ; ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮।

৫১। আবু ইউসুফ পৃঃ ১২৪।

৫২। ঐ, পৃঃ ১২৬।

৫৩। ঐ, পৃঃ ১২৪।

———

তৃতীয় খণ্ড

শত্রুতামূলক সম্পর্ক

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক মন্তব্য

(৩০৩) বিদ্বিষ্ট লেখকেরা ইসলাম এবং যুদ্ধের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক আবিষ্কার করে থাকেন। যুদ্ধের বিভীষিকা দূর করা এবং যুদ্ধকে অধিকতর মানবতামুখী করে তোলার জন্য ইসলাম যে অবদান রেখেছে তার প্রতি লক্ষ্য করলে তা চিত্তাকর্ষক মনে হয়। কথিত আছে, ইসলামের নবী বলেছেন, "আমি দয়ার নবী, আমি যুদ্ধের নবী।"[১]

এবং আরও বলেছেন, "আমি যুগপৎ হাসি এবং যুদ্ধ করি।"[২] এই দুই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ সম্পর্কিত নীতি সমগ্র মুসলিম আইনের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে।

টীকা ঃ

১। সিয়াসাতুস শারিয়াহ্—ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ৮ দাহাবিয়া, আত্ তারিখুল কবীর, ১। তুলনীয় তাবারিয়া, ইতিহাস, ১, ১৭৪৮, মাওয়ার্দি।

২। ইবনে তাইমিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবিধ প্রকার শত্রুতামূলক সম্পর্ক

(৩০৪) যুদ্ধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী আলোচনার পূর্বে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক শত্রুতার ফলে সব সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয় না। প্রায়শঃ এতে যুদ্ধ ঘটে না; এবং যুদ্ধ ও রক্তপাত কিংবা কোনো রাষ্ট্রের সমগ্র সেনাবাহিনীর সমাবেশও ঘটে না। প্রথমে উক্ত সম্পর্কসমূহের কথার আলোচনা হওয়া দরকার।

১। প্রতিশোধ

(৩০৫) এর অর্থ lex talionis নীতি অনুসারে, অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণার্থে জবরদস্তি একটি উপায় প্রায়শঃ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইহা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন কোনো এক রাষ্ট্রের বা উহার প্রজাগণের সম্পত্তি অপর এক রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকারভুক্তি অথবা বিনাশ সাধন, দূতগণের বা রাষ্ট্র প্রতিনিধিবৃন্দের আটক, শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যভুক্ত কিছু এলাকার উপর সাময়িক দখল ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ হল এইরূপ ঃ

নিষিদ্ধ বিষয়গুলি সম্বন্ধে পারস্পরিক কার্যপ্রণালী একইরূপ। অর্থাৎ তোমাকে যে যেভাবে আক্রমণ করে তুমিও তাকে সেইভাবে আক্রমণ করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রাখো আল্লাহ্ তার সংগেই আছেন যে (তাঁকে) ভয় করে (২ ঃ ১৯৪)।

অসৎ কর্মের পরিণতি অসৎই হয়। কিন্তু যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট প্রাপ্য। মনে রাখা

দরকার, তিনি অন্যায়কারীদের ভালবাসেন না এবং যে অন্যায় সহ্য করেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে তার কোনোরূপ অন্যায় বা অপরাধ হবে না। অপরাধ তাদেরই হবে যারা মানুষকে নির্যাতন করে এবং দুনিয়ায় অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে অথবা ফিৎনা সৃষ্টি করে। এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (৪২ঃ ৪০-৪২, আরও দ্রষ্টব্য ১০ঃ ২৮, ৪০ঃ ৪০)।

(৩০৬) মুতার অভিযান[১] পরিচালিত হয়েছিল অনুরূপ উদ্দেশ্যে। ঐ একই কারণে হুদায়বিয়া সন্ধির[২] পর কোরেশদের প্রতিনিধিবৃন্দকে আটক করা হয়েছিল। পরবর্তী ইসলামের ইতিহাসেও ঐ রূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

২। শান্তিপূর্ণ পথরোধ

(৩০৭) এর অর্থ শত্রুপক্ষের এক বা একাধিক বন্দরের পথ রোধ করা এবং আমদানী বা রপ্তানী বন্ধ করা, কিন্তু সশস্ত্র হামলা বা অভিযান নয়। এই পথ রোধের উদ্দেশ্য অন্যায়ের প্রতিকার। ইহা পরবর্তী কালে ঘটেছে এবং ১৮৬৬-৬৮ সালের পূর্বে এমন কোনো নযীর পাওয়া যায় না; উক্ত তারিখে ক্রীটে বিদ্রোহ চলা কালে তুরস্ক ক্রীট আক্রমণ ক'রে বিদ্রোহ দমন করেছে। এ সম্পর্কে মুস্তাফা পাশার বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য।[৩]

৩। বিবিধ ঃ

(৩০৮) আধুনিককালে যুদ্ধ নয়, তবে অন্যান্য শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, কুটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ, চুক্তিসমূহের বাস্তবায়নে বিলম্বকরণ, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ কার্যাবলী।

(৩০৯) এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে দুই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ এবং ছোট-খাটো সংঘর্ষ যাকে বিধিসম্মত যুদ্ধের পর্যায়ে ফেলা যায় না; এইগুলোকেও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

টীকা ঃ

১। তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১০, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৯১; ইবনে সাদ, ২।১, পৃঃ ৯২; মসুদী, তাম্বিহ্ পৃঃ ২৬৫ (মুতা অভিযান বস্তুতঃ পরিচালিত হয়েছিল বনু গাস্সান গোত্রের দলপতির হস্তে জনৈক মুসলিম দূতের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে)।

২। হালাবী, ইনসান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬; দাহ্লান সিরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

৩। Holland, Studies in International Law, পৃঃ ১৩৫।

—————

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

(৩১০) যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো দার্শনিক কিংবা ঐতিহাসিক আলোচনায় আমি প্রবৃত্ত হ'তে চাই না। যা হোক, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানরাও যুদ্ধকে অনিবার্য বা অপরিহার্য বলে মনে করে, একে কখনো ঈপ্সিত বা প্রত্যাশিত বলে মনে করে না। কোরআনে বলা হয়েছে : "যদি তারা শান্তি বা সন্ধি করতে চায়, তুমিও তাই চাইবে এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে।"[১] এবং পুনরায় বলা হয়েছে : "ইতস্ততঃ করো না এবং তুমি যখন প্রবল থাকো তখন অন্যকে সন্ধি করতে আহ্বান করো। এবং আল্লাহ্ তোমার সহায় এবং তিনি তোমাকে তোমার সৎকর্মের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করবেন না অথবা তা দান করতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না।"[২] হযরতের (সঃ) এক হাদীসে বলা হয়েছে : "শত্রুর মোকাবেলা করতে ব্যগ্র হয়ো না, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করো। তথাপি যদি মোকাবেলা ঘটে যায়, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল হও ; এবং জেনে রাখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে বিদ্যমান।"[৩] অন্যত্র হযরত (সঃ) বলেছেন : "শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য অধীর হয়ো না, হয়তো তাদের দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করা হবে এবং বলো : 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আমাদের নিকট থেকে তাদেরকে দূরে রাখো।'"[৪]

(৩১১) পরবর্তী জনৈক মুসলিম লেখক কিছু প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন :

الحروب هى العوارض من حوادث الزمان كالامراض كما ان الامن والسلامة كالصحة للاجساد فيجب حفظ الصحة بالامور السياسية ودفع المرض بالامور الحربية والاشتغال بحفظ الصحة ـ

শরীরের ক্ষেত্রে যেমন স্বাস্থ্য এবং তার বিপরীত রোগ-ব্যাধি, তেমনই কোনো এক কালে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে যুদ্ধবিগ্রহ রোগ-ব্যাধির মতো বহু ঘটনাবলীর ভিতর দুর্ঘটনাস্বরূপ বলা যেতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক কার্যাবলী দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা রোগ-ব্যাধির নিরাময় আবশ্যক এবং স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে ব্যস্ত থাকা আবশ্যক।[৫]

যুদ্ধের সংজ্ঞা :

(৩১২) জনৈক প্রবীণ মুসলিম ফকিহ্ (আইনজ্ঞ) আল-কাসামী জেহাদ বা মুসলমানদের যুদ্ধের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন: আইনের পরিভাষায় জেহাদের অর্থ জীবন, ধন-সম্পদ, জিহ্বা ও অন্যান্য উপায়ে আল্লাহ্‌র পথে নিজের শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে যুদ্ধ করা।[৬] মুসলিম আইনবিশারদগণ পরবর্তীকালে একই কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও ভংগীতে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু কেউই বলেন নাই, যুদ্ধ কে করবে—জনগণ, না সরকার? ঘটনাক্রমে অন্যান্য আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জেহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির কোনো ব্যক্তিগত কর্তব্য নয় (فرض عين) এবং কোরআন মোতাবেক (ولا نفر ,فا, ৯ : ১২২), বরং ইহা একটি সাধারণ কর্তব্য ((فرض كفاية), যা বহু সংখ্যক ব্যক্তি সম্পাদন করলে অন্যান্য ব্যক্তিগণের উপর কর্তব্যে অবহেলার অপরাধ বর্তাবে না,—এইজন্য জেহাদ পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে সরকারের কর্তৃত্বাধীন। নবীর (সঃ) দৃষ্টান্ত থেকেও দেখা যায় যে, হয় তিনি স্বয়ং অভিযানসমূহ পরিচালনা করতেন, কিংবা ইহার দায়িত্ব দায়িত্বশীল শাসনকর্তাগণের উপর অথবা দলীয় সর্দারগণের উপর ন্যস্ত

করতেন (তুলনীয় ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৫৪)। আইনবিশারদগণের কথা বল্‌তে গেলে হারুন আল-রশীদের প্রধান কাযী আবু য়ুসুফের বক্তব্য হ'ল এইরূপঃ খলিফার অনুমতি ব্যতীত কোনো সেনাবাহিনী অভিযানে বাহির হবে না—لا تسرى سرية بغير اذن الا مام[৭] আল-মাওয়াদিও স্পষ্টভাবে বলেছেন—খলিফার (কেন্দ্রীয় সরকার) অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো যুদ্ধ করা চল্‌বে না।[৮] স্বাভাবিকভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এমনকি আস্‌-সারখ্‌সী আশ্‌-শায়বানীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অভিমত পোষণ করেছেন যে, যদি কোনো বৈদেশিক সেনাবাহিনী তাদের সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে, তবু তাতেও দুই রাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বলা চলবে না।[৯] এইরূপ ক্ষেত্রে এর প্রতিকার করতে হবে কুটনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং এমন কি, প্রয়োজনবোধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বারাও প্রতিকার কর্‌তে হবে।

(৩১৩) যেহেতু মুসলমানের সমস্ত কাজ কোরআনের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, সেইহেতু সে যে কাজই প্রভুর আদেশ পালনের জন্য করে থাকে তা'ই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাংসনীয় বলে গণ্য হয়; এমন কি তার পানাহার পর্যন্ত, যা সে আল্লাহ্‌র কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে করে থাকে অথবা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার মানসে যে যুদ্ধ করা হয়, তাও প্রশংসনীয় কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এই পটভূমি উপলব্ধি করা ব্যতীত এটা বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয় যে, রাজ্য বিস্তৃতির জন্য যে যুদ্ধ করা হয়ে থাকে তাও আল্লাহ্‌র পথে কর্তব্য বলে গণ্য হয়। কোরআনে এর উল্লেখ বার বার করা হয়েছে, বলা হয়েছেঃ

'শোনো, আল্লাহ্‌ ঈমানদারগণের জীবন ও ধনসম্পদ ক্রয় করেছেন জান্নাতের পরিবর্তে, কেননা তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে এবং প্রয়োজনবোধে প্রাণ নেবে ও প্রাণ দেবে। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ্‌ অবশ্যই পালন করবেন এবং আল্লাহ্‌ অপেক্ষা প্রতিশ্রুতি কে

অধিক পালন করতে পারে? অতঃপর তোমার (লাভজনক) ব্যবসায়ের জন্য তুমি আনন্দিত হও, কারণ এ-ই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় (৯ঃ ১১১)।

(৩১৪) এই রূপ বহু আয়াত ও নবীর (সঃ) হাদীস অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সামরিক কাজ বা জেহাদ অবশ্য কর্তব্য। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ও দাসগণ এই আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ ব্যতিক্রম; কিন্তু যদি জনশক্তির অভাব ঘটে তা'হলে এদের পক্ষেও সক্রিয়ভাবে সামরিক সাহায্য দান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১০] শান্তিকালে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোরআনের বিধান হল ঃ

"এবং তাদেরকে সশস্ত্র বাহিনী ও অশ্ব দ্বারা সজ্জিত করো, যাতে আল্লাহ্‌র ও তোমাদের শত্রুগণকে এবং অজ্ঞাত শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারো। আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা ব্যয় করো তার বিনিময় তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং যদি তারা সন্ধি করতে চায়, তুমিও তা করতে উদ্যত হও এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করো। জেনে রাখো, তিনিই শ্রবণকারী ও জ্ঞানী" (৮ ঃ ৬০-৬১)।

টীকা ঃ

১। কোরআন, সূরা ৮, আয়াত ৬১।

২। কোরআন, সূরা ৪৭, আয়াত ৩৫।

৩। বুখারী, ৫৬ ঃ ১১২, ১৫৬ ঃ ৯৪ ঃ ৮; মুসলিম (সহি), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩; আবু দাউদ, ১৫ ঃ ৮৯; দারিমী, ১৭ ঃ ৬; ইবনে হাম্বাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯০, ৫২৩; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩।

৪। ইবনে কুতায়বা আখবার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭ (অধ্যায়-কিতাবুল হারব)।

৫। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, اثار الاول فی ترتیب الدول (৭০৮ হিঃ), পৃঃ ১৬৭।

৬। بدائع الصنائع ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭।

৭। الخراج পৃঃ ১২৩।

৮। الاحكام السلطانية পৃঃ ৫৩।

৯। شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৬। তুলনীয় কাসানী, بدائع ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১০ ; ইবনে ফারিশ্‌তা مجمع البحرين (অধ্যায়—জেহাদ—গ্রন্থকারের নিজস্ব পাণ্ডুলিপি), ফত্‌ওয়া-ই-আলমগিরি, অধ্যায়—জেহাদ, পৃঃ ২২১—২২।

১০। ফাত্‌ওয়া-ই-তাতার (গ্রন্থকারের নিজস্ব পাণ্ডুলিপি) অধ্যায়—জেহাদ, ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

আইনানুমোদিত যুদ্ধসমূহ

(৩১৫) যে সব আইনানুমোদিত বা ন্যায়সংগত যুদ্ধসমূহ মুসলমান করতে পারে তা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হতে পারে ঃ

১। চলমান যুদ্ধের জের ঃ

(৩১৬) এর অর্থ এই যে, কোনো কারণবশতঃ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে থাকলে তা পুনর্বার শুরু করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঐ সকল যুদ্ধ যা বন্ধ হয়েছিল ; উভয় পক্ষের অবসন্ন হওয়ার দরুন অথবা বিনা সন্ধিতে যা বন্ধ ছিল,[১] নির্দিষ্ট কিয়ৎকালের জন্য[২] পারস্পরিক চুক্তির ফলে যে যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়েছিল এবং ঐরূপ যুদ্ধসমূহ। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ "যুদ্ধ রহিত থাকার মাসগুলি (চুক্তি অনুসারে) অতিবাহিত হয়ে গেলে যেখানে মুশরিকগণকে দেখতে পাও হত্যা করো এবং বন্দী করো এবং অবরোধ করো এবং তাদের জন্য গোপন স্থান তৈয়ার করো।"[৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সারাখ্শী বলেন ঃ

'এবং যখন নিরাপত্তার মাস (চুক্তিবদ্ধ যুদ্ধ রহিত থাকার কাল) শেষ হবে—তখন মুশরিকগণকে যেখানে পাও হত্যা করো' ; কোরআনের নির্দেশ অনুসারে তার অর্থ যখন চুক্তির মেয়াদ অপর পক্ষের সংগে শেষ হয়ে যাবে।[৪]

২। আত্মরক্ষামূলক ঃ

(৩১৭) এই যুদ্ধ হতে পারে যখন (ক) শত্রু মুসলিম সাম্রাজ্য হামলা করেছে অথবা (খ) কার্যতঃ হামলা করে নাই, তবে অসহনীয়

দুর্ব্যবহার করেছে। পূর্বের যুদ্ধটি সম্পর্কে কোনো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কোরআনের নির্দেশ এইরূপঃ "যারা তোমার সংগে যুদ্ধ করে তাদের সংগে আল্লাহ্‌র পথে থেকে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না। শুনে রাখো আল্লাহ্‌ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।"[৫] বিদেশী কোনো শক্তির দুর্ব্যবহার বা বাড়াবাড়ি সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত মুসলিম আইন সম্যক ব্যাখ্যা দান করেঃ

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাদেরকে নির্দেশ বা অনুমতি (যুদ্ধের) দেওয়া হচ্ছে এবং আল্লাহ্‌ বাস্তবিক পক্ষে তাদেরকে বিজয় দান করতে সমর্থ।[৬]

এই নির্দেশ, নবী (সঃ) ও অন্যান্য মুসলমান যাঁরা মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা তখনও নানাভাবে মক্কাবাসীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা (মক্কাবাসিগণ) মদিনার জনৈক প্রধান ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌ বিন উবায়্‌কে চূড়ান্ত পত্র দিয়েছিলো যেন তারা নবীর সংগে যুদ্ধ করে এবং তাঁকে হত্যা করে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করে, অন্যথায় তারা মদিনা আক্রমণ করবে।[৭] এমন অনেক ইতিহাস আছে যা থেকে আমরা অবগত হই যে, নবীর (সঃ) হিজরতের পরে প্রাথমিক কালে মদিনার মুসলমানদেরকে এমন কষ্টকর জীবন যাপন করতে হ'ত যে, তাঁরা পুরোপুরি সমরসজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় নিদ্রা যেতেন।[৮] অপর একটি দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, পঞ্চম হিজরীতে জুম্মাতুল জান্দালের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানকালে স্থানীয় দলপতি উকায়্‌দির উত্তরাঞ্চল থেকে মদিনাগামী কাফেলার উপর হামলা ও নির্যাতন চালাচ্ছিল।[৯] খায়বারের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানটি যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অভিযান হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে।[১০]

(৩১৮) আমরা কোরআনের আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি (সূরা ৯ : আয়াত ১২)ঃ "তুমি কি ঐ ব্যক্তিদের সংগে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিল এবং প্রথম তোমাদেরকে হামলা

করেছিল ?" এ ছাড়া আল্লাহ্‌র রসূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধান-যোগ্য হাদীসে বিবিধ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কথার উল্লেখ আছে এবং তিনি বলেছেন : 'যে কেউ তার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ করে এবং নিহত হয়, সে শহীদ বলে গণ্য হয় ; এবং যে আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় সেও শহীদ বলে গণ্য হয়।"—(তুলনীয় সুয়ূতী প্রণীত বর্ণমালা-ভিত্তিক হাদীসের শব্দকোষ—جمع الجوامع (vol. IV, S. N. "من আবদুর রায্‌যাক ও অন্যান্যদের নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত)।

৩। সহানুভূতিমূলক :

(৩১৯) এর অর্থ যদি বিদেশের কোনো মুসলমানদের তরফ থেকে তাদের (অমুসলিম) সরকারের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রার্থনা আসে, তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। এই বিষয় কোরআনে নির্দেশ আছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে :

(ক) এবং যারা ঈমান এনেছে কিন্তু গৃহ ত্যাগ করে নাই, তাদেরকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য নয় যতক্ষণ তারা গৃহ ত্যাগ না করে ; কিন্তু যদি ধর্মের প্রয়োজনে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থী হয়, তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য হয়ে পড়বে, তবে এর ব্যতিক্রম হবে যদি ঐ ব্যক্তিগণের (যাদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়া হয়েছে) সংগে তোমাদের কোনো সন্ধি বা চুক্তি থেকে থাকে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখে থাকেন (সূরা ৮, আয়াত ৭২)।

(খ) তোমরা কেমন করে যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং দুর্বল নর-নারী এবং শিশুদের রক্ষার জন্য, যারা ফরিয়াদ করছে এইরূপে : "ওগো আমাদের প্রভু ! ঐ নগর থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো যার অধিবাসীরা অত্যাচারী ! ওগো, আমাদের জন্য তোমার তরফ থেকে কিছু রক্ষাকারী বন্ধু পাঠাও ! ওগো, তোমার নিকট থেকে ত্রাণকর্তা পাঠাও ! যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে ; এবং যারা অবিশ্বাসী বেঈমান তারা শয়তানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে" (সূরা ৪ ; আয়াত ৭৫-৭৬)।

৪। প্রতিশোধমূলক

(৩২০) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য আইনসংগত যুদ্ধ করা যেতে পারে, যথা—মুনাফেকী,[১১] ধর্মবর্জন,[১২] যাকাত বা অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্যের অপরিহার্যতা অস্বীকার,[১৩] বিদ্রোহ,[১৪] অপর পক্ষের চুক্তিভঙ্গ,[১৫] খারেজী মতবাদী হ'লে, কারণ তারা বলে যে, তারা ব্যতীত অন্য সব মুসলমান মুনাফেক এবং তারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।[১৬]

৫। আদর্শভিত্তিক

(৩২১) প্রত্যেক জাতির নিজস্ব আদর্শ থাকে যার মধ্য থেকে সে সর্বদা প্রেরণা লাভ করে। যতো গভীরভাবে যে জাতি তার আদর্শকে উপলব্ধি করে ততো নিষ্ঠা ও আগ্রহের সংগে তা বাস্তবায়িত করবার প্রয়াস পায়। আমরা পূর্বে দেখেছি ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন ওয়াহ্‌দানিয়াত (তাওহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্ব) এবং দুনিয়ায় মানবজাতির খেলাফতের উপর বিশ্বাসের উপর নিহিত। এর অর্থ জাতি ও দেশ নির্বিশেষে সমস্ত ঈমানদার বা মোমিন সমান এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ বা আদেশ পৃথিবীতে একচ্ছত্রভাবে প্রভাবশালী হবে। এ এমনই একটি ধর্মীয় কর্তব্য যার লক্ষ্য হ'ল লা-দ্বীনী বা আল্লাহ্-বিরোধিতার (নাস্তিকতা) বিনাশ সাধন বা মূলোৎপাটন এবং শির্‌ক-এর উচ্ছেদ সাধন, যাকে ইসলামী সাহিত্যে আল্লাহ্‌র পথে (فى سبيل الله) বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং একেই আমরা যুদ্ধ করবার জন্য "আদর্শভিত্তিক" কারণ বলে অনুবাদ করেছি। এই প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াতসমূহের ভিতর থেকে কিছু উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

(ক) তিনিই সেই প্রভু যিনি তাঁর রসূলকে (হযরত মোহাম্মদ) হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দান করে পাঠিয়েছেন যাতে অন্যান্য ধর্মাবলীর উপরে একে তিনি প্রভাবশালী করতে সক্ষম হন। এতে মুশরিকগণ যতোই মনক্ষুণ্ন বা বিরূপ হোক না কেন (সূরা ৯ : আয়াত ৩৩ ; ৪৮ : ২৮, ৬১ : ৯)।

(খ) তোমরা (মুসলমান কওম) মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কওম হিসাবে উত্থিত হয়েছ। তোমরা সৎকাজে উৎসাহ প্রদান করো এবং

অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করো (সূরা ৩ ঃ আয়াত ১১০)।

(৩২২) নবীর (সঃ) বহু উদ্ধৃত এক হাদীসে এই একই নিঃস্বার্থ ঐশী ব্রতের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"তোমাদের ভিতর যে কেউ কোনো অন্যায় হতে দেখে সে যেন হস্ত দ্বারা তাকে বাধা দান করে ; যদি তা না পারে জিহ্বা দ্বারা যেন তা করে ; যদি তা না পারে তবে অন্তর দ্বারা তা করে (অর্থাৎ আন্তরিক সমর্থন যেন না করে), কিন্তু ইহা হল সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[১৭]

(৩২৩) ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির ব্যাপারে ইসলাম কিছু স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাই ইসলামী আইন ও ইসলামে বিশ্বাসের ভিতর বেশ পার্থক্য করা হয়েছে। কাউকেই বলপূর্বক ইসলামে বিশ্বাস করানো চলবে না বা দীক্ষিত করানো চল্‌বে না, একথা আমরা এখন দেখবো, তথাপি যে কোনোভাবে ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে। এই মৌলিক পার্থক্যের দরুনই অমুসলমানগণকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় অনুঃ (খ) ২১৫ তে দেখেছি।

(৩২৪) বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা কোরআনে পাই ঃ

(ক) ধর্মে জবরদস্তি নাই। সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করা হয়েছে (সূরা ২ ঃ আয়াত ২৫৬)।

(খ) তোমার ধর্ম তোমার জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য (সূরা ১০৯, আয়াত ৬)।

(গ) এবং আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা সাধনা করো, যার তিনি যোগ্য দাবীদার। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দেন নাই ; তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্ম তোমাদেরই ধর্ম। তিনি তোমাদেরকে প্রাচীনকালে মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন এবং এই ধর্মগ্রন্থ কোরআনেও তাই করেছেন, যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন এবং তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষী হ'তে পারো। সুতরাং সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে

ধরো। তিনি তোমার রক্ষাকারী বন্ধু এবং তিনি কতো মহৎ বন্ধু ও মহৎ সাহায্যকারী (সূরা ২২, আয়াত ৭৮)। এবং এইরূপ আরও অনেক আয়াত আছে ঃ

(৩২৫) ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সব গ্রন্থ যাতে মুসলিম আইন সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, উপরোক্ত পটভূমিকায় পাঠ করা উচিত। উক্ত গ্রন্থাবলীতে বলা হয়েছে,[১৮] যখন কোনো মুসলিম রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকে এবং প্রতিরোধ বা হামলা মোকাবেলা করার মতো শক্তি রাখে, তখন ইহার উচিত পার্শ্ববর্তী[১৯] অমুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে আমন্ত্রণ জানাবে আল্লাহ্‌র একত্ব ও হযরত মোহাম্মদের রেসালাত কবুল করতে, অর্থাৎ সংক্ষেপে ইসলাম কবুল করতে। যদি তারা এই কাজ করে তা হ'লে তারা নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে এবং অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। যদি আমন্ত্রণ উপেক্ষিত হয় আরব উপদ্বীপের অমুসলিম দলপতির পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া বা তরবারির মোকাবেলা করা ছাড়া গত্যন্তর থাক্‌বে না। যা হোক যদি তার রাজ্য আরবের বাইরের দেশ হয়, তা হলে তার পক্ষে বিকল্প ব্যবস্থা হবে জিযিয়া দেওয়া, যার ফলে মুসলিম রাজ্যের হামলা থেকে তার দেশ নিরাপদে থাকবে। যদি উভয় ব্যবস্থাই গৃহীত না হয় এবং সমস্ত শান্তিপূর্ণ পন্থা এবং যুক্তি অগ্রাহ্য হয়ে যায়, তখন মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র নামে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যতোক্ষণ জয়লাভ না হয় অথবা জিযিয়া আদায় না হয়, কিংবা অপর পক্ষ ইসলাম কবুল করেছে এই সুসংবাদ প্রাপ্তি না ঘটে। এটা খুবই জানা কথা যে, ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কারও প্রতি জোর জবরদস্তি করতে কোরআনে[২০] বার বার নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) সারা জীবন আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের স্বাধীনতা খুঁজেছেন। তিনি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েও কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি ; বরং অমুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী, বিশেষ করে পারসিকদেরকেও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

সেই সময় বাইজাণ্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের লেখা একটা চিঠিতে তাঁরই একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাইজাণ্টাইন এলাকায় একজন মুসলিম রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হয়েছিল। এটা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের মস্ত বড়ো খেলাপ। এ ব্যাপারে মহানবী (সঃ) সম্রাটকে মধুর ভাষায় একখানা চিঠি লিখেছিলেন।[২১] চিঠিতে তিনি সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত জানান। আরও বলেন যে, দাওয়াত মঞ্জুর না করলে জিযিয়া প্রদান, তাতে আপত্তি থাক্‌লে বাইজাণ্টাইনের জনগণ ইসলাম কবুল অথবা জিযিয়া প্রদান করলে তাতে হস্তক্ষেপ যেন না করেন। এমন কি শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতাও যখন উপেক্ষিত তখনই কেবল এই মানবীয় অধিকার অর্জনের খাতিরেই ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করা যায়।

(৩২৬) পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা দেখ্‌ব বিভিন্ন প্রকার শত্রুর সংগে যুদ্ধে কী নীতি ও আইন-কানুন বাস্তবিকপক্ষে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

টীকা ঃ

১। মক্কাবাসীগণের সংগে নবীর (সঃ) প্রায় সবগুলো যুদ্ধই ছিল এইরূপ।

২। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি দশ বৎসরের জন্য শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছিল।

৩। কোরআন, সূরা ৯, আয়াত ৫।

৪। شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮ ঃ

و المراد بقوله تعالى "فاذا انسلخ الا شهر الحرام" مضى مدة العهد الذى كان بعضهم -

৫। কোরআন, সূরা ২ঃ আয়াত ১৯০।

৬। কোরআন, সূরা ২২ঃ আয়াত ৩৯।

৭। নাসায়ী লিখিত সুনান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭, অধ্যায় খবর বনী-আন-নাযির।

৮। বুখারী, নাসায়ী, হাকিম, দারিমী ইত্যাদি শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত—سیرت النبی—২য় অংশ; ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮৫-৮৬।

৯। মসূদী, তামবিহ, পৃঃ ২৪৮।

১০। ইবনে সাদ ২/১, ৬৬, ৪৭, তাবারী ঃ ইতিহাস ১ম, খণ্ড ঃ পৃঃ ১৫৫৬, ১৫৭৫-৭৬, মাসুদী, ২৫০ ; সারাখসী, মাবসুত ঃ ১০ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৮৬ ঐ ঃ شرح السیر الکبیر ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ২০১।

১১। কোরআন, সূরা ৬৬ঃ আয়াত ৯।

১২। ভিন্ন অধ্যায়ে inpra দেখুন।

১৩। খলিফা আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। ইহার সমর্থনে অনেক হাদীসও আছে, যথা আল-বায়হাকী লিখিত সুনান আল-কুবরা, ৭ম খণ্ড অধ্যায় الضرب الثانی من قتال اهل الردة দেখুন। আরবীতে উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য—

امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدو ان لا اله الا الله و انی رسول الله و یقیمو الصلوة و یوتو الزکوة فاذا فعلو ذالک عصموا عنی دمائهم و اموالهم و حسابهم علی الله -

অর্থাৎ—আমাকে মানুষের সংগে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো প্রভু নাই এবং আমি তাঁর রসুল স্বীকার না করে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় না করে। যদি তারা এইগুলি স্বীকার করে তাহলে আমার হামলা হতে তাদের জান-মাল হিফাযত থাকবে এবং আল্লাহ্ তাদের বিচার করবেন।

১৪। কোরআন, সূরা ৪৯ঃ আয়াত ৯। তুলনীয় ভিন্ন অধ্যায়।

১৫। কোরআন, সূরা ৯ঃ আয়াত ১২, তুলনীয় inpra সারাখশীকৃত شرح السیر الکبیر চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

১৬। খলিফা আলী এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যার এক হাদীসের ব্যাখ্যার সমর্থনে সারাখীর মাবসুত (مبسوط) ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪ দ্রষ্টব্য।

১৭। মুসলিমের সহি হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০।

১৮। যুদ্ধ সংক্রান্ত মুসলিম সংকলন (মাবসুত, ১০ম খণ্ড); কাসানীকৃত বাদায়ী ৭ম খণ্ড; মাওয়ার্দি ও আবু ইয়ালাকৃত আহকাম আল সুলতানিয়া, শাফেয়ীকৃত উম্, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪।

১৯। কোরআন, ৯-১২৩।

২০। ঐ ৯ঃ২৫৬/১০ঃ৯৯ clx ঃ ১-৬ ইত্যাদি।

২১। লেখকের Corpus No. ১৫ অথবা তাঁর الوثائق No. 27 citing Abu Ubaid, তুলনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

শত্রু ব্যক্তি

(৩২৭) শত্রুদের ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা, ধর্মত্যাগীগণ, বিদ্রোহিগণ, দস্যুগণ, জলদস্যুগণ এবং সাধারণভাবে অমুসলিম যুদ্ধরত ব্যক্তিগণ। প্রথম তিন দল সাধারণত মুসলমান রাষ্ট্রের প্রজাগণের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষোক্ত দল বিদেশী।

(৩২৮) আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের বিষয়ে আলোচনা করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একেবারে শুরু থেকে ধর্মত্যাগিগণ, বিদ্রোহিগণ এবং দস্যু-তস্করর। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আসবে যখন তারা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করবে কিংবা কোনো ভূ-ভাগ অধিকার করে রাজত্ব করবে [১] নচেৎ তারা দেশীয় ফৌজদারী আইনের আওতায় আসবে এবং যে আচরণ তাদের সংগে করা হবে তার সংগে আমাদের বিষয়বস্তুর কোনো সম্পর্ক নাই।

টীকা ঃ

১। মাওয়াৰ্দি, আল-আহকাম-আস-সুলতানিয়া, পৃঃ ৯০, ৯২, ৯৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মত্যাগ

(৩২৯) ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনৈক ধর্মত্যাগীর শাস্তির মতোই একই নীতির ভিত্তিতে অনুমোদিত বলা যেতে পারে। মুসলিম রাষ্ট্রনীতি নৃতত্ত্বভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক না হয়ে ধর্মভিত্তিক হওয়ার দরুন ধর্মত্যাগীর শাস্তির পশ্চাতে যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। কারণ তা একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিদ্রোহ।

(৩৩০) মুসলিম আইন অনুসারে ধর্মত্যাগের অর্থ মুসলমান হয়ে ইসলামের বিরোধিতা করা। এটা ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের কথা ঘোষণা করে তখনই কেবল নয় বরং ইসলামের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অস্বীকার বা অবিশ্বাস করলেও তা ঘটে থাকে।[১]

(৩৩১) মহানবীর (সঃ) কথা[২] ও কাজ,[৩] খলিফা আবুবকরের সিদ্ধান্ত ও বাস্তব প্রয়োগ,[৪] সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সম্মিলিত মত) এবং পরবর্তীকালের মুসলিম ফকিহ্‌গণ (আইন বিশারদগণ) এবং এমন কি কোরআনের পরোক্ষ কিছু আয়াত[৫]—এই সব কিছুই ধর্মত্যাগীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দান করেছে। ধর্মত্যাগের বেলায় মুসলমান পিতামাতার সন্তান এবং দীক্ষিত মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না এবং অনুরূপভাবে ইহুদী কিংবা খৃষ্টধর্ম, নাস্তিকতা কিংবা পৌত্তলিকতা অথবা যে কোনো ধর্ম গ্রহণের বেলায়ও কোনো পার্থক্য নাই। মুসলমান ফকিহ্‌গণ দৃঢ়ভাবে অভিমত পোষণ করেছেন যে, কোনো ধর্মত্যাগীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ও দণ্ড দেওয়ার পূর্বে

তার সংগে বিষয়টির আলোচনা করা এবং ইসলামী মতবাদের যৌক্তিকতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে তার সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন করা সরকারী পর্যায়ে জরুরী। চূড়ান্তভাবে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তাকে সময় দেওয়া হয় চিন্তা-ভাবনার জন্য[৬] আর সেজন্য এমন কি কয়েক মাসও[৭] সময় দেওয়া হয়ে থাকে।

(৩৩২) মস্তিষ্কবিকৃত,[৮] হতচেতন, বিষণ্ণ ও হতবুদ্ধি,[৯] সাবালক,[১০] নেশাগ্রস্ত,[১১] বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত[১২] এবং ইসলামের উপর যার ঈমানের কথা অজ্ঞাত বা সুদৃঢ় হওয়ার কথা জানা যায় নাই,[১৩] এমন সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চরম শাস্তি দেওয়ার বিধান নাই। তেমনই ধর্মত্যাগী স্ত্রীলোক[১৪] এবং নপুংসকগণও[১৫] হানাফী মায্হাব অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না কিন্তু কারাগারে রাখা হবে এবং এমন কি দৈহিক শাস্তিও পেতে পারে। কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি যে নিঃসন্তান থেকে যাবে সেও অব্যাহতি পাবে।[১৬]

ধর্মত্যাগীর সংগে ব্যবহার ঃ

(৩৩৩) ধর্মত্যাগীকে ইসলাম ও তরবারির মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে ; তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে না (امان । শাস্তি বা নিরাপত্তা), তাকে যিম্মী বলেও বিবেচনা করা হবে না, অর্থাৎ যাকে বলে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম অধিবাসী, যাকে বাৎসরিক জিযিয়া দিতে হয়।[১৭]

(৩৩৪) আইনত সে মৃত। সুতরাং যদি সে পুনরায় ইসলাম কবুল না করে এবং কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তার বিষয়—আশয় তাকে মৃত জ্ঞান করে তার মুসলমান উত্তরাধিকারীদের[১৮] মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু তার প্রাপ্য ঋণও বাতিল গণ্য করা হবে যদি সে কোনো অমুসলিম দেশে চলে যায়। ইহাই মাওয়ার্দি বলেছেন,[১৯] কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তার ঋণ বাবত প্রাপ্য টাকা বিষয়-সম্পত্তির মতো তার উত্তরাধিকারিগণ কেন পাবে না ?

ধর্মত্যাগিগণের ও সাধারণ অমুসলিম (যিম্মী) ব্যক্তিগণের রাষ্ট্র বা এলাকার ভিতর পার্থক্য ঃ

(৩৩৫) মাওয়ার্দির মতে ধর্মত্যাগীদের এলাকার (دار الردة) ভিতর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুন সাধারণ যিম্মীদের (دار الكفر) এলাকা থেকে উহা পৃথক হয়ে যায়। যথা[২০]

১) সন্ধি বা চুক্তি সাধারণত ধর্মত্যাগীদের সংগে করা বিধেয় নয়; সাধারণ অমুসলিম বিদেশীদের বেলায় ঐরূপ কোনো নিষেধ নাই।

২) ধর্মত্যাগীকে যিম্মী হতে দেওয়া নিষিদ্ধ (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা); কিন্তু আদি অমুসলিমের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য নয়।

৩) ধর্মত্যাগীর নিকট ইসলাম পুনর্বার কবুল করা অথবা নিহত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাকে দাস হিসাবে কবুল করা এবং জীবিত রাখা যেতে পারে না।

৪) ধর্মত্যাগী ব্যক্তির নিকট থেকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে না; ইহা সাধারণের সম্পদ রূপে গণ্য হবে, অর্থাৎ বয়তুলমালে চলে যাবে। যুদ্ধে লিপ্ত সাধারণ অমুসলমান ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত নানাবিধ সম্পদের বিতরণ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। যা হোক ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে, যুদ্ধে নিহত মৃত ধর্মত্যাগীদের সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে, কিন্তু জীবিত থাকলে তার সম্পত্তি রক্ষিত হবে এবং তার নিকট প্রত্যর্পণ করা হবে যখন সে পুনর্বার ইসলাম কবুল করবে অথবা তার মৃত্যুতে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৫) ধর্মত্যাগী ব্যক্তিগণ বন্দী হলে এবং ইসলামের ভিতর ফিরে না এলে যথাসময়ে নিহত হবে—সাধারণ যুদ্ধবন্দীদের মতো তাদেরকে কোনো আশ্রয় দেওয়া হবে না।

(৩৩৬) পার্থক্যের কথা বলা হল, তথাপি ধর্মত্যাগী ও অমুসলিম যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যবহারের[২১] দিক থেকে কিছু সাদৃশ্যও আছে। যেমন কোনো ধর্মত্যাগী ইসলামে পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে মুসলমানের জীবন ও ধন-সম্পদ যুদ্ধকালে নষ্ট করে থাকলে

দায়ী বলে বিবেচিত হবে না। প্রথম খলিফার শাসনকালে ইহা বাস্তবিক পক্ষে স্থির হয়েছিল এবং অবশ্যই ইহা পরে রদ করা হয় নাই। অধিকন্তু যুদ্ধ ও পশ্চাদ্ধাবনের ব্যাপারে ধর্মত্যাগী ও অমুসলমান শত্রুগণকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে, তাদের দূতগণও একই অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। সুতরাং হযরতের (সঃ) জীবদ্দশায় ভণ্ড মুসায়লামার দূতগণ মদিনায় এসেছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারাও বলল যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে পাঠিয়েছিল তার মতো তারাও তাঁর (নবীর) সম্বন্ধে একই ধারণা পোষণ করত। ইহা শুনে মহানবী (সঃ) বললেনঃ যেহেতু দূতগণকে হত্যা করা যায় না, নতুবা আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন, আমি তোমাদের উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতাম।[২২] (তারা ধর্মত্যাগী মুসলমান ছিল)। ইহা ছাড়া ধর্মত্যাগী ব্যক্তি তার মুসলমান আত্মীয়ের সম্পত্তির কোনো অংশ পাবে না।

———

টীকা ঃ

১। মাওয়ার্দি, পৃঃ ৮৯ ; فتاوی عالمگیریۃ, অধ্যায় ردۃ

২। সারাখ্‌শী, মাব্‌সুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮।

৩। মাওয়ার্দি, পৃঃ ৯০, তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড. পৃঃ ১৬৩৯ এক-এক।

৪। কাসানী, বাদায়ি, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪।

৫। কোরআন, সুরা ৩৭ ঃ আয়াত ৫৭, সুরা ৫ ঃ আয়াত ৫৪।

৬। সারাখ্‌শী মাবসুত ঃ ১০ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৯৮-৯৯

৭। আবু ইউসুফ, খারাজ ঃ পৃঃ ১১০

৮। কাসানী ঃ ৭ম খণ্ড ঃ পৃঃ ১৩৪

৯। ঐ

১০। ঐ

১১। ঐ— ঃ সারাখ্‌সী মাবসুত ঃ ১০ম খণ্ড ঃ ১২৩

১২। সারাখ্‌সী মাবসুত ঃ ১০ম খণ্ড ঃ ১২৩

১৩। ইবন আবিদীন, রাদ্দুল মুখতার ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৩২৬-২৭

১৪। কাসানী ঃ ৭ম খণ্ড ঃ পৃঃ ১৩৪, আবু ইউসুফ ঃ ১১১, সারাখ্‌সী, শারহুল উসুল, অধ্যায় ঃ الخبر يلحقه التكذيب (পাণ্ডুলিপি নং ১৮৩৪, বায়েজিদ, ইস্তাম্বুল, আমি যাচাই করেছি) ঃ ঐ একই شرح الكبير, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬২

১৫। ইবন আবিদীন ঃ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২৬-২৭

১৬। ঐ একই গ্রন্থ ঃ পৃঃ ২৪৬

১৭। সারাখ্‌শী, মাবসুত, ১০ খণ্ড, পৃঃ ১১৬।

১৮। ইবন আবিদীন, রাদ্দুল মুহ্‌তার ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৮-২৯; সারাখ্‌শী, মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩।

১৯। আল-আহ্‌কামুস-সুলতানিয়া।

২০। মাওয়ার্দি, আল আহ্‌কামুস-সুলতানিয়া, পৃঃ ৯৪।

২১। সাধারণত তাদের সংগে ব্যবহারের কথা প্রসঙ্গে তাবারীর ইতিহাস, ১১ হিজরী ; ওয়াকিদির কিতাব আর-রিদ্দা, বাঁকীপুরের পাণ্ডুলিপি ; সারাখ্‌শীর মাবসুত, দশম খণ্ড, পৃঃ ৯৮-১২৪ দ্রষ্টব্য।

২২। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৬৫।

সপ্তম অধ্যায়

গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ

(৩৩৭) প্রাক-ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধ্যায়ে কেবল মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনেরই উল্লেখ থাকার কথা, অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জনগণ সংক্রান্ত আইন; কারণ এখানে সমপর্যায়ের সভ্য শক্র সম্পর্কে কি ব্যবহার ধার্য্য করা আছে তার বিবরণ আছে। কিন্তু মুসলিম আইন, ইসলামের ঐক্য সংহতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সে জন্য কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, ইসলামী আইনে এইরূপ যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো বিধান দৃষ্টিগোচর হয় না। সমগ্র কোরআন মজীদে আমি (গ্রন্থকার) এই বিষয় সম্বন্ধে মাত্র একটি আয়াত দেখেছি।

এবং যদি বিশ্বাসীদের (ঈমানদারগণ) দুই দল পারস্পরিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তাদের ভিতর সন্ধি স্থাপন করো এবং এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে; সেক্ষেত্রে অন্যায়কারি-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র বিধান না মানে; আর যদি প্রত্যাবর্তন করে (আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে) তবে তাদের ভিতর ইনসাফের সংগে সন্ধি করে দাও এবং সুবিচারের সংগে কাজ করো। শ্রবণ করো, আল্লাহ্‌ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন (সূরা ৪৯, আয়াত ৯)।

এবং এই একমাত্র নির্দেশের পরেই বলা হয়েছে ঃ

ঈমানদারগণ ভাই ভাই ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালন করো যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে করুণা লাভ করতে পারো (সূরা ৪৯, আয়াত ১০)।

(৩৩৮) মহানবীর (সঃ) হাদীসেও সাধারণভাবে কিছু কথা আছে যার সাহায্যে সমগ্র একটা বিধান খাড়া করা যায় না। পরে আমরা এইগুলি উল্লেখ করব। বিদ্রোহ সংক্রান্ত মুসলিম আইন যা মুসলিম আইন সংকলনের মধ্যে পাওয়া যায়, তা মোটামুটিভাবে খলিফা আলীর আচার-আচরণের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, যদিও ইহা অনস্বীকার্য যে, মহানবীর (সঃ) ধর্মপরায়ণ জামাতার ন্যায় আর কোনো পরবর্তী মুসলিম খলিফা আদর্শবাদের সুমহান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারেন নাই।

ক) বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা

(৩৩৯) প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি প্রতিরোধ বা বিরোধিতার প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে নিম্নলিখিতভাবে সবিনয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে 'বিরোধিতা' বিষয়টিকে ঃ

১) ধর্মীয় কারণে-খারিজী আন্দোলন,

২) রাজনৈতিক বা পার্থিব কারণে ঃ

(ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব,

(খ) বিদ্রোহ,

(গ) মুক্তিযুদ্ধ,

(ঘ) অভ্যুত্থান,

(ঙ) গৃহযুদ্ধ

১) ধর্মীয় কারণে প্রতিবাদ ঃ

(৩৪০) যতোদূর জানা যায়, মুসলিম ইতিহাসে মাত্র একটি ধর্মীয় ব্যাপারে গোলযোগ সৃষ্টিকারী বা প্রতিবাদকারী দল ছিল, যারা কিছুকালের জন্য সরকারী বাহিনীর প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। এরা ছিল খারিজী সম্প্রদায় যারা অরাজকতায় বিশ্বাসী ছিল এবং সমগ্র মুসলিম কওমকে ধর্মবিরোধিতা, এমন কি কুফর বা অবিশ্বাসের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। যদি তারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের বা প্রতিবাদের চেষ্টা না করে, তা হলে অন্যান্য বিধর্মীয় বা শিথিল ঈমানের অধিকারী সম্প্রদায়গুলির

মতো কমবেশী তাদেরকে সহ্য করা হবে।[১] যদি তারা নিষ্ক্রিয় না থাকে এবং সরকারকে উৎখাত করে অন্য সরকার স্থাপনের প্রয়াস পায়, তাহলে তাদের সংগে ঠিক রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের মতোই ব্যবহার করা হবে। রাজনৈতিক বিদ্রোহিগণের অপেক্ষা ধর্মীয় বিদ্রোহিগণের সংগে ভিন্নতর কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না।

২) রাজনৈতিক ও জাগতিক কারণে সরকারের বিরোধিতা

(৩৪১) (ক) যদি ইহা কোনো সরকারী কর্মচারীর কোনো কাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং কোনো বিপ্লবের উদ্দেশ্য এতে না থাকে, তাহলে একে আমরা বিক্ষোভ নামে অভিহিত করতে পারি। এদের শাস্তি দেশীয় আইন মোতাবেক হবে। আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তা পড়বে না।

(৩৪২) (খ) যদি অযথা বা অসংগত কোনো কারণে আইন-সম্মত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এই প্রচেষ্টাকে অভ্যুত্থান বলা যেতে পারে।[২]

(৩৪৩) (গ) পক্ষান্তরে যদি তা কোনো বেআইনী সরকারকে কিংবা কোনো সরকার যে তার অত্যাচারের দরুন বেআইনী হয়ে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটলে তাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলতে পারি, সরকার মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক না কেন।

(৩৪৪) (ঘ) যদি বিদ্রোহীরা এতোই শক্তিশালী হয় যে, তারা কিছু এলাকা দখল করে ফেলে এবং সরকারের পরোয়া না ক'রে তার উপর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে, সে ক্ষেত্রে আমরা তাকে বিদ্রোহ বল্‌ব। হযরতের (সঃ) ওফাতের পর কিছু গোত্রের তরফ থেকে সরকারী কর বা রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে বিদ্রোহ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং খলিফা আবু বকর বলপূর্বক তাদেরকে বশীভূত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই লোকগুলি ইসলাম বর্জন করে নাই, তারা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব দিতে নিজেদেরকে বাধ্য বলে মনে করে নাই।

(৩৪৫) (ঙ) যদি বিদ্রোহ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, পূর্বের সরকারের সমান শক্তি অর্জন করে ফেলে এবং শত্রুতা চলতে থাকে, তাহলে তা গৃহযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হবে। জনৈক বিদ্রোহী যদি শক্তি ও সাফল্য অর্জন করে অথবা রাষ্ট্রের কর্ণধার বা প্রধানের মৃত্যুতে কিংবা ক্ষমতাচ্যুতির পর দুইজন খাড়া হয়ে যায় এবং জনগণের আনুগত্য উভয়েব মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তথাপি উভয় ক্ষেত্রের ভিতর কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয় না। আলী ও মুআবিয়ার মধ্যে যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। নীতির দিক থেকে আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, কেননা তিনি আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, বরং তৃতীয় খলিফা উসমানের হত্যা বা শাহাদাতের কাল থেকে আলীর বিরোধিতা করে আসছিলেন।

(খ) বিদ্রোহীদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি

(৩৪৬) মাওয়ার্দির মতে মুসলিম আইন অনুসারে বিদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়[৩]—যুদ্ধকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।[৪] সাধারণতঃ ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কড়াকড়িভাবে ধর্তব্য নয়। কারণ সারাখ্‌শীর মতে ইহা স্পষ্ট যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন বিদ্রোহ পরিপূর্ণভাবে দমিত না হয়, বিদ্রোহী বন্দিগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যখন বিদ্রোহী স্বীয় উদ্দেশ্যে অটল থাকে এবং অনুশোচনা করে না, তখন উক্ত আইন প্রযোজ্য হবে।

(৩৪৭) বিদ্রোহিগণকে তাদের হঠকারিতার ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যেন নিজে দোষমুক্ত হওয়া চাই।[৬] মাওয়ার্দির মতে[৭] মুসলমানদের রক্তপাত হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিনা বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদে রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণ না করা উচিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অমুসলমান প্রতিপক্ষের মতোই বিদ্রোহীদেরকে বিবেচনা করা হয়। এমন কি যে কোনো ভাবে জনৈক অনুগত প্রজা যদি বিদ্রোহীদের শামিল হয়ে পড়ে এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়ে যায়, তবু তাদেরকে দায়ী করা যাবে না।

(৩৪৮) বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য হল তাদেরকে শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করতে না দেওয়া এবং তাদেরকে হত্যা ও বিনাশ করা নয়।[৮]

(৩৪৯) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে ও হত্যা করতে পারা যাবে যখন তাদের আশ্রয় নেওয়ার মতো ঘাঁটি থাকবে এবং তারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।[৯]

(৩৫০) ধর্মত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্রোহীকে দেওয়া যায়।[১০]

(৩৫১) বিদ্রোহী রাষ্ট্রের বিচারালয়ের রায় ন্যায্য ও আইনত গ্রাহ্য জ্ঞান করা হবে এবং তা অগ্রাহ্য করা হবে না - যদি সেই দেশ বশ্যতা স্বীকার করে, তবে যদি প্রমাণিত হয় যে কোনো রায় বা সিদ্ধান্ত মুসলিম আইনের বিরোধী হয়েছে এবং কোনো গোঁড়া বা ধর্মভীরু মুসলমানের উহা সমর্থন লাভ করে নাই, তাহলে পূর্বোক্ত মত গ্রহণযোগ্য হবে না।[১১]

(৩৫২) যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা বন্দী, ব্যবসায়ী বা যে কেউই হোক বিদ্রোহী এলাকায় কোনো অপরাধ বা পাপ করে মুসলিম রাষ্ট্রের আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা-মোকদ্দমা করা চলবে না, এমন কি যে এলাকায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সে এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের করায়ত্ত বা বশীভূত হলেও।[১২] কারণ অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ঐ এলাকা আইনসম্মত রাষ্ট্রীয় আদালতের শক্তি বা আওতাভুক্ত এলাকার বাইরে ছিল।

(৩৫৩) পরে 'আশ্রয়' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, এমন কি ক্রীতদাসও একজন যুদ্ধরত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারে এবং অমুসলমানকে বিদ্রোহী কর্তৃক আশ্রয় দান অথবা উভয়ের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের নিকট অবশ্য-গ্রাহ্য হবে এবং মুসলিম রাষ্ট্র তাদেরকে নির্যাতন করতে পারবে না।[১৩] তথাপি প্রাচীন ফকিহ্‌গণ (আইনবিদগণ) আশ্রয়দান ও মৈত্রীচুক্তি এবং মুসলিম রাষ্ট্র-বিরোধী চুক্তির মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তা সর্বশেষ অবগত আছেন। সুতরাং আস্‌-সারাখসী বলেন ঃ

যদি বিদ্রোহিগণ মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করত এবং তারা যুদ্ধ করত এবং অবশেষে মুসলিম রাষ্ট্র তাদেরকে পরাজিত করত, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে গণ্য করা হত (সাধারণ অমুসলিম যুদ্ধরত ব্যক্তিদের ন্যায়)। কারণ বিদ্রোহিগণ কর্তৃক সাহায্য প্রার্থনা আশ্রয়দানের মতো এক কথা নয়, যেহেতু আশ্রিতগণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে অন্যেরা রাষ্ট্রের অনুগত মুসলিম প্রজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করত না।[১৪]

(গ) বিদ্রোহীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারসমূহ :

(৩৫৪) মুসলিম আইন বিদ্রোহিগণকে পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধসংক্রান্ত অধিকারসমূহ দান করে থাকে। আমরা কিছু পূর্বে দেখেছি যে, তাদের আদালতের রায় পেশ করার পর সাধারণত নাকচ হয় না। অনুরূপভাবে যদি তারা রাজস্ব বা অন্যান্য কর আদায় করে, লোকেরা তাদের বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সেই দেশের পুনর্বিজয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্র পুনর্বার সেই রাজস্ব আদায় করবে না।[১৫] সুতরাং অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যবসায়ী বিদ্রোহী এলাকায় প্রবেশ করে এবং বাণিজ্য শুল্ক প্রদান করে, তাকে পুনরায় অনুগত বা বাধ্য মুসলিম এলাকার সীমান্তে একই শুল্ক দিতে হবে,[১৬] যেন বিদ্রোহী এলাকা বিদেশী রাষ্ট্রভুক্ত। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে একথা পূর্বে বলা হয়েছে এবং তার ফলাফলও বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু বিদ্রোহী অঞ্চলে অন্যায় করার জন্য অন্যায়কারীকে অনুগত বা আইনসঙ্গত মুসলিম রাষ্ট্রের আদালতে বিচার করা যাবে না।[১৭]

(৩৫৫) সংঘর্ষকালে পারস্পরিক জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না এবং এমন কি অপরাধিগণকে শনাক্ত করা হলেও কোনো প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না।[১৮] এই

নিষ্কৃতি বা রেহাই তারা পায় এই কারণে যে, তারা বাস্তব একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিল ; অন্যথায় যদি একদল দস্যু কোনো শহর হামলা করে লুণ্ঠন করে, তবে তাদের অপরাধ বিনা বিচারে ক্ষমা করা হয় না, অর্থাৎ বিচারে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে।[১৯] যদিও কোনো কোনো আইনবিদের বিরুদ্ধ মতবাদের কথা আবু য়ুসুফ উল্লেখ করেছেন, তথাপি তিনি নিশ্চিত যে কেবল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যা বিদ্রোহীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাকেই গনিমত হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং বিদ্রোহিগণের আত্মীয়-স্বজনের নিকট তা ফেরত দেওয়া চলবে না।[২০] খলিফা আলীর অভ্যাস অনুযায়ী অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তাদের আইনসম্মত মালিক বা উত্তরাধিকারিগিণের নিকট ফেরত দেওয়া বিধেয়।[২১]

(৩৫৬) যাহোক, বশীভূত বিদ্রোহিগণকে মুসলিম আইন অনুগত মুসলিম প্রজাগণের নিকট থেকে অর্জিত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ প্রত্যর্পণ করবার বিধান দান করেছে।[২২]

(ঘ) বিদ্রোহীদের বিশেষ সুবিধাসমূহ ঃ

(৩৫৭) অমুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় বিদ্রোহীদের নিকট থেকে কোনো কর আদায় করা যাবে না, যদি কোনো কারণে মুসলিম রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে সন্ধি বা আপোস করতে চায় এবং যদি কোনো কিছু লওয়া হয়, ইহা জানতে হবে যে, তা বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিল, যা তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হলে মুসলিম রাষ্ট্র বিধিমতো উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারবে ; কিন্তু বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলে মুসলিম রাষ্ট্র তার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং দ্রুত বা বিলম্বে আইনসম্মত মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করবে।[২৩]

(৩৫৮) আত্মরক্ষা ব্যতীত অনাবশ্যকভাবে মারাত্মক অস্ত্রসমূহ বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করাই উচিত।[২৪]

(৩৫৯) বিদ্রোহী বাহিনী সম্বন্ধে আলী বলেছেন বলে শোনা যায় ঃ

و اذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح و لا تقتلوا على اسير و لا تتبعوا موليا و لا تطلبوا مدبرا و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل و لا تهتكوا سترا و لا تقربوا من اموالهم الا ما تجدونه فى عسكرهم من سلاح او كراع عبد او امة - و ما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله -

অর্থাৎ, যখন তোমরা তাদেরকে পরাজিত করবে, তাদের মধ্যে আহতদের হত্যা করো না, বন্দীদের শিরশ্ছেদ করবে না, যারা দলত্যাগ করে ও ফিরে আসে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করো না, তাদের স্ত্রীলোকদের দাসীতে পরিণত করো না, তাদের মৃতগণের অঙ্গচ্ছেদ করো না, যা আবৃত রাখা দরকার তা অনাবৃত করো না। শিবিরে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, প্রাণী, দাস-দাসী ব্যতীত তাদের অন্যান্য সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করো নাঃ অন্যান্য সব কিছু আল্লার বিধান অনুসারে তাদের উত্তরাধিকারিগণ লাভ করবে।[২৫]

খলিফা আলীর জনৈক সেনাপতি এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ

لعبد الله على امير المؤمنين من معقل بن قيس - سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد فاذا لقينا المارقين و قد استظهروا علينا بالمشركين فقتلنا هم قتل عاد و ارم مع انا لم تعد فيهم سيرتك و لم نقتل من المارقين مدبرا و لا اسيرا و لم نزقف منهم على حريح و قد نصرك الله و المسلمين و الحمد لله رب العالمين -

অর্থাৎ—আল্লার বান্দা আলী আমিরুল-মোমেনীনদের নিকটে মা'কিল বিন কায়েস থেকে সালাম ও আল্লাহ্ পাকের সানা ও সিফাত বাদ। মুশরেকগণ যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য চেয়েছিল তাদের মোকাবেলা আমরা করলাম। আমালেকীদের মতো তাদেরকে হত্যা করলাম।[২৬] তথাপি আপনার আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করি নাইঃ আমরা পশ্চাদাপসরণকারী বিদ্রোহিগণকে কিংবা বন্দিগণকে হত্যা করি নাই, অথবা আহতগণকেও হত্যা করি নাই। আল্লাহ আপনাকে ও মুসলমানকে বিজয় দান করেছেন। সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রভু আল্লার প্রশংসা করি।[২৭]

(৩৬০) তাদের মধ্যে মৃতদের সমাহিত করা উচিত।[২৮] তাদের বন্দীদের সাধারণতঃ শিরশ্ছেদ করা উচিত নয় এবং তারা ভবিষ্যতে অনুগত ও আইনমান্যকারী প্রজাগণের মতো ব্যবহার করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ আযাদও করা যেতে পারে।[২৯] সেই বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণও চাওয়া চলবে না।[৩০] বিদ্রোহী বন্দিগণকে, মুসলিম বা অমুসলিম, কখনও দাসে পরিণত করা চলবে না।[৩১] আলীর সেনাবাহিনী তাদের নিকট ধৃত বন্দিগণকে দাসে পরিণত করার দাবী জানাল এবং আলী দৃঢ়ভাবে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন[৩২]ঃ বেশ, তাহলে নবীর (সঃ) স্ত্রী এবং মুসলমানদের জননীকে কে নেবে?"— তিনি আলীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তৎকালে প্রহরাধীন ছিলেন।

(৩৬১) তাদের শিবিরের ভৃত্যগণ ও অনুসারিগণকে যুদ্ধে হত্যা করা যেতে পারে যদি তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

(৩৬২) যেমন ধর্মের দিক থেকে অমুসলমানের হাতে মুসলমানের মৃত্যু নিষিদ্ধ, তেমনই মুসলিম বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে অমুসলিমদের তালিকাভুক্ত করা সমর্থনযোগ্য নয়।

(৩৬৩) আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে একজন বিদ্রোহী স্ত্রীলোককে হত্যা করা যেতে পারে।

(واذا قا تلن قتلن لر فع (المبسو ط للسر خسى ১৩০-১০)

অর্থাৎ যদি স্ত্রী লোকেরা যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।[৩৩]

৬) অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ

(৩৬৪) বিদ্রোহিগণ যদি মুসলিম রাষ্ট্রের বন্ধু কোনো দেশকে আক্রমণ করে এবং গনিমত লাভ করে এবং পরে সেই দেশকে যদি বিদ্রোহীদের কবল থেকে অনুগত সেনাবাহিনী উদ্ধার করে, তাহলে সেই দেশ প্রাক্তন অধিকারীর নিকট অবশ্যই প্রত্যর্পণ করা হবে।[৩৪] বিদ্রোহী এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত প্রজাগণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে অমুসলিম বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারে।[৩৫] যদি বিদ্রোহিগণ উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে অনুগত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাহলে তারা সকলেই

গনিমতের মালের অংশ পাবে।[৩৬] যদিও মুসলিম বাহিনীর অন্তর্গত অমুসলিম সৈন্যেরা মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে গনিমতের অংশ সাধারণতঃ পায় না, বরং তাদেরকে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়, তবু শায়বানী কোনো এক স্থানে মন্তব্য করেছেন যে যদি অমুসলিম বাহিনীর সংখ্যা অধিক হওয়ার দরুন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে অথবা মুসলিম বাহিনী যদি তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তেমন শক্তিশালী না হয়ে থাকে, তাহলে তারা সকলেই গনিমতের অংশ পাবে।[৩৭] যদি পরস্পরের মধ্যে যামিনের আদান-প্রদান হয় এবং বিদ্রোহীরা অনুগত যামিনে রাখা ব্যক্তিদের হত্যা করে বসে বিদ্রোহীদের পক্ষে যামিনে রাখা ব্যক্তিগণকে শাস্তি দেওয়া চলবে না যদিও সেরূপ মর্মে চুক্তি হয়ে থাকে, কারণ দোষ ব্যক্তিগতভাবে তাদের নয়, দোষ তাদের সরকারের।[২] বিদ্রোহীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি গনিমত হিসাবে গণ্য হবে না, তবে তা সুবিধার্থ বিক্রয় করা যেতে পারে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ যুদ্ধ বা শত্রুতা অবসানের পর প্রকৃত অধিকারিগণকে ফেরত দেওয়া হবে।[২৫]

(চ) মুসলমান শাসকের সিংহাসনচ্যুতি

(৩৬৫) প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে একটি কথার দিকে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে, তা' হল রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের (স্তম্ভ) দ্বারা মুসলমান শাসকের সিংহাসনচ্যুতি, যদি সে ভীষণ অত্যাচারী হয় কিংবা তার কর্তব্য সম্পাদনে অপরাগ হয়ে পড়ে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যদি সে পাগল হয়, কিংবা শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে পড়ে ইত্যাদি।

(৩৬৬) সাধারণতঃ কুরআন[৪০] ও হাদীসে[৪১] কর্তৃপক্ষের সর্বদা আদেশ পালন করতে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। একটি বহুল প্রচলিত ও উদ্ধৃত হাদীসে[৪২] মহানবী বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই মেষ-পালক এবং প্রত্যেকেই তোমার অধীনস্থদের জন্য দায়ী। সুতরাং শাসক মেষপালক এবং তাহার প্রজাগণের জন্য দায়ী; প্রতিটি মানুষ মেষপালক এবং তার পরিবারবর্গের জন্য দায়ী, একজন স্ত্রীলোক মেষপালিকা এবং তার স্বামীর গৃহের জন্য দায়ী; এক ভৃত্য

মেষপালক এবং সে তার প্রভুর সম্পত্তির জন্য দায়ী; একজন পুত্র মেষপালক এবং পিতার সম্পত্তির জন্য দায়ী—এইভাবে বাস্তবিকপক্ষে তোমরা প্রত্যেকে মেষপালক এবং তোমাদের অধীনস্থদের জন্য দায়ী।[৪৩] অধিকন্তু পরকালের জীবনে আল্লার নিকট দায়িত্ব রয়েছে। এমনকি অত্যাচারীদেরও আদেশ পালন করতে বলা হয়েছে; এবং একটি বিশেষ হাদীসে নবী (সঃ) বলেছেন বলে জানা যায়ঃ যদি শাসক সুবিচারক হয়, সে তার পুরস্কার পাবে; যদি শাসক অত্যাচারী হয় সে তার শাস্তি পাবে এবং তোমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত।[৪৪] বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, ইহা সত্ত্বেও মহানবী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেনঃ স্রষ্টার প্রতি অবাধ্য কারও প্রতি বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না।"[৪৫] মুসলিম রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র অনুসারে আল্লাহ্‌, বিশ্বের প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং মানুষ তার খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র (তুলনীয় ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়)।

(ছ) অমুসলিম বিদ্রোহিগণঃ

(৩৬৭) এতক্ষণ আমরা মুসলমান বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। অমুসলমান বিদ্রোহী প্রজাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে।

(৩৬৮) কেবল অমুসলিম প্রজাদের বিদ্রোহ, বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য হতে পারে যদি তাদের এলাকা মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত থাকে। কোনো অমুসলিম এলাকার সম্মুখীন প্রদেশের অমুসলিম বিদ্রোহিগণকে মুসলমান আইনবিদগণ সাধারণ অমুসলিম যুদ্ধরত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪৬] পূর্বে আমরা দেখেছি[৪৭] তার কারণ হল, মুসলমান আইনবিদগণের দৃষ্টিতে অমুসলমানরা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত, যদিও রাজনৈতিক কারণে তারা এক বা একাধিক দলভুক্ত হয়ে থাকে। সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহিগণের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকতে পারে।

(৩৬৯) সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও অমুসলমান প্রজাগণ সাধারণ বিদ্রোহীদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে, যখন

তারা বিদ্রোহীর নেতা না হয়ে স্থানীয় মুসলিম বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করবে।[৪৮]

টীকা ঃ

১। সারাখসী, মাবসূত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫ ; মাওয়ার্দি, পৃঃ ৯৬। মুওয়াফ্‌ফাক তাঁর গ্রন্থের (مناقب ابی حنیفه) ২য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠায় খারিজীদের সঙ্গে একটি লিখিত সন্ধির উল্লেখ করেছেন।

২। আরও আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের উপর আমার (গ্রন্থকারের) কিছু নূতন গবেষণামূলক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য (مجله طیلسانیین), হায়দ্রাবাদ, অক্টোবর, ১৯৪০, পৃঃ ১১-১২।

৩। আল-আহ্‌কামুস-সুল্‌তানিয়া, পৃঃ ৯৭।

৪। ঐ, পৃঃ ১০০।

৫। মাব্‌সূত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৬।

৬। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৮ (اعذار و انذار)।

৭। ঐ, পৃঃ ১০০।

৮। আশ-শায়বানী, কিতাবুল-আস্‌ল-অধ্যায় الخوارج و اهل البغی (পাণ্ডুলিপি-আয়াসোফিয়া, ১০৭৬ নং)।

৯। আশ্‌-শায়বানী, অভিমত উদ্ধৃত একই স্থানে; তুলনীয় মসুদী, মুরুজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬ খলিফা আলীর অভিমতের জন্য।

১০। সারাখ্‌সী, মাবসূত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।

১১। ঐ, পৃঃ ১৩০, ১৩৫।

১২। মাব্‌সূত, সারাখ্‌সী রচিত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

১৩। ঐ, পৃঃ ১৩৩।

১৪। মাবসূত, সারাখ্‌শী রচিত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬।

১৫। সারাখ্‌সী ও অন্যান্যরা।

১৬। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, পৃঃ ১০১।

১৭। সারাখ্‌সী, মাবসূত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

১৮। মাবসুত, সারাখ্সী রচিত, পৃঃ ১২৭-২৮, খলিফা আবু বকরের সময়ের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে।

১৯। ঐ, পৃঃ ১৩৫।

২০। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৩২।

২১। ঐ, মসুদীর মুরুযু-যাহাবও (৪র্থ খণ্ড) দ্রষ্টব্য; দীনাওয়ারী, পৃঃ ২১৩ দ্রষ্টব্য।

২২। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৩২, মসুদীর মুরুজঃ ৪র্থ খণ্ড, দীনাওয়ারী, পৃঃ ২১৩।

২৩। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, পৃঃ ১০০।

২৪। মাওয়ার্দি, পৃঃ ১০০।

২৫। মসুদীর মুরুযুযযাহাব এর ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬-১৭ঃ
الا علام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام ليوسوف بن محمد بن ابراهيم, الاندلسى (মৃত্যু ঃ ৬৫৩ হিঃ) fol. 862 (পাণ্ডুলিপি, কায়রো ইতিহাস, নং ৩৯৯,

২৬। কুরআন মজীদে আমালেকীদের আদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে নবীর (সঃ) উক্তিও উদ্ধৃত আছে এবং ইবনে তাইমিয়া তদীয় পুস্তক আস্-সিয়াসা আশ্-শারিয়াতে ইহা উদ্ধৃত করেছেন (পৃঃ ২৫, ৬০ঃ سيخرج قوم)।
...لمرقون من الدين ... لئن اوركتهم لا قتلنهم قتل عاد

অর্থাৎ—একদল আসবে…সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে…যদি আমি তাদের কাল পর্যন্ত জীবিত থাকি আমি ঠিক আদগণের মতোই তাদেরকে ধ্বংস করব।

২৭। য়ুসুফ আল-আন্দালুসী, অভিমত উদ্ধৃত, fol. 126; তাবারীর ইতিহাস, টীকা ৩৮।

২৮। শায়বানী الاصل অধ্যায়—الخوارج و اهل البغى।

২৯। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৯।

৩০। শায়বানী, অভিমত উদ্ধৃত, ইত্যাদি।

৩১। সারাখসী, মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭।

৩২। ঐ।

৩৩। সারাখসী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।

৩৪। শায়বানী, الأصل, প্রাগুক্ত পরিচ্ছেদ।

৩৫। সারাখ্সী, মাব্সুত, ১০ম খণ্ড পৃঃ ৯৮, ১৩৩-৩৪।

৩৬। ঐ পৃঃ ১৩০।

৩৭। শায়বানী, অভিমত উদ্ধৃত।

৩৮। সারাখ্সী, মাব্সুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯, কোরআন থেকে সুরা ৬, আয়াত ১৬৪ দ্রষ্টব্য ; আবু হানিফার অভিমত, খলিফা মনসুর কর্তৃক সমর্থিত অমুসলিম রাষ্ট্রে যামিন সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিশেষ করে মুসলমান বিদ্রোহিগণ সম্বন্ধে।

৩৯। সারাখ্সী ও অন্যান্যরা।

৪০। সুরা ৪, আয়াত ৫৯, Quranic world (Hyderabad, April 1936) এ প্রকাশিত আমার (লেখকের) লেখা Quranic conception of state দ্রষ্টব্য।

৪১। আলী মুত্তাকির তাব্ইব দ্রষ্টব্য (লেখকের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি), কিতাব আল উমারা অধ্যায় ইত্যাদি।

৪২। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, আলী মুত্তাকী, বুখারী, ইবনে হাম্বল ইত্যাদি।

৪৩। কানযুলতম্মিল ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে সংকলিত বহু হাদীস দ্রষ্টব্য।

৪৪। আবু য়ুসুফ, খারাজ, পৃঃ ৬ ; ইবনে কুতায়বা, উয়ূনুল-আখবার, পৃঃ ১, ৩ দ্রষ্টব্য।

৪৫। আলী আল মুত্তাকি প্রণীত তাহ্‌ভিব, ইবনে হাম্বাল, তিরমিযী, আবু দাউদ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৪৬। ফাতাভী তাতারখানিয়া, বিদ্রোহিগণ সংক্রান্ত অধ্যায়।

৪৭। তুলনীয় Supra, part 2, ch. 46.

৪৮। সারাখ্সী, মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮।

———

অষ্টম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক জলদস্যু তস্করগণ

(৩৭০) প্রাচীন ইসলামী সাহিত্যে কদাচ জলদস্যুগণ সম্বন্ধে পৃথক উল্লেখ দেখা যায়। মহানবীর (সঃ) সময়ে আবিসিনিয়ার জলদস্যুর লুণ্ঠন সম্বন্ধে ইবনে সাদের[১] লেখায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ জলদস্যুগণকে ডাকাতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তাবারী[১] বলেন, ব্যবহারের দিক থেকে দেশের দস্যু-ডাকাত ও বিদেশী দস্যু-ডাকাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। অবশ্য আমরা এখানে কেবল আন্তর্জাতিক দস্যু-তস্কর ও জলদস্যুদের কথা আলোচনা করছি।

(৩৭১) তাদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশের প্রায় সমস্তটাই নিয়ে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে, অথবা সেগুলির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যেগুলি বলা হয় পূর্বে[৩] নাযেল হয়েছিল (মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো একটি দেশের) আন্তর্জাতিক দস্যু-তস্কর সম্পর্কে ঃ

ঐ সব ব্যক্তিদের জন্য—যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে ফিতনা বা অশান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়—একমাত্র পুরস্কার এই যে তাদেরকে হত্যা বা তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে অথবা তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। ইহাই হবে পৃথিবীতে তাদের অধঃপতন—এবং পরলোকে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত আছে ; অন্যরা ব্যতিক্রম যারা পরাজিত বা পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্বে অনুশোচনা করে বা তওবা

করে। কারণ, জেনে রাখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (সূরা ৫; আয়াত ৩৩-৩৪)।

(৩৭২) কুরআনের তাফসীরকারগণের ঐক্যমত অনুসারে আয়াত-গুলিতে যে সব যুদ্ধরত ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে তারা দস্যু-তস্কর ও ঐ জাতীয় লোকজন। আইনের গ্রন্থাবলী অনুযায়ী তাদের প্রতি আচরণ হবে নিম্নরূপ ঃ

(১) লুণ্ঠনসহ খুনের জন্য শিরশ্ছেদ এবং পরে শূলবিদ্ধ করা

(২) কেবল খুনের জন্য শিরশ্ছেদ

(৩) বিনা হত্যায় লুণ্ঠনের জন্য হস্ত-পদ ছেদন বা কর্তন

(৪) হত্যা ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কিছুই না করে থাকে তা হলে বিবেচনা করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

(৩৭৩) দেশ থেকে বহিষ্কারের কথা যা পূর্বে বলা হয়েছে বিবেচনা প্রসূত শাস্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে কারাবাস, রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার বা বিতাড়ন, অথবা নানা বিপদাপদের মধ্যে সীমান্তে কোনো এক জেলায় নির্বাসন। যা হোক, যদি অপরাধিগণ মুসলিম হয় রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয় না, পাছে তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে অন্যান্য বিরোধীদের সঙ্গে।[৪]

(৩৭৪) যদি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজারা বিদেশী রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজাদের উপর ডাকাতি করে, তাদের মোকদ্দমা মুসলমানদের আদালতে চল্‌বে না,[৫] যদিও তারা বহিষ্কৃত হতে পারে, যদি তাদের মধ্যে সেই মর্মে চুক্তি থাকে। পক্ষান্তরে যদি মুসলিম এলাকায় বিদেশীরা প্রবেশ করে এবং পথিকদের উপর লুট-তরাজ চালায়, তাহলে সে মোকদ্দমা মুসলিম আদালতে চল্‌তে পারে।[৬] এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলো-চনায় তাইমিয়া বলেন,[৭] এমন কি দস্যু নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও, অর্থাৎ যদি সে মুসলমান, কিংবা আযাদ অথবা মুসলিম নাগরিক হয় এবং নিহত ব্যক্তি অমুসলমান হয় কিংবা ক্রীতদাস, কিংবা মুসলিম এলাকায় বসবাসকারী কোনো বিদেশী ব্যক্তি হয়, তথাপি হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে

ইবনে তাইমিয়া বলেন যে, খলিফা উমর একদল দস্যু-তস্করের প্রহরীকেও মৃত্যুদণ্ড দেন।

তাদের প্রতি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ঃ

(৩৭৫) সাধারণত দস্যু-তস্করের প্রতি এবং বিদ্রোহীদের প্রতি ব্যবহার একই। তবু নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্যযোগ্য ঃ

১) প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে, যা বিদ্রোহীদের বেলায় প্রয়োজন নাই।

২) অভিযানের লক্ষ্য হবে অবশ্য তাদেরকে বিনাশ করতে হবে।

৩) তাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্য তারা দায়ী থাকবে, সেকাজ সরকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পূর্বে হোক, বা সংঘর্ষকালীন হোক।

৪) অনুসন্ধানকার্য চলাকালে তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ রাখতে হবে।

৫) তাদের সংগৃহীত রাজস্ব জবরদখলের মতো গণ্য করতে হবে এবং করদাতাকে পুনরায় কর প্রদান করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই দস্যুর নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি সে ফেরত পাবে।

(৩৭৬) উপরে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত অনুসারে যদি দস্যুদল একে একে বা দলে দলে সরকার পাকড়াও করবার পূর্বে আত্মসমর্পণ করে এবং অনুতাপ করে ও ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দান করে, তাহলে দলের সভ্যগণকে ক্ষমা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের জীবন ও ধর্ম সম্পদের উপর তাদের অন্যায়ের দরুন কোনো বিচারের বিধান নাই।

টীকা ঃ

১। তাবাকাত, ২।১, পৃঃ ১৭-১৮।

২। তাফসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩২-৩৩; শায়বানী কৃত আসল

(পাণ্ডুলিপি, ওয়াকাআতিল, ইস্তাম্বুল), ২য় খণ্ড, অধ্যায় قطع الطريق, সারাখসীর মাবসুত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪।

৩। তাফসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩।

৪। মাওয়ার্দি, মন্তব্য উদ্ধৃত, পৃঃ ১০২-০৬ : কাসানী বাদায়ী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৪-৫ : সারাখসী, মাবসুত, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।

৫। সারাখসী, মাবসুত, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২০১-০৪ : শায়বানীকৃত আসল, অধ্যায় قطع الطريق।

৬। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৪-০৫।

৭। শায়বানী, একই অধ্যায় (পাণ্ডুলিপি ওয়াফা সাতিফ)

৮। السياسة الشرعية, pp. ৩৬-৭।

নবম অধ্যায়

অমুসলমান বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ

(৩৭৭) মুসলিম ফকিহ্ বা আইনবিদগণ যুদ্ধকে আল্লার পথে জীবন, ধন-সম্পদ ও জিহ্বার মাধ্যমে যোগ্যতা ও ক্ষমতা ব্যবহার করে সংগ্রাম করা বুঝিয়েছেন এবং ইহা প্রাপ্তির জন্য মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলেন: প্রথমত নিজ শক্তি সংরক্ষণ করা এবং তারপর বিধর্মী বা অবিশ্বাসিগণের শক্তি খর্ব করা এবং তাদেরকে বশীভূত করা।"[২] ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ অন্যের অনিষ্ট সাধন করে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করা বুঝায় না, বরং আল্লার সত্যিকার আইন প্রতিষ্ঠা (theocracy), পৃথিবীতে আল্লার রাজ্য স্থাপন করা বুঝায়, এবং বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই যে, সেনাবাহিনীকেও নিঃস্বার্থ হতে হয়। জাগতিক লাভের জন্য সামান্যতম বাসনা-কামনা পবিত্রতা নষ্ট করে দেয় এবং জেহাদের মহত্ত্বকে খর্ব করে দেয়। জেহাদ একমাত্র একটি উদ্দেশ্যে করা হয়—আল্লার আদেশ যাতে বলবৎ হতে পারে (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)* অন্যথায় সেই সৈনিকের পুরস্কার জান্নাত হবে না।

(৩৭৮) এইরূপে জেহাদ অর্থ কাকেও হত্যা ও লুণ্ঠন নয়, বরং নিজ জীবনকে খতম করার জন্য আত্মোৎসর্গ। একজন আদর্শবাদীর নিকট ইহা সর্বোত্তম কুরবানী বা আত্মত্যাগ—এই আত্মত্যাগ স্রষ্টা ও প্রভুর আদেশ পালনের একমাত্র উদ্দেশ্যে জীবন ও ধন সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য ত্যাগ স্বীকার।

টীকা ঃ

১। তুলনীয়, Supra, অধ্যায় ৩,' যুদ্ধের সংজ্ঞা'।

২। সারাখসী شرح السير الكبير প্রথম অধ্যায় পৃঃ ১২৭। (لان حقيقة الجهاد فى حفظ قوة انفسهم اولا ثم فى قهر اكمشر كين و كسر شوكتهم

৩। বুখারী ঃ ৩ ঃ ৪৫, ৫৫ ঃ ১০, ৫৭ ঃ ৮ ও ১০, ৯৭ ঃ ২৮ মুসলিম ঃ ৩৩ ঃ ১৪৯-৫১, তিরমিযি ঃ ২০ ঃ ১৬, নাসায়ী, ২৫ ঃ ২১, ইব্‌নে মাযা, ২৪ ঃ ১৩, তায়ালিসি, নং ৪৮৬-৮, ইব্‌নে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯২, ৩৯৭, ৪০৫, ৪১৭, bis. cf. the Quran, ix. 40 viii, 39, V, 54.

দশম অধ্যায়

যুদ্ধ ঘোষণা

(৩৮০) আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে অপর পক্ষের নিকট স্বাভাবিকভাবেই কোনো ঘোষণা করার বা সংবাদ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। অন্যথায় মুসলমান ফকিহ্‌গণ বলেন[১]:

যখন মুসলমানগণ এমন অবিশ্বাসিগণের মোকাবেলা করে যাদের নিকট ইসলাম অজ্ঞাত থাকে, এমতাবস্থায় মুসলমানরা আল্লাহ্‌র একত্বে (তওহীদ) বিশ্বাস করতে অথবা তাদেরকে জিযিয়া (জিম্মীদের দেয় কর) দান করতে আহ্বান করার পূর্বে যেন তাদেরকে আক্রমণ না করে, তবে যদি এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায় হয় যারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই এবং তাদেরকে ইসলাম ও তরবারির যে-কোনো একটিকে পছন্দ করতে হলে তা'হলে স্বতন্ত্র কথা (এরা হল ধর্মত্যাগী ও আরব উপদ্বীপের বিধর্মিগণ, যাদের উদ্দেশ্যে কুরআনের বিধান হল: 'তাদের সংগে যুদ্ধ করো, যতোক্ষণ তারা ইসলাম কবুল না করে'') এবং যদি বিনা ঘোষণায় তাদের সংগে যুদ্ধ করা হয় এবং রক্তপাত ঘটে, তা'হলে শাফেয়ী মযহাব অনুসারে যুদ্ধে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ এতোটা মুদ্রা (Blood money) মুসলিম রাষ্ট্রকে দান করতে হবে, যতোটা অনিচ্ছায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে দান করতে হয়। যা হোক, হানাফী মযহাব সেই রক্তপাতের জন্য কোনো শাস্তির বিধান বা ব্যবস্থা রাখেন নাই। কিন্তু যদি সেই জাতি ইসলামের অর্থ সঠিকভাবে

উপলব্ধি করে থাকে, তা'হলে তাদেরকে সতর্ক করে দিতে হবে এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে—যদিও ইহা অবশ্য কর্তব্য বা বিধেয় নয়। কারণ তারা জানে, কেন তাদেরকে আক্রমণ করা হয় এবং তাদেরকে চূড়ান্ত নোটিশ দিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। যা হোক, এরূপ সম্প্রদায়ের সংগে ইসলাম কবুল করার আমন্ত্রণ না দিয়ে এবং জিযিয়া দান করার আহ্বান না জানিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র যুদ্ধ করতে পারে।

(৩৮১) এই মর্মে মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশ উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।[২] যা হোক, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে বোঝা যায় যে, আইনের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দু'টি যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। শত্রু রাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধ ঘোষণা করার নোটিশ সম্পর্কে মুখ্য প্রশ্নটি অমীমাংসিত অবস্থায় আছে বলে মনে হয়। এজন্য আমরা মহানবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারি, যা মুসলিম আইনের নিরাপদ ও চিরন্তন উৎস। সুতরাং তিনটি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অবস্থায় মহানবী অগ্রিম নোটিশ ব্যতিরেকে যুদ্ধ করেছেন:

(১) যে শত্রুর সংগে কোনো সন্ধি হয় নি তার সংগে যুদ্ধের ক্ষেত্রে, যদিও সময়ে সময়ে দুই পক্ষের বাহিনী যুদ্ধ ক্ষান্ত করেছিল।

(২) যুদ্ধকে বন্ধ করার জন্য কোনো যুদ্ধের ক্ষেত্রে (যে বিদেশী শক্তির সংগে কোনো চুক্তি না থাকে তার তরফ থেকে হামলার আশংকায় যে যুদ্ধ হয়)। বনু মুসতালিক, খাইবার, হুনায়েন প্রভৃতি যুদ্ধ এই ধরনের ছিল।

(৩) শাস্তিমূলক ও প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ (চুক্তি ভংগের জন্য কোনো রাষ্ট্রকে শাস্তি দেওয়ার জন্য)। বনু কয়িনুকা, বনু কুরায়জা ও মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলি এই ধরনের। যদি জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি হয় এবং পরে সেই জিযিয়া প্রদান বন্ধ করা হয়, সে-ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন কিংবা নোটিশ ছাড়াই যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে (তুলনীয় মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, ৪র্থ অধ্যায়)।

(৩৮২) অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ব নোটিশ প্রদান আবশ্যক এবং বিশেষত:

ঐ রাষ্ট্রের চুক্তি ভংগের আশংকার বিরুদ্ধে, যার সংগে চুক্তির সম্পর্ক থাকে। সুতরাং কুরআনে আছে ঃ

যদি তোমরা কোনো পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় করো, তা'হলে তাদের চুক্তি তাদের উপর নিক্ষেপ করো, অর্থাৎ ভঙ্গ করো (সূরা ৮ঃ আয়াত ৫৮)।

(৩৮৩) এবং আস-সারাখ্শী এই আয়াতের উপর এ ভাবে মন্তব্য করেছেন ঃ

অর্থাৎ তোমরা ও তারা জ্ঞানের দিক দিয়ে সমান। এবং এভাবে আমরা জানতে পারি যে, সন্ধি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে এবং তারা ইহা অবগত হওয়ার পূর্বে তাদের সংগে যুদ্ধ করা বিধেয় নয়।[৩]

(৩৮৪) পরবর্তী অধ্যায়ে সন্ধি ও শান্তি সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হবে।

টীকা ঃ

১। সারাখ্শী, السير الكبير, ১, ৫৭-৮

২। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুসলিমের সহিহ্, (ইস্তাম্বুল), ৫ম খণ্ড, ১৩৯-৪০

৩। সারাখ্শী, মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭।

একাদশ অধ্যায়

যুদ্ধ ঘোষণার ফলাফল

(৩৮৫) সম্ভবতঃ মুসলিম এলাকার পার্শ্ববর্তী দেশের প্রাচীন ফকিহ্গণের সময়ে যে রীতি প্রচলিত ছিল, সেই অনুসারে শত্রুর সমস্ত জান-মাল যুদ্ধরত অবস্থার সামিল মনে করা হত। যদিও ব্যবহার বিবিধ শ্রেণী অনুযায়ী পৃথক হয়ে থাকে, যা আমরা কালক্রমে দেখ্তে পাব, কেউই পূর্ণ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। প্রত্যেকটি দৈহিক শক্তিতে সমর্থ মানুষকে দক্ষ যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হত এবং এমন কি স্ত্রীলোক ও শিশুদেরও বন্দী করা চলত।

১। সাধারণ ফলাফল ঃ

(৩৮৬) স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধরত রাষ্ট্রদ্বয় ও এদের প্রজাগণের মধ্যে সকল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে। দূতগণকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যুদ্ধনীতি অনুসারে শত্রুপক্ষের সংগে যুদ্ধ করবার ও ক্ষতিসাধন করবার অধিকার লাভ করে। সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং নাগরিকগণকে নিষেধ করে দেওয়া হয় শত্রুকে কোনো প্রকার সাহায্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সংবাদ পরিবেশন করতে। হাদীসের দৃষ্টান্ত, যে শত্রুর নিকট মুসলিম বাহিনীর মতলব সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করার প্রয়াস পেত[২] এবং ফলে তার যে বিচার হয়েছিল, তা মহানবীর সময়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত। হিজরাতের প্রথম দিকে মদীনার নগর-রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রেও[৩] একই বিধান রয়েছে (সূরা ২০, আয়াত ৪৩)। কুরআনে স্পষ্ট বিধান রয়েছে ঃ তারা যেন তোমাদেরকে

শত্রু বা অনমনীয় দেখতে পায়”[৪] এবং পুনরায় বলা হয়েছে তাদের উপর অনমনীয় হও।[৫] তথাপি ইহা কুরআনের শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, তদানীন্তন ইসলামের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু কোরেশদের জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে ঃ

“এবং ঐ ব্যক্তিদের প্রতি ঘৃণা, যারা তোমাদেরকে (এক সময়ে) পবিত্র মক্কার কাবাগৃহে যেতে দেয় নি, সীমা লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে; বরং তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো ধর্মপরায়ণতা ও কর্তব্যপরায়ণতার সংগে। পাপ ও সীমা লঙ্ঘন করার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না, বরং আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা[৬] (৫ ঃ ২)।

(৩৮৭) শত্রুদের সংগে সমস্ত সহযোগিতা বর্জন করার পরিবর্তে কুরআনে দাতব্য ও ধর্মীয় ব্যাপারে সহযোগিতার নির্দেশ দান করা হয়েছে। এই আয়াতের তাফসীরকারগণ বলেন যে, যখন মুসলমানরা শত্রুদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন মনে করেছিলেন, সেই সময়ে আয়াত দ্বারা মানবতার খাতিরে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল।

২। বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর ফলাফল ঃ

(৩৮৮) মুসলিম আইন সংকলনের মধ্যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ তথ্য লাভ করতে পারি নি। অতএব প্রাচীনকালের কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

(৩৮৯) ক) সা'দ বিন মুয়ায বলেন, তিনি উমাইয়া ইবনে খালফ ওরফে আবু সাফ্ওয়ানের বন্ধু ছিলেন। যদি উমাইয়া মদীনার ভিতর দিয়ে কোথাও যেত, সে সা'দের নিকট থাকত এবং পক্ষান্তরে সা'দ মক্কার ভিতর দিয়ে কোথাও গেলে উমাইয়ার নিকট থাকতেন। মদীনায় হযরত (সঃ) চলে আসার পর সা'দ মক্কায় যান উমরা সম্পাদন করতে এবং উমাইয়ার নিকটে অবস্থান করে তাকে বললেন উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে যখন তিনি কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবেন। তাই তারা প্রায় দ্বিপ্রহরে বাইরে গেলেন। আবু জেহেলের সংগে তাঁদের

সাক্ষাত হল এবং উমাইয়াকে প্রশ্ন কর্লেনঃ হে আবু সাক্ওয়ান, তোমার সংগে এই লোকটি কে? সে বললঃ সা'দ। অতঃপর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্ল: বেদাতীদেরকে (মুসলমানের উদ্দেশ্যে আবু জেহেল বলেছিল) আশ্রয় দেওয়া সত্বেও দেখছি তুমি শান্তির সাথে মক্কার ঘর (কাবা) প্রদক্ষিণ কর্‌ছ এবং তুমি ভানও করো যে, তুমি তাদেরকে সাহায্য করবে? আল্লার কসম, যদি তুমি আবু সাকওয়ানের সংগে না থাকতে, তা'হলে তোমার লোকদের কাছে নিরাপদে তুমি প্রত্যাবর্তন করতে পারতে না। সা'দ উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলেনঃ আল্লার কসম, যদি আজ বাধা দিতে, তাহলে আমি তোমাকে বাধা দিয়ে তোমার পক্ষে অধিকতর অসুবিধা ঘটাতাম, অর্থাৎ মদীনা-বাসীদের ভিতর দিয়ে তোমার যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হত।[৭]

(৩৯০) ক) আবদুর রাহমান ইবনে অওফ বলেনঃ আমি উমাইয়া বিন খালফের সংগে একটি চুক্তি করলাম যাতে সে মক্কায় আমার মালপত্রের হেফাযত করে এবং আমি মদিনায় তার মালপত্রের হেফাযত কর্‌ব। যখন আমি আমার নাম লিখলাম আবদুর রাহমান', সে বল্ল: আমি ইহা জানি না, বরং তুমি তোমার প্রাক-ইসলামী নামটি লিখ। সুতরাং আমি "আবদ আম্‌র" নামটি দস্তখত করলাম। এটা ছিল বদর যুদ্ধের দিন……।[৮]

(৩৯১) খ) উভয় ঘটনাই ঘটেছিল হিজরতের প্রথম দিকে, বদর যুদ্ধের পূর্বে, যা ঘটেছিল দ্বিতীয় হিজরীতে। অতএব এই ঘটনাগুলির বিশেষ গুরুত্ব নাই, বিশেষতঃ এই সব ঘটনা মহানবীর গোচরে এবং অনু-মোদনক্রমে ঘটেছিল—তার কোনো প্রমাণ নাই।

(৩৯২) গ) সুমামা ইবনে সাল ইয়ামামার জনৈক দলপতি ছিল। ষষ্ঠ হিজরীর গোড়ার দিকে এক মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আনীত হয়েছিল। এখানে মহানবীর ভদ্র আচরণে সে এমনই মুগ্ধ হয় যে, সে ইসলাম কবুল করে ফেলে। প্রত্যাবর্তনের পথে সে মক্কার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার ইসলামে দীক্ষার জন্য কিছু বিরূপ মন্তব্য কানে এলো। সে বলল: তোমাদের

শহরে ইয়ামামার একটি কণাও আমদানী হবে না যে পর্যন্ত মহা-নবী নির্দেশ না দেন। ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মক্কাবাসীরা বিনীতভাবে মহানবীকে অনুরোধ করল নিষেধ তুলে নেওয়ার জন্য, যা তিনি দয়াপরবশ হয়ে করেছিলেন।[৯] যদিও এই বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য অজ্ঞাত রয়েছে, তথাপি আমরা বুঝতে পারি যে, সরকারের উপর নির্ভর করে তার প্রজারা শত্রুর সংগে ব্যবসা করবে কিনা এবং করলে কতোটা করবে তার নির্দেশ দান করা।

(৩৯৩) ঘ) মহানবী (সঃ) স্বয়ং মক্কার ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ানের নিকট কিছু মদীনার খেজুর পাঠিয়েছিলেন চামড়ার বিনিময়ে। ইহা ঘটেছিল শোনা যায় তখনই যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যে শত্রুতা চলছিল।[১০] ইহার দ্বারা আমাদের ধারণা দৃঢ় হচ্ছে এই মর্মে যে, রাষ্ট্রীয় নীতির উপর নির্ভরশীল কোন্ বস্তু যুদ্ধ ও ব্যবসায়ের ব্যাপারে নিষিদ্ধ হবে এবং কোন্টা তা হবে না।

৩। ওয়াক্ফ ও ঋণের উপর ফলাফল ঃ

(৩৯৪) যদিও চতুর্দশ শতকের আন্তর্জাতিক ঋণের সংগে আধুনিক কালের বিশাল ঋণের আদৌ তুলনা চলে না, তবু কিছু প্রাচীন দৃষ্টান্ত থেকে এবং সাধারণভাবে আইনের ধারা থেকে আমরা নির্দেশ পেতে পারি।

(৩৯৫) যখন মক্কাবাসীদের বাড়াবাড়ি চরমে পোঁছুলো এবং তারা বাস্তবিক পক্ষে মহানবীর জীবন সংহার করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তার ফলে নিরাপত্তার সন্ধানে তিনি মক্কা থেকে মদীনা গমন করেন, তিনি তাঁর পিতৃব্যপুত্র আলীর উপর বিধর্মী ও যুদ্ধরত নাগরিকগণের গচ্ছিত জিনিসপত্র তাদেরকে ফেরত দেওয়ার ভার ন্যস্ত করেন।[১১] নিঃসন্দেহে মক্কাবাসীরা তখন যুদ্ধমান সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হ'ত।[১২] আমাদের ধারণা মহানবীর উত্থানকালে তাঁর কাজ অন্যরূপ হত না।

(৩৯৬) সারাখ্শী কর্তৃক উল্লিখিত (তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ২২৯—(شرح السير الكبير) বনু নাযির নামক ইহুদীদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক।[১৩] মহানবীর জীবদ্দশায় এই ইহুদীরা

ও পার্শ্ববর্তী মদীনার মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে পরাজিত করে মহানবী মদীনা থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করার স্বীকৃতি দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দেন। তারা তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সংগে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর মুসলমানদের নিকট তাদের প্রাপ্য ঋণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। শোনা যায়, মহানবী বলেন, যখন ঋণ পরিশোধের সময় আস্‌বে তখন সেগুলো পরিশোধ করা হবে এবং যুদ্ধের কারণে তা বাতিল করা যেতে পারে না; তবু যদি ইহুদী ঋণদাতাগণ তৎক্ষণাৎ ঋণ পরিশোধ চাইত, তা'হলে তারা মুসলমান ঋণী ব্যক্তিদের সংগে নতুন চুক্তি কর্‌বার অধিকার পাবে এবং তা এই যে, তারা ঋণের শতকরা কিছু অংশ ছেড়ে দেবে (ضعوا و تعجلو) অর্থাৎ, কিছু ছাড়ো এবং নগদ আদায় করো।

(৩৯৭) গ) খায়বার যুদ্ধের সময় মহানবী আস্‌ওয়াদ নামক খায়বারবাসী এক ইহুদী ক্রীতদাস যে তার প্রভুর মেষ ও ছাগলের পাল চরাত, সেগুলো নিয়ে যখন সে ইসলাম গ্রহণ করতে এলো তখন মহানবী তাকে আদেশ দিলেন: কিছু নিরাপদ দূরত্বে যাও এবং মেষ ছাগলের পালকে এমন করে ভয় দেখাও যেন তারা তাদের প্রভুর নিকট অভ্যাস মতো ফিরে যায়।[১৪]

(৩৯৮) ঘ) খলিফা উমরের রাজত্বকালে মুসলিম বাহিনী হিম্‌স অধিকার করেছিল এবং পূর্বেকার রাজস্ব নির্ধারিত ও সংগৃহীত হয়েছিল দেশবাসীদের নিকট থেকে। পরবর্তীকালে সামরিক প্রয়োজনীয়তার কারণে নগরটি থেকে মুসলমানদেরকে সরে যেতে হয়। ফলে মুসলমান প্রধান সেনাপতি অধিবাসীদের সমস্ত রাজস্ব ফেরত দেওয়ার জন্য ফরমান জারী করেন এবং বলেন: আমরা তোমাদেরকে হেফাযত কর্‌ব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। যেহেতু আমরা তা করতে পারছি না, সুতরাং তোমাদের অর্থের উপর আমাদের কোনো দাবী নাই।[১৫]

(৩৯৯) কোরআনের নির্দেশ হল: (ক) শোন, আল্লাহ্‌ তোমাদের হুকুম করেন যে, তোমরা মালিকের নিকট তাদের মাল-মাত্তা ফেরত

দাও এবং যদি মানুষের মধ্যে বিচার করো তো ইনসাফের সংগে করো[১৬] (৪ : ৫৮)।

(খ) ……… এবং যদি তোমরা কেউ অপরের নিকট কিছু সমর্পণ করো, তা'হলে সে যেন অর্পিত সম্পদ মালিককে ফেরত দেয় এবং সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে[১৭] (২ : ২৮৩)।

(৪০০) মহানবী (সঃ)-এর হাদীসে আমরা পাই :

(ক) ঋণ ব্যতীত সমস্ত বাধ্যবাধকতা তরবারী মুছে ফেলে।[১৮]

(খ) যে কেউ কোনো আমানত রাখবে, সে যেন তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করে।[১৯]

(৪০১) নিঃসন্দেহে প্রতিশোধের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা বর্জন করা যেতে পারে।[২০] তথাপি যে নিরপরাধ, তার উপর অপরের বোঝা চাপানো উচিত নয়।[২১]

(৪০২) যা হোক এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বাস্তবিকপক্ষে কি করা হত তা অবগত হওয়া সম্ভব হয় নি।

৪। সন্ধির উপর ফলাফল :

(৪০৩) মুসলিম আইন বা রাজনীতি সংক্রান্ত কোনো পুস্তকে এই প্রশ্নের বা বিষয়ের নীতিগত বা তত্ত্বগত কোনো আলোচনা দেখা যায়। তবু ইহা স্পষ্ট যে, দুই যুদ্ধমান পক্ষের সমস্ত সন্ধি বা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে না যুদ্ধ ঘোষণার সংগে সংগে।

(৪০৪) যে সব চুক্তি অনুসারে কাজ হয়েছে, যেমন সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কেবল যুদ্ধের ঘোষণা দ্বারা রদ হয় না। পূর্বে যে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে সে বিষয়ে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রদবদল হবে না।

(৪০৫) পক্ষান্তরে মিত্রতা চুক্তি, প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব, পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি ইত্যাদি বাতিল হয়ে যাবে যদি উভয় পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৪০৬) এই দু'টি স্পষ্ট বিষয় ব্যতীত কিছু চুক্তি আছে যা বন্ধুত্বের

সময় কার্যকরী হয় না এবং যখন দু' পক্ষ-যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন সেই চুক্তিগুলো কার্যকরী হত। এই চুক্তি হল যুদ্ধকালীন পারস্পরিক আচরণ সংক্রান্ত। এই চুক্তিগুলো এতোই পুরাতন যে, আশ্-শায়বানী[২২] সেগুলো উল্লেখ করেন নি। তিনি কিছু কাল্পনিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যা যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ, পানি সরবরাহ বন্ধ, অধিকৃত কিংবা পরিত্যক্ত দেশের ধ্বংস ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত।

(৪০৭) কতকগুলো চুক্তি আছে যা ইচ্ছামতো বাতিল করে দেওয়া হয়ঃ সেগুলো রদ করে দেওয়া হয়, সাময়িকভাবে কার্যকরী করা হয় না অথবা কিছুটা পরিবর্তিত করা হয়। এগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত চুক্তি।[২৩] পরিবর্তন সাপেক্ষ চুক্তির ব্যাপারে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শত্রুপক্ষ প্রতি এক বছরের জন্যে এক হাজার দিনার হিসাবে তিন হাজার দিনার কর প্রদান করবে—এই শর্তে তিন বছরের জন্যে যদি যুদ্ধবিরতি হয় এবং সেই করের অর্থ যদি এককালীন অগ্রিম পাওয়া যায় এবং মুসলিম রাষ্ট্র যদি এক বছর পরেই সেই চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করতে চায় তবে গৃহীত কর হিসাব মোতাবেক ফেরত দিতে হবে।[২৪]

(৪০৮) বর্তমানে কিছু চুক্তি আছে যা যুদ্ধকালে কার্যকরী না হলেও সন্ধির পর কার্যকরী হয়, যদি যুদ্ধমান দু' পক্ষ তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এই চুক্তিগুলো ডাক ও তার বিনিময় ও এই ধরনের বিষয় সংক্রান্ত।

(৪০৯) এতোক্ষণ আমরা দু' পক্ষীয় সন্ধির কথা বলেছি। অনেকগুলো শক্তি বা রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সমস্যা জটিল করে যখন কিছু চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে এবং অন্যান্যরা কোনো না কোনো পক্ষে সংঘর্ষে যোগদান করে। একটি সাম্প্রতিক ঘটনা হল সুদানকে নিয়ে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যৌথসংঘের সভ্য মিসর ও ইংলণ্ডের মধ্যে মিসর নিরপেক্ষ থাক্‌ল, কিন্তু ইংলণ্ড থাকে নি। এ ছাড়া এমনও হয়ে থাকে যে, নিরপেক্ষদের বাদ দিলেও, পূর্বের চুক্তিভুক্ত অন্যান্য অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলো দলবদ্ধভাবে চুক্তির বহির্ভূত কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে।

(৪১০) স্বাভাবিকভাবেই চুক্তির ধরন অথবা শর্তাবলী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করে। প্রাচীন কালের কতিপয় দৃষ্টান্ত ছাড়া নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

(৪১১) প্রাচীন চুক্তিগুলোর গভীর অধ্যয়ন আবশ্যক। এখানে আমি মহানবীর আমলের কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

(৪১২) ক) যখন মহানবী (সঃ) মদীনায় হিজরত করে গেলেন সেখানে তিনি অরাজকতা দেখ্তে পেলেন। সেখানে তিনিই শিথিল একটি কনফেডারেশানের ভিত্তিতে নগর-রাষ্ট্র স্থাপন করেন[২৫]। মক্কার মুহাজেরীন ছিলেন এক সম্প্রদায় বা শ্রেণী; মদীনার মুসলিম ও অমুসলিম গোত্রগুলো ব্যক্তিগতভাবে যোগদান কর্ল এবং ইহুদিগণও ফেডারেশানে যোগদান করে। প্রত্যেকটি গোত্রের ছিল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। ইহুদী ও মদিনার আরবদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে দেয় নি এবং বাস্তবিকপক্ষে প্রাক-ইসলামী আমলে কিছু আরব গোত্র ইহুদী গোত্রের সংগে যোগ দিয়েছিল তাদের হুমকি থেকে নিরাপত্তার জন্য এবং এই সব গোত্রই পনর মাইল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উপত্যকার ভিতর বাস কর্ত। এইরূপে কনফেডারেশানের প্রতি পৃথক ও ব্যক্তিগত আনুগত্যের জন্যই চুক্তি ঠিক থাক্ত যদিও কোনো ইহুদী গোত্র নগর-রাষ্ট্রের মুসলমানদের সংগে সংঘাতে লিপ্ত হত। এই গোত্রের নাম ছিল কায়্নুকা।[২৬] আরও পরে যখন অন্যান্য ইহুদী গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হত, নগরের অন্যান্য ইহুদিগণ হয় নিরপেক্ষ থাক্ত, নয়তো তাদের ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মহানবীকে সাহায্য কর্ত।[২৭] মদীনা থেকে কিছু ইহুদী গোত্রের বহিষ্কারের পর যে চুক্তি অনুসারে মদীনাকে নগর-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হয়েছিল সেই চুক্তি মোতাবেক মহানবী অবশিষ্ট ইহুদীদের নিকট থেকে মৃত্যুর বিনিময়ে রক্তপণ দাবী করেছিলেন।[২৮]

(৪১৩) খ) মহানবীর জীবদ্দশায় মক্কা ও মদীনার ভিতর আর একটি অনেক গোত্রের সম্মিলিত চুক্তির উদাহরণ হল, হুদায়বিয়ার চুক্তি,[২৯] যার পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু গোত্র যোগ দিয়েছিল। যখন মক্কাবাসিরা

মুসলমানদের মিত্র একটি গোত্রের উপর অত্যাচার করেছিল, অনাক্রমণ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত গোটা চুক্তিটিকে মুসলমানগণ বাতিল গণ্য করেছিল।

(৪১৪) চুক্তি কিভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা রদ করতে হয় তা পরে আলোচনা করা হবে।

টীকা ঃ

১। পরবর্তী ১৩শ অধ্যায়ের ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ইবন্ হিশাম, পৃ ঃ ৮০৯-১০ ; তাবারী ১ ঃ ১৬২৬-৭

৩। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪১-৪, অথবা লেখকের Corpus Des traites No I

৪। আল-কোরআন ঃ ৯ ঃ১২৩

৫। ঐ ঃ ৯ ঃ ৭৩

৬। আল-কোরআন ঃ ৫ ঃ ২

৭। বুখারী ঃ ৬৪ ঃ ২ (ভিকাল অধ্যায়)

৮। Ibid, 40 : 2 (অধ্যায় মাযহাব)

৯। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৭,৯৮ ঃ ইবনে আবদুল বার নং ২৭৮ ; ইবনে হাজার, ইসাবা নং ৯৬১ ; তারিখ আল-খামস, ২য়, খণ্ড, পৃঃ ৩ ; তুলনীয় ইবনে সা'দ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০১।

১০। সারাখশী شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০ ; Idem مبسوط, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।

১১। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৩৪; ইবনে সা'দ, ৩।১, পৃঃ ১৩। মাসুদী, আল-তামবীহ, পৃঃ ২৩৩।

১২। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩২৩-২৪, ৩৩০ ঃ
و عرفوا انه قد اجمع لحربهم ... و الله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا تبايعوه على حربنا

অর্থাৎ তারা জানত, যে মহানবী তাদের সংগে যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন - - - - আল্লার কসম, আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যান্য মানুষদের সংগে নিয়ে আমাদের উপর হামলা করবেন না।

১৩। شرح السير الكبير ৩য় খণ্ড, ১৮০, ২২৯।

১৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৬৯-৭০ ;

আলকুলায়ি, বার্লিন পাণ্ডুলিপি—الاكتفاء فى مغازى المصطفى

১৫। আবু য়ুসুফ, খারাজ পৃঃ ৮১, বালাযুরী, ফুতুহ্, পৃঃ ১৭৩ আযদী, ফুতুহ্, পৃঃ ১৩৭-৩৮ ; De Goege, Memoire Sur la conquete de la Syrie, ২য় সং, পৃঃ ১০৩-৪।

১৬। আল-কোরআন : ৪ : ৫৮।

১৭। ঐ ২ : ২৮৩।

১৮। সারাখ্শী شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০।

السيف محاء للذنوب لا الدين -

অর্থাৎ "তরবারী ঋণ ব্যতীত অন্যসব পাপ মুছে দেয়।"

১৯। বিদায় হজ্জের বক্তৃতায় দ্রষ্টব্য—ইবনে হিশামের বরাতে الوثائق السياسية নামক আমার পুস্তক, তাবারী, ইয়াকুবী ও জাহিবের البيان و التبيين তুলনীয় Melarges Massignon, ১ম খণ্ডে Bilaclere লিখিত নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২০। কোরআন, ১৬ : ১২, ৪০ : ৪০, ৪২ : ৪০, ৬ : ৬১। ইত্যাদি।

২১। কোরআন, ৬ : ১৬৫ ইত্যাদি—(و لا تزر وازرة وزر اخرى)

২২। তুলনীয় সারাখ্শী, شرح السير الكبير পৃঃ ১২০০-০৫।

২৩। Cf. Supra Effects on commercial Relations (বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর প্রভাব)।

২৪। সারাখ্শী, ৪র্থ খণ্ড : ১৫।

২৫। ইবনে হিশাম (সিরাত-ই-ইবনে হিশাম) গঠনতন্ত্রের লিখিত বিবরণী দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩৪১-৪৪ ইত্যাদি ; আমার (লেখকের) প্রবন্ধে

First written constitution in the world (পৃথিবীতে প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র) আলোচনা ও বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

২৬। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৪৫-৪৬ ; আমার (গ্রন্থকারের Lav Diplomatic Musulmane, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬।

২৭। সারাখ্‌শী, মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৩।

২৮। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৫২ ; ইবনে সাদ, ২।১, পৃঃ ৪০-৪১; তাবারী, ১ম খণ্ড, ১৪৪৯-৫০।

২৯। ইবনে হিশাম, ৭৪৭-৪৮ এবং গ্রন্থকারের corpus।

দ্বাদশ অধ্যায়

শত্রুদের সঙ্গে আচরণ

(৪১৫) যুদ্ধ ঘোষণার পর শত্রু ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে পারত, যারা পূর্বে অনুমতিক্রমে আস্‌ত অথবা তাদের নিজ এলাকায় কিংবা যুদ্ধরত এলাকায় থাকতে পারত। এদের প্রত্যেকের সংগে আচরণ বিভিন্ন প্রকার হবে।

১। বসবাসকারী বিদেশী শত্রু :

(৪১৬) মুসতামিন শব্দের অর্থ মুসলিম আইনের পরিভাষায় বলতে গেলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে অনুমতিক্রমে সাময়িকভাবে বিদেশে বাস করে। অমুসলমান এলাকায় মুসলমান গেলে এবং মুসলমান এলাকায় অমুসলমান গেলে কিংবা মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকের ক্ষেত্রে যাঁকে মাওয়ালী বলে। কিন্তু এই অধ্যায়ে প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে তাকেও মুসতা'মিন বলা হবে, কিংবা মিত্রতার সম্পর্ক নেই এমন কি যুদ্ধমান রাষ্ট্রের নাগরিকের ক্ষেত্রে আরবীতে কোনো পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। সকলকেই মুসতা'মিন বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ শব্দগত অর্থ হল যে আত্মরক্ষা চায়।

(৪১৭) এইরূপ একজন বিদেশী বসবাসকারী যে মুসলিম এলাকায় থাকত, পূর্বের মতো সে নিরাপদে থাকত। যদি তার রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।[১] পাসপোর্টের আইন অনুসারে তার ইচ্ছামতো সে তার দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারত; এমনকি সে তার সংগে

বিষয়-সম্পত্তিও নিয়ে যেতে পারত। অবশ্যই ব্যতিক্রম ধরা হত, তথাপি সে যা সংগে এনেছিল তা সে ফেরত নিতে পারত।[৩] নতুন ক্রয় করা দ্রব্যাদি সে মুসলিম রাষ্ট্রে বিক্রয় অথবা কাকেও হস্তান্তর করতে পারত। সাধারণতঃ বিদেশী বসবাসকারী মুসলিম এলাকা থেকে যেদিকে খুশী যেতে পারত তথাপি তাদের বড়ো কোনো দলকে ঐ রাষ্ট্রে যেতে দেওয়া হত না, যার সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ চলত, যদিও এরূপ আশংকা করা হত যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধমান জাতির সঙ্গে হাত মিলাবে।[৪] যাহোক তারা নিরাপদে নিজেদের দেশে চলে যেতে পারে যদিও সে দেশ মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে।[৫] কারণ তাদেরকে ধরে রাখ্‌লে চুক্তির খেলাফ হবে। যদি কোনো মুসতা'মিন্ গুপ্তচরবৃত্তি করে, তা'হলে সে তার নিরাপত্তা হারাবে। এটা তখনই ঘটবে যখন কোনো যুদ্ধমান রাষ্ট্রের মুসতা'মিন ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহির্গত হয়। তখন সে সংগে সংগে সাধারণ যুদ্ধরত নাগরিকে পরিণত হয় এবং মুসলিম এলাকায় থাকাকালে যে নিরাপত্তা সে ভোগ করত তারও অবসান হবে।

২। অভ্যন্তরীণ শত্রু ঃ

(৪১৮) গৃহে অবস্থানকারী শত্রুদিগকে অবরোধের কারণে দুঃখ-কষ্ট ও অন্যান্য পরিস্থিতিকে সহ্য করতে হবে। যখন তাদের শহর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হয়, তাদের প্রতি আচরণ কিরূপ হবে তা নির্ভর করবে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর উপর অথবা প্রধান সেনাপতির সাধারণ ঘোষণার উপর। বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

৩। যুদ্ধরত এলাকায় শত্রু সম্পর্কে ঃ

(৪১৯) যুদ্ধরত এলাকায় শত্রু যোদ্ধা শুধু নয়, অন্যান্যরাও পূর্ণ নিরাপত্তা দাবী কর্‌তে পার্‌ত না। অবশ্যই মুসলমান সৈন্যগণকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের, স্ত্রীলোকগণের ও নাবালক এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপর কামানগোলা না ছুঁড়ে

তথাপি যদি কোনো ক্ষয়-ক্ষতি অনিচ্ছায় হয়ে যায়, তাতে মুসলিম বাহিনীর উপর কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত হয় না।

(৪২০) যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত কোনো শত্রু নাগরিক ও বিদেশী মিত্রদের[৬] মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু শত্রু সমর্থ যোদ্ধা এবং বাহিনীর অনুসরণকারী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, সংবাদ-পরিবেশনকারী এবং অন্যান্য যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। শত্রু যোদ্ধাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকেও যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়, এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

টীকা :

১। সারাখ্‌শী শরেহ্‌-আসসিয়ার-আল-কবীর, ৩য় খণ্ড : ২৯৫ ইত্যাদি

২। কাসানী بدائع ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০৭, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫-১৬।

৩। সারাখ্‌শী : মাবসুত : ১০ম খণ্ড : পৃ : ৯১-৯২।

৪। সারাখশী : شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২১-২২ :

ولو ان قوما من اهل الحرب دخلوا الينا با مان لم اراد و ان يخرجوا الى دار حرب اخرى ليكونو معهم يقاتلون اهل الاسلام فلا ينبغى للمسلمين ان يمكنوهم من ذلك وان كان الداخل واحدا او اثنين لم يمنع من الرجوع الى دارحرب اخرى للتجارة معهم لان بهذا القدر لا يز دارقوة اهل هذه الدار عل قتالنا بخلاف ما اذا كانوا اهل منعة -

অর্থাৎ কোন বিবদমান দল যদি অনুমতিক্রমে আমাদের কাছে আসে এবং পরে অন্যকোন বিবদমান দেশের লোকদের সাথে মিশে মুসলমানদের

সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সেই দেশে যেতে চায় তা'হলে তাদেরকে সেইদেশে যেতে দেওয়া হবে না। যদিও দু-একজন হয় এবং বাণিজ্যের খাতিরে তাদের নিজেদের দেশ ছাড়া অন্যকোন বিবদমান দেশে যেতে চায় তবে তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে না। কেননা এই সংখ্যায় আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করবে না; তাছাড়া এমনও নয় যে তারা আমাদের কাছে এসে একটা ভয়াবহ সৈন্য বাহিনী গঠন করবে।

৫। কাসানী: ইত্যাদি।

৬। শত্রুদের জোটবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য ছিল যে, কোন্ পক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। আবার কোন্ পক্ষ তা' করে নি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের রচনা: "Some New Developments in the British Conception of Neutrality as Against Muslim Countries" in The Islamic Review (woking) vol. xxxix, No. 8, August 195 pp. 22-3.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিষিদ্ধ কাজ

(৪২১) যুদ্ধকালে শত্রুদের জান-মাল সম্বন্ধে মুসলিম বাহিনীর জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলি নিষিদ্ধ ঃ

(১) অনাবশ্যকভাবে নিষ্ঠুর হত্যা যজ্ঞ। মহানবী (সাঃ) এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্ সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন ; সুতরাং তোমরা যদি হত্যা করো, তাহলে ভালোভাবে হত্যা করো"[১] (অর্থাৎ অকারণ বা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ)।

(২) যোদ্ধা নয়, এমন ব্যক্তিকে[২] হত্যা। যোদ্ধা কেবল তারাই, যাদের যুদ্ধ করার মতো দৈহিক শক্তি আছে। المقاتلة من له بنية صالحة القتال। স্ত্রীলোক,[৪] নাবালক, দাস-দাসী যারা প্রভুদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু যুদ্ধে যোগদান করে না,[৫] অন্ধ,[৬] সাধু[৭] সন্ন্যাসী,[৮] অতিবৃদ্ধ,[৯] যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ,[১০] উম্মাদ কিংবা হতচেতন,[১১]—ইহারাই আইনসম্মত দৃষ্টান্ত।

(৩) যুদ্ধবন্দীদেরকে বিকলাঙ্গ করা চলবে না।[১২] অন্য এক অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে।

(৪) মানুষ ও পশুপাখীর অঙ্গচ্ছেদ।[১৩]

(৫) শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।[১৪]

(৬) ধ্বংসলীলা, ফসল নষ্ট, অনাবশ্যক গাছ কাটা।[১৫]

(৭) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যা বা যবেহ্।[১৬]

(৮) সীমা লঙ্ঘন ও অশিষ্টাচরণ।[১৭]

(৯) বন্দী স্ত্রীলোকদের শ্লীলতাহানি। কোনো স্বাধীন শত্রুপক্ষের স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে শ্লীলতাহানির অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি, বিবাহিত বা অবিবাহিত বিবেচনা করে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কিংবা

বেত্রাঘাত হওয়া উচিত। যা হোক, যদি সে (স্ত্রীলোকটি) বন্দিনী হয়ে থাকে, তাহলে তার শাস্তি বিবেচনার ভিত্তিতে হবে এবং তাকে জরিমানা দিতে হবে مهر مثل (অর্থাৎ যা তার নিকটতম মহিলা আত্মীয়াকে মহরানা স্বরূপ দিতে হত), এবং ইহা সাধারণ গণিমাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৮]

(১০) শত্রুপক্ষের জামিন স্বরূপ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা (নিষিদ্ধ), এমনকি যদিও শত্রু কর্তৃক মুসলিম রাষ্ট্রের জামিন নিহত হলেও এবং যদি স্পষ্ট চুক্তিও থাকে যে, প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তা করা যাবে।[১৯]

(১১) পরাজিত শত্রুর শিরচ্ছেদ করে তার ছিন্ন-মস্তক উর্ধ্বতন মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো অবৈধ ও অপছন্দনীয় مکروہ বিবেচিত হয়। প্রথম খলিফা ইহা নিষেধ করে ফরমান জারী করেন।[২০]

(১২) মহানবীর জীবদ্দশায় একটিও দৃষ্টান্ত নাই যে, কোনো শত্রুকে পরাজিত করে কিংবা কোনো দেশ জয়ের সময় কোনো হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। মক্কা বিজয় তারই জলন্ত উদাহরণ। মক্কার শত্রুদের হাতে মুসলমানদের অশেষ দৈহিক নির্যাতন ও বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও মহানবী মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমা প্রাপ্তদের মধ্যে ছয় জন অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এদের প্রতি এমন নির্দেশ ছিল যে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা ছিল রাষ্ট্রের জন্য মহা অপরাধী, যারা খুন ও ধর্মবর্জন কিংবা অন্যান্য পাপে পাপী ছিল। পরে এদেরকেও ক্ষমা করা হয়েছিল। মহানবীকে পুনর্বার সংবাদ না দিয়ে মুসলমান বাহিনী কেবল তিনজনকে হত্যা করেছিল।[২১]

(১৩) পিতামাতাকে হত্যা, কেবল আত্মরক্ষা ব্যতীত, যদিও তারা অমুসলমান হয় এবং শত্রুপক্ষে থাকে। এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে, মহানবী (সঃ) ঐ সব ব্যক্তিকে নিষেধ করেছিলেন তাদের পিতামাতাকে হত্যা করতে, যখন তারা তাদের পিতামাতাকে ইসলামের বিরোধিতার দরুন হত্যা করতে চেয়েছিলেন।[২২]

(১৪) কৃষকদেরকে হত্যা করা, যদি তারা যুদ্ধ না করে এবং যুদ্ধের ফলাফল যদি এদের সম্বন্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে।[২৩]

(১৫) ব্যবসায়ী, সওদাগর, ঠিকাদার ইত্যাদিকে রক্ষা করতে হবে, যদি তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে।[২৪]

(১৬) বন্দী ব্যক্তিকে বা কোনো প্রাণীকে দগ্ধ করে হত্যা করা। একদা মহানবী এক অপরাধীকে বন্দী করে জীবন্ত দগ্ধ করবার আদেশ দিয়ে একদল ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করালেন এবং অপরাধীকে জীবন্ত দগ্ধ করতে নিষেধ করে তাকে শুধু হত্যা করতে আদেশ দিলেন ; কারণ, তিনি বললেন কেবল আগুনের মালিক আগুনে শাস্তি দিতে পারেন।[২৫]

(১৭) মনে হয় ইসলামের শুরুতে অমুসলমানদের স্বভাব ছিল শত্রু পক্ষের বন্দীদের পশ্চাতে আশ্রয় লওয়া।[২৬] আমি একটিও দৃষ্টান্ত পাই নাই যাতে বলতে পারা যায় যে, মুসলমানরা তাদের নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে বন্দীদের বাধ্য করত।

(১৮) মালেকী মযহাবের ফকিহ খলিল স্পষ্ট বলেছেন যে, বিষাক্ত-তীর ব্যবহার অবৈধ (قتل السم حرام)।[২৭] আমার যতদূর জানা আছে অন্যান্য মযহাবের ফকিহগণ এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন নাই, যেহেতু শত্রুগণ নিজেদের দেশে ঐরূপ অস্ত্র ব্যবহার করত না।

(১৯) চুক্তি অনুসারে নিষিদ্ধ কার্যকলাপ। শায়বানী[২৮] কর্তৃক অনেক কাল্পনিক দৃষ্টান্তের কথা বলা হয়েছে যাতে আমরা জানতে পারি যে, সেকালে সচরাচর অভ্যাস ছিল একমত হওয়া—যুদ্ধ পরিচালনাকালে বন্দীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসলীলা, পানি সরবরাহ বন্ধ ইত্যাদির ব্যাপারে কি করতে হবে বা হবে না।

(৪২২) ইহা লক্ষণীয় যে, চুক্তি মোতাবেক যে সব কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় তা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, যতদিন চুক্তি বলবৎ থাকে।[২৯] অন্যান্য নিষেধসমূহ মুসলিম আইনের বিধি-নিষেধের অন্তর্গত এবং সেগুলো প্রতিশোধ গ্রহণার্থেও বিধেয় হয় না ; সরাসরি অপরাধী ব্যক্তিগণ কেবল অপরাধী হয়, তাদের দেশবাসী অপরাধী বিবেচিত হয় না।[৩০] মুসলমানরা এমন কোনো স্লোগানে বিশ্বাসী হতে পারে না, যাতে বলা যেতে পারে যে, আমরা অন্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ওয়াদা পালন করতে বাধ্য নই"[৩১] যা

কুরআন মোতাবেক ইহুদীরা শিক্ষা দিয়েছে এবং মধ্যযুগে পোপরাও শিক্ষা দিয়েছেন।[৩২]

(৪২৩) মহানবী ও পরবর্তী খলিফাদের আমলে সেনাপতিগণকে যে-সব নির্দেশ জারী করা হয়েছিল, সেগুলির একটি তালিকা এই পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টের মধ্যে পাওয়া যাবে।

টীকা ঃ

১। সহিহ মুসলিম (ইস্তাম্বুল হইতে প্রকাশিত), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭২

২। সারাখশী কৃত মাবসুত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

৩। شرح السير الكبير ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৮।

৪। ঐ, I, 59, 34, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬) المحيط البرهانى

৫। شرح السير الكبير ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৯-৮০।

৬। মাবসুত, ১০ঃ ৬৯

৭। شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।

৮। شرح السير الكبير ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০

৯। মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬।

১০। মাবসুত, ১৫ ঃ ৪৪৩।

১১। شرح السير الكبير ১ ঃ ৭৮ তিরমিযি ১৯ ঃ ৪৮ আবু দাউদ ১৫ ঃ ১১০।

১২। আব্দ আল জলীল ঃ শুয়াব-আল-ইমান ঃ পৃঃ ৫৫৮ অধ্যায় 'ওয়ালা আল আহদ আল মা-আল মুশরিকিন ; (পাণ্ডুলিপিঃ বশীর আসাঃ ইস্তাম্বুল ঃ নং ৩৬৬) রাসূলের সংকলিত রসূলের বাণী। কুরআন ১৭ ঃ ৩৪ ইত্যাদি)

১৩। شرح السير الكبير ঃ ১ ঃ ২৭ ঃ ৩৪, কুরআন ঃ ২ ঃ ২০৫।

১৪। ঐ ঃ ১ ঃ ৩৬।

১৫। شرح السير الكبير ১ : ৩৭

১৬। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, পৃঃ ৮৮।

১৭। ঐ : P. 84 ; সারাখশীকৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯ شرح السير الكبير : ৩য় খণ্ড, ৩৩২-৩৩, ৪র্থ খণ্ড : ৪৩ বালাযুরীকৃত ফুতুহ।

১৮। সারাখশী কৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১ ; شرح السير الكبير (১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮)

১৯। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮১৮-১৯ ; তাবারী, ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৩৯।

২০। شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫-৭৬ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৩, ১৯২।

২১। Idem, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৯, আবুবকর ফরমান ও বাস্তবায়নের জন্য তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২৬, ২০০১ দ্রষ্টব্য, উমরের খেলাফত কালের জন্য তুলনীয় ইবনে রুশদ-এর بداية المجتهد ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১১ দ্রষ্টব্য ; ইয়াহয়া ইবনে আদম এর খারাজ, পৃঃ ৩৪ (Brill থেকে সম্পাদিত) দ্রষ্টব্য।

২২। ইয়াহ্য়া কৃত খারাজ, পৃঃ ৩৪ : عن جابر قال كانو لايقتلون تجار المشركين : আবু রসুল কৃত খারাজ, পৃঃ ১২২ মুসলিম বাহিনীতে অনুরূপ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বাইরে।

২৩। তিরমিযি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮, অধ্যায় الحرب بالكفار شرح السير الكبير (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪) বুখারী, পৃঃ ৫৫ : ১৪৯ : ইবনে হিশাম পৃঃ ৪৬৮-৬৯।

২৪। তুলনীয় আবু ইয়া অলা الا حكام السلطانية পৃঃ ২৭ (পাণ্ডু-লিপি, ইস্তাম্বুল আক্কারা ও দামেশক)। ذقر عن ما سارى للمسلمين এই কথা প্রায়শ : চোখে পড়ে।

২৫। مختصر خليل অধ্যায় জেহাদ ; তুলনীয় Supra অধ্যায় সপ্তদশ পৃঃ ২৮।

২৬। شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০০-০৫, সমসাময়িক খৃষ্টান আচরণের সঙ্গে তুলনীয়, Nys Origines পৃঃ ২২১।

২৭। فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم (কুরআন, ৯ : ৭) المسلمين عند شروطهم (হাদীস السير الكبير شرح এ উদ্ধৃত. ১ম খণ্ড পৃ: ১৮৫)

২৮। কুরআন, ৬ : ১৬৪, ১৭ : ১৫, ৩৫ ; ১৮, ৪৯: ৭, ৬৩ : ৩৮।

২৯। কুরআন, ৩ : ৭৫।

৩০। তুলনীয় Supra, ১ম খণ্ড, ১০ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯ : ১২১-১২২)

চতুর্দশ অধ্যায়

আশ্রয় দান

(৪২৪) আশ্রয় দান সম্বন্ধে কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে : যদি তোমাদের কোনো মিত্র (বিধর্মী) তোমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করে বা তোমাদের হেফাযত চায়, তাহলে (হে মুহাম্মদ) তাকে রক্ষা করো, যাতে সে আল্লার কথা শুনতে পায় এবং অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।[১] একে ফকিহ্গণ এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

الأمان التزام الكف عن العرض لهم بالقتل والسبي حقا الله تعالى -

অর্থাৎ—আশ্রয়দান অর্থে তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা (অর্থাৎ যুদ্ধমান পক্ষের কথা বলা হচ্ছে)—আল্লাহ্র নামে তাদেরকে হত্যা বা বন্দী না করা।[২]

(৪২৫) শত্রুপক্ষকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে, যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে তা যাচঞা করে। যদিও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ হয়, তাহলে তারা যুদ্ধবন্দী বলে গণ্য হবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি গনিমত বলে বিবেচিত হবে। ইহা সাধারণতঃ ঘটে তখন, যখন তারা অবরুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধকালে চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। শর্তাধীন আত্মসমর্পণ হলে, যাকে ইংরেজীতে capitulation বলা হয়ে থাকে এবং বিজয়ী যদি শর্তগুলো মানতে রাজী হয়ে থাকে, তাহলে সেই শর্তগুলো বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে হবে এবং মুসলমান বা তাদের শর্তাবলী মোতাবেক কাজ করবে (والمسلمون عند شروطهم)[৩]

(৪২৬) শত্রুপক্ষ আশ্রয় না চাইলেও সাধারণ ঘোষণার দ্বারা তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। অতএব মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা কাবার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করবে, অথবা তাদের দলপতি বা সর্দার আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে কিংবা তাদের দরজা বন্ধ করে রাখবে,[৪] কিংবা তাদের অস্ত্র ত্যাগ কর্‌বে,[৫] তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। এই সাধারণ ঘোষণার আওতা থেকে কিছু বাদ পড়ত যারা অসামরিক কোনো অপরাধে অপরাধী হত।

(৪২৭) আশ্রয়দানের পদ্ধতি ও ঘোষণার ভাষা মুসলমান ফকিহ্‌গণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন,[৬] যা প্রমাণ করে যে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদিত হতো তা কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁরা কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

(৪২৮) প্রায়শঃ যে হাদীস উদ্ধৃত হ'য়ে থাকে সে অনুসারে এমন কি যদি নিকৃষ্টতম কোনো মুসলমান আশ্রয় দেয় তাও গোটা মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে।[৭] সুতরাং এই অধিকার কেবল সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় যোদ্ধাদের জন্যই নয়, যুদ্ধে অক্ষম,[৮] পীড়িত, অন্ধ,[৯] এমন কি ক্রীতদাসগণের জন্যও এই অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে।[১০] মহানবী (সাঃ) একাধিকবার স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক আশ্রয়দানকেও সমর্থন করেছিলেন।[১১] স্বাভাবিকভাবে নাবালক, উন্মাদ এবং যারা শত্রুদের অধীনস্থ (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বন্দীগণ, পর্যটকগণ ইত্যাদি) এই নিয়মের ব্যতিক্রম,[১২] যতোক্ষণ তারা অমুসলিম এলাকায় অবস্থান করে। তাদের অক্ষমতা বা অযোগ্যতার অবসান হয়ে থাকে যখন তারা অমুসলিম এলাকার বাইরে চলে আসে, অর্থাৎ সে স্থান যখন মুসলিম এলাকা কিংবা কারো অধিকারভুক্ত না হয়। (তুলনীয় Supra, ২য় ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, শেষ অনুচ্ছেদ)।

(৪২৯) মুসলমান বাহিনীর অমুসলমান সৈন্যগণ, মিত্রপক্ষ বা অন্য কেহ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলমান প্রজাগণ আশ্রয়দান করার অধিকার পায় না,[১৩] তবে যোগ্য মুসলমানদের সমর্থন পেলে অধিকার লাভ করতে পারে।[১৪] ইহা স্বীকৃত সত্য যে, মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আদেশ

জারী করতে পারতেন যে, সেনাপতি ব্যতীত কোনো মুসলমান কোনো শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারবে না। ঐরূপ অগ্রিম কোনো নির্দেশ না থাকলে কোনো মুসলমানের নিকটে আশ্রয়ের আবেদন করার অধিকার থেকে শত্রুকে বঞ্চিত করা যাবে না।[১৫] মহানবী কর্তৃক ঘোষিত মদিনার নগর-রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের আশ্রয় দান করার সাধারণ অধিকারের কিছু ব্যতিক্রমের উল্লেখ আছে এবং নগর-রাষ্ট্রের আরব বা ইহুদী নাগরিকদের মধ্যে কেউই কোরেশ ও তাদের মিত্রগণকে রক্ষা করতে পারত না।

(৪৩০) সঙ্গত কারণের জন্য আশ্রয় বাতিল করা যেত কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই শত্রুকে আশ্রয় দেওয়ার প্রাক্কালে যে নিরাপত্তা ও প্রতিরোধের অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।[১৬]

(৪৩১) আশ্রয় সাময়িক বা শর্তসাপেক্ষ হতে পারে। মহানবী (সঃ) মুআবিয়া ইবনে মু গীরাকে তিন দিন সময় দিয়েছিলেন মদিনা ত্যাগ করতে।[১৭] খায়বারের ইহুদীগণকে বলা হয়েছিল, যদি তাদের সম্পত্তি তারা গোপন করে তাহলে তাদের আশ্রয় থেকে তারা বঞ্চিত হবে।[১৮]

(৪৩২) কোনো কোনো সময়ে অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকেও আশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে এবং আস্থা সৃষ্টি করার জন্য জরুরী নিশ্চয়তাও প্রদান করা হয়ে থাকে। ঐরূপ একটি উপলক্ষে মহানবী তাঁর শিরস্ত্রাণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[১৯]

(৪৩৩) যদি কোনো আশ্রিত যুদ্ধরত ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে নির্যা-তীত হয়, সে তার ক্ষতিপূরণ দাবী কর্তে পারে।[২০] হযরত (সাঃ) জীবদ্দশায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনু আমীর গোত্রের দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা মদিনার বনু নাযির গোত্রের সংগে যুদ্ধ হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।[২১]

(৪৩৪) সাধারণতঃ আশ্রয় কড়াকড়িভাবে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে এবং তা হস্তান্তরিত বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যায় না। যদি স্পষ্ট উল্লেখ না থাকে তাহলে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তি তো দূরের কথা, তার পরিবারবর্গকেও রক্ষা করা যেত না। ইহা অবশ্য সত্য ছিল

যখন সে সমূহ বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থাক্‌ত।[২২] পক্ষান্তরে যখন কেহ স্বগৃহে নিরাপদে থাকত এবং আশ্রয় চাইত তখন আশ্রয়ের অধিকার স্বাভাবিকভাবেই জীবন, ধনৈশ্বর্য, স্ত্রী, নাবালক পুত্রকন্যা, অনূঢ়া কন্যা, ভগ্নী, মাতা, মাতামহী এবং মাতা ও পিতা উভয় কুলের আত্মীয়াদের (খালা, ফুফু ইত্যাদি) উপর বর্তাতো।[২৩] প্রাচীন ফকিহগণের সময়ে ব্যবসায়ের লাইসেন্সের বেলায় ক্রীতদাস, ভৃত্য ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হত।[২৪]

টীকা ঃ

১। কুরআন, ৯ ঃ ৬

২। সারাখ্‌শী (شرح السير الكبير), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৯।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫, মহানবীর সুন্নাহ্ অনুসারে।

৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮১৪।

৫। সারাখ্‌শী কৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯, দাবুসী কৃত আসরার, fol. 1466 (পাণ্ডুলিপি, ওলিউদ্দিন, ইস্তাম্বুল, নং ১৫০২ ঃ মসুদী কৃত তাম্‌বিহ, পৃঃ ২৬৭ ; আবু য়ূসুফী কৃত খারাজ, পৃঃ ১৩১, কুদামা ইবনে জাফর কৃত খারাজ, ১৯ অধ্যায় (পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল)।

৬। সারাখ্‌শী কৃত (شرح السير الكبير) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-৩৬২ فتاوى عالمگیر

৭। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮-৬৯।

৮। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ ; কাসানী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

৯। ঐ—

১০। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১-৭২, খলিফা উমরের কালে জুবদেশাহপুর সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখপূর্বক। তাবারীর ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬৭-৬৮ দ্রষ্টব্য।

১১। সারাখ্‌শী شرح السير الكبير, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১—৯২,

তিরমিযি, ২য় খণ্ড, অধ্যায় امان الطراة خراج لابي يوسف পৃঃ ১২৭

১২। সারাখশী, شرح السير الكبير, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২ ; মাবসুত ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৭১।

১৩। সারাখশী, شرح السير الكبير, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২।

১৪। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯১—৯২।

১৫। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৯।

১৬। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭।

১৭। ইবনুল আসির কৃত কামিল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৭—২৮ (ওহুদের যুদ্ধের পর), شرح السير الكبير, ১মখণ্ড. পৃঃ ৩২৮।

১৮। সারাখশী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫—৮৭।

১৯। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮৫।

২০। ذخيرة برهانية, অধ্যায় একাদশ (مسائل الامان)

২১। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৫২ , ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ৪০—৪১ ; তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪৯।

২২। রাযিউদ্দিন আস-সারাখ্‌শী কৃত মুহীত, ১ম খণ্ড, Sul, 6026-603a), পাণ্ডুলিপি. ওলিউদ্দিন।

২৩। প্রাগুক্ত, সারাখশী شرح السير الكبير ১মখণ্ড. পৃঃ ২৩৩—৩৮।

২৪। প্রাগুক্ত, সারাখ্‌শী।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ

(৪৩৫) এই বিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—শত্রু কর্তৃক বন্দী মুসলিম সেনাবাহিনী কিংবা অন্যান্য প্রজাগণ এবং মুসলমানদের হাতে অমুসলিম রাষ্ট্রের বন্দী প্রজা ও সৈনিকগণ।

১। মুসলমান বন্দিগণ :

(৪৩৬) কোন মুসলমান বন্দী তার মর্যাদা ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সংগে রক্ষা করবে।[১] যদি সে প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকে তাহলে যদি সে চায় এবং সক্ষম হয়, সে পলায়ন করতে বা তার বন্দীকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।[২]

(৪৩৭) মুসলিম প্রজাদের বেলায় মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে জনসাধারণের কোষাগার (বায়তুলমাল) থেকে অর্থ দান করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা।[৩] কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের আয়ের কিয়দংশ ব্যয় করা হবে কিছু মস্তক[৪] রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ বন্দী ও দাসগণকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।[৫] এই মর্মে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। উদাহরণ স্বরূপ : "বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করো" (فكوا العانى)।[৬] বাস্তবের কথা বলতে গেলে আমি মহানবীর আমলে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাই না যে, মুসলিম বন্দীদের মুক্তির জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছিল। যাহোক ; বন্দী বিনিময়ের কথা পরে আলোচনা করা হবে। খলিফা উমর হুকুম দিলেন : অমুসলমানদের হাতে প্রত্যেক বন্দী মুসলমানকে মুসলিম 'বায়তুল মাল' হতে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে হবে।[৭] পরবর্তী কালে আল মাস্‌উদী ও আল-মাকরিযি

অনুসারে অর্ধডজনেরও অধিক মুসলমান বন্দী তাদের শত্রুর কবল হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।[৮] বিদেশী ঐতিহাসিকগণও এর উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফিনলে (Finlay) বলেন: "৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চতম কনষ্টানটাইনের রাজত্বকাল থেকে মুসলমানদের সঙ্গে বন্দী রীতি-মতো বিনিময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বন্দী বিনিময়ের চুক্তিতে একটি নূতন শর্ত যোগ করা হয়েছিল যার ফলে চুক্তিতে যোগদানকারী দুই পক্ষকে প্রতি ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট অর্থদানের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় স্বীকৃত হতে হয়েছিল।"[৯]

(৪৩৮) তাদের উইল ও দানপত্র মুসলিম এলাকায় গ্রাহ্য হবে মুসলিম এলাকাধীন মৃত মুসলিম সৈনিকদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে।[১০]

২। মুসলমানদের হাতে শত্রু বন্দিগণ:

(৪৩৯) বন্দী করা সম্পর্কে কুরআনে দুইটি আয়াত আছে:

ক) যখন তোমরা বিধর্মীদের যুদ্ধে মোকাবেলা করো, তাদেরকে আঘাত করো—যে পর্যন্ত তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে না পারো; অতঃপর চুক্তিকে দৃঢ় করো, এবং তারপর হয় করুণা করো নতুবা যুদ্ধের অবসান হলে তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করো[১১] (৪৭: ৪)।

খ) যতক্ষণ শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে না পারো নবীর পক্ষে বন্দী করা সঙ্গত নয়[১২] (৮: ৬৭)।

গ) এই দুই আয়াতে اثخن ক্রিয়াটি দেখা যায়, যার অর্থ পর্যুদস্ত করা, প্রভাব বিস্তার করা, বশীভূত করা। তুলনীয় তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫৫ এবং একই লেখকের লেখা তাফসীর। আলমাতুরিদী (মৃত্যু: ৩৩৩ খ্রী:) কৃত تاويلات القران গ্রন্থটিও দ্রষ্টব্য। ইনি শেষ আয়াতটির তাফসীর করেছেন এ ভাবে:

حتى يثخن فى الارض اى يغلب - حتى اذا اخذ الفداء و سرحهم بعد ما غلب فى الارض ليكون رجوعهم الى غير منفعة و مركة (مخلوطة لا له لى فى استانبول)

অর্থাৎ যখন দেশে তিনি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন বা তিনি

এর উপর প্রভাব বিস্তার করেন তখন দেশটির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর যখন মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে মুক্ত করে দেন, তখন তারা এমন এক স্থানে যায় যেখানে তাদের কোনো লাভ হয়না এবং তাদের কোনো সংগী-সহচরও থাকে না।

(৪৪০) মুসলিম আইন অনুসারে কোনো বন্দীকে হত্যা করা চল্‌বে না। ইবনে রুশ্‌দ এ বিষয়ে রাসূলের সাহাবীগণের মতৈক্যের উল্লেখ করেছেন।[১৩] ইহা দ্বারা একথা বলা হচ্ছে না যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারের বাইরে কোনো অপরাধের জন্য বন্দীকে শাস্তি দেওয়া চল্‌বে না। এর প্রমাণ স্বরূপ মহানবীর জীবদ্দশায় তাঁরই আদেশে বদর যুদ্ধে ধৃত দু'জন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল আমরা জানি।[১৪] মুসলমান ফকিহগণ স্বীকার করেন যে, বন্দীকে যুদ্ধ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দায়ী করা চল্‌বে না :

وكذالك اهل الحرب لا يضمنون بالا اجماع ما اتلفوا علينا من
الاموال و النفوس و ان اسلمو او صار وا رسة لنا و يلهم و تدرينهم
و منعتهم و كانوا كالمسلمين و كذالك اخذالمال -

অর্থাৎ—অনুরূপভাবে মুসলমানদের জীবন ও ধনসম্পত্তির ক্ষতির জন্য যোদ্ধাদেরকে দায়ী করা হবে না বলেও মতৈক্য পাওয়া যায়। ইহা সত্য হবে যদি তারা ইসলাম কবুল করে কিংবা মুসলমান প্রজাগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ তারা ইহা করত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের তাকিদে এবং যেকালে তাদেরকে এর জন্য বিধান দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই দিক থেকে তাদের অবস্থা মুসলমানদের অবস্থার অনুরূপ। সম্পত্তি দখল সম্পর্কেও ঐ একই নীতি সত্য।[১৫]

(৪৪১) বন্দীকালে ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মহানবী আদেশ দিয়েছিলেন : বন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের সুপারিশ সম্পর্কে সতর্ক হও।[১৬] (استوصو بالاسارى خيرا)। ফলে অনেক মুসলমান সৈনিক খেজুর আহার

করিয়া পরিতৃপ্ত হতেন এবং তাঁদের অধীনস্থ বন্দীদের রুটি আহার করাতেন।[১৭] আবু য়ুসুফ বলেছেন, বন্দীদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সুখাদ্য দিতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে।[১৮] তাদের আহারের বিনিময়ে মূল্য লওয়া চল্‌বে না এবং সে মূল্য বন্দীকারী মুসলমানদের রাষ্ট্র বহন করবে।[১৯] কুরআনে নির্দেশ আছে—"শোন, ধার্মিকগণ জান্নাতে যাবে, কারণ তারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট ব্যাপক এবং যারা অভাবগ্রস্ত, দুঃস্থকে, অনাথ বা এতিমকে এবং বন্দীকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার দরুন আহার করায় এবং বলে, আমরা আল্লাহ্‌র মহব্বতে তোমাদেরকে আহার করাই এবং তোমাদের নিকট থেকে কোন পুরস্কার বা ধন্যবাদ আমরা কামনা করি না।"[২০] বন্দীগণকে উত্তাপ ও শৈত্য ইত্যাদি থেকে রক্ষা করতে হবে। মহানবীর দৃষ্টান্ত অনুসারে তাদের বস্ত্র না থাকলে তাদেরকে বস্ত্র দান করা হত[২১] যদি তারা কোন অসুবিধা বা কষ্ট ভোগ করে, যথাসম্ভব তা দূরীভূত করতে হবে, যেমন মহানবীর অভ্যাস ছিল।[২২] নিজ গৃহে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করার জন্য তার উইল করারও অধিকার আছে।[২৩] এই সব কথা যথারীতি শত্রু কর্তৃপক্ষকে অবগত করানো হবে। বন্দীদের মধ্যে কোনো মাতাকে তার সন্তান থেকে পৃথক করা চলবে না,[২৪] অথবা কোনো আত্মীয়কে অন্য আত্মীয় থেকেও পৃথক করা চলবে না।[২৫] ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্দীদের মান মর্যাদাকে রক্ষা করতে হবে[২৬] রসূলের এক হাদীসও আছে "কোনো জাতির সম্মানিত ব্যক্তিকে, যদি সে অপমানিত হয়েও থাকে, সম্মান করো।"[২৭] প্রাচীন ইসলামের ইতিহাসে বন্দীদের নিকট জবরদস্তি কাজ নেওয়া হয়েছে, এমন কোনো নযীর নাই। যদিও তারা পলায়নের চেষ্টা করত, কিংবা নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করত, তাহলে তাদেরকে দণ্ড দেওয়া হত।[২৮] যদি তারা পালিয়ে নিরাপত্তা ভোগ করতে পারত এবং পুনরায় ধৃত হত, সেক্ষেত্রে প্রথমবার পলায়নের অপরাধে তাদর শাস্তি দেওয়া হত না।[২৯] তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে স্বতন্ত্র কথা।

(৪৪২) মুসলিম আইন অনুযায়ী সেনাপতির উপর ভার দেওয়া হয় বন্দীদের সম্বন্ধে তিনি কি সিদ্ধান্ত করবেন (ক) শিরশ্ছেদ করবেন, (খ) দাসে পরিণত করবেন, (গ) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দান করবেন, (ঘ) মুসলিম বন্দীদের সাথে বিনিময় করবেন, অথবা (ঙ) বিনা অর্থে মুক্তি দেবেন। আমরা পৃথকভাবে তা আলোচনা করব।

(ক) বন্দীদের শিরশ্ছেদকরণ

(৪৪৩) আমরা দেখেছি, বন্দীরা আত্মসমর্পণের শর্ত অনুসারে ব্যবহার পেয়ে থাকে। বিনাশর্তে সমর্পণের ক্ষেত্রে পূর্বেকার যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। নিঃসন্দেহে অন্য অপরাধের দরুন মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। আবু ইউসুফের মতানুসারে কেবল ইসলামের খাতিরে কোনো বন্দীর শিরশ্ছেদ করা যেতে পারে, যদিও তিনি অনেক বিশারদের অভিমত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, সেই শিরশ্ছেদ করণকে তাঁরা অপছন্দ (মকরূহ) করতেন।[৩০] সারাখ্শীর মতানুসারে এমনকি প্রধান সেনাপতিও তা করতে পারতেন না ; একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানই নির্দিষ্ট বন্দীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন।[৩১] আমরা দেখেছি যে, সাহাবীদের মধ্যে একমত ছিল যে, বন্দীদের শিরশ্ছেদ করা হবে না।[৩২] সংক্ষেপে বলা যায় যে, যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদিত হতে পারে অতিরিক্ত প্রয়োজনের তাকিদে এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণে।

(খ) দাসত্বে পরিণত করা

(৪৪৪) কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যাতে দাসত্বের আদেশ সোজাসুজি পাওয়া যায়, তথাপি কিছু পরোক্ষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

'হে নবি শুনুন! আপনার জন্য ঐ সব স্ত্রীলোককে হালাল করেছি যাদের যৌতুক বা মহরানা আপনি দান করেছেন এবং ঐ সব স্ত্রীলোকও যাদের উপর আপনার দক্ষিণ হস্তের অধিকার বর্তেছে ; তারা ঐসব স্ত্রীলোক : যাদেরকে আল্লাহ আপনাকে গনিমাতস্বরূপ দান করেছেন।'—[৩৩] (৩৩ : ৫০)।

(৪৪৫) হযরতের জীবনে, অল্প হইলেও দৃষ্টান্ত রয়েছে। বনু কায়নুকা নামক ইহুদী গোত্রের স্ত্রীলোক ও পরিবারবর্গকে তাদেরই নির্ধারিত বা মনোনীত সালিসের রায় অনুসারে গনিমাতের মতো দাসে পরিণত করে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।[৩৪] এই সালিসের রায় ইহুদীদের আইন অনুসারে হয়েছিল।[৩৫] অষ্টম হিজরীতে হওয়াযিন নামক আরব গোত্রের বন্দীদেরকে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের আবেদনের ফলে মুক্তি দেওয়া হয়। এই মুক্তি তারা অধিকার হিসাবে পায় নাই। কিন্তু মুসলমান সৈনিকগণ মহানবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। আর যারা আযাদী দিতে চায় নাই তাদেরকে বায়তুলমাল থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত।[৩৬] ইহার কিছু পূর্বে বনু মুসতালিক নামক আরব গোত্রটি মুসলিম বাহিনীর নিকট তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময়ে মহানবী বন্দীদের ভিতর থেকে এক বালিকাকে বিবাহ করেছিলেন—তাকে মুক্তি দেওয়ার পর, এই বালিকাটি ছিল গোত্রের সর্দারের কন্যা। এবং মুসলিম বাহিনী সমস্ত দাসদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।[৩৭] বনুল আমবার গোত্রের বন্দীগণকে বিনা মুক্তিপণে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করা হয়েছিল।[৩৮]

(৪৪৬) মহানবীর নীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল যখন তিনি আদেশ জারী করলেন: আরবদের কাউকে দাসে পরিণত করা যাবে না (لارق على عربى)।[৩৯] খলিফা উমর ফরমান জারী করলেন যে, যুদ্ধরত এলাকার কৃষক, শিল্পী, কারিগর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীকে দাসে পরিণত করা উচিত হবে না।[৪০] কুরআনে দাসমুক্তির জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।[৪১] এবং বিধান দেওয়া হয়েছে যে, দাস মুক্তির জন্য মুসলমান রাষ্ট্রের কিছু অর্থ ব্যয় করা হবে।[৪২] অপর একটি আয়াতের[৪৩] ব্যাখ্যা করে খলিফা উমর[৪৪] বলেছেন যে, যদি কোনো মুসলিম ক্রীতদাস কাজ করে তার প্রভুকে মুক্তির বিনিময়ে অর্থ দান করে তাহলে তার প্রভু তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

(৪৪৭) এরূপে ইহা মন্তব্য করা যেতে পারে যে, যদিও ইসলাম দাসত্বকে হ্রাস করার চেষ্টা করেছে তথাপি ইহাকে নির্মূল করার চেষ্টা করে নাই। অবশ্য সর্বদা যুদ্ধবন্দিগণকে দাসে পরিণত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবু ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রধান সেনাপতিই স্থির করেন ঃ বন্দিগণকে দাসে পরিণত করবেন না অন্য কোনো ব্যবহার তাদের প্রতি করবেন। তবে একটি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না; ইসলামে দাসত্ব এবং অন্য সভ্যতায় যে দাসত্ব থাকে, তা এক জিনিস নয়। কারণ একজন মুসলমানের ক্রীতদাসের খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের বেলায় তার প্রভুর সংগে সমান অধিকার ভোগ করে। ইহা অনস্বীকার্য যে, ইহা অমুসলমানগণকে ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে একটি সহজ উপায় ছিলএবংউহা ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের একটি প্রধান নীতি।[৫২]

(৪৪৮) এইমাত্র আমরা দেখেছি যে, নর বা নারী বন্দীকে দাস বা দাসীতে পরিণত করা বাধ্যতামূলক নয়। পক্ষান্তরে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করা অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করা দুইটি বিকল্প পন্থা—কুরআন অনুযায়ী সম্ভবতঃ তাদের জন্য বাছাই করে লওয়ার জন্য (৪৭ ঃ ৪)। অবশ্য একতরফা এইরূপ আচরণ বন্ধ করা সহজ নয়, যদি প্রতিপক্ষ ঐরূপ করতে ইচ্ছুক না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইবনে জুবায়ের তার 'রাহ্‌লাত' নামক পুস্তকে জীবন্ত ও লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় ইতালীর বাজারে বন্দী মুসলমান নারী ও শিশুদের দাস-দাসী হিসাবে বিক্রয় হতে তিনি মক্কায় যাওয়ার পথে দেখেছিলেন। তথাপি ইসলাম দাস-দাসীদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং হবহাউস তাঁর Morals in Evolution পুস্তকটিতে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নাই যে, অমুসলিম দেশসমূহে, এমন কি খৃষ্টানদের মধ্যেও দাস-দাসীদের সঙ্গে উন্নততর ব্যবহারের প্রচলন বিশেষভাবে ইসলামী প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

(৪৪৯) যদি অবশ্য কর্তব্য নয় বলে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ইহা ত্যাগ করেন, তাদের কোনো অপরাধ হবে না এবং সেজন্য আইনের খেলাফ ও হবে না। বস্তুতঃ ইহা তাদের আদর্শ। যা হোক,

এ ভুললে চলবেনা যে, কোনো দেশ বা কালের মুসলমান কোনো অধিকারের দাবী ছেড়ে দিলে আল্লার আইন রদ হয়ে যায় না ; এবং যদি কোনো না কোনো কারণে অন্যান্য মুসলমানরা একে আবশ্যক মনে করে—একে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে, তবে তারাও আইনভঙ্গ করবে না।

(৪৫০) বাস্তবিকপক্ষে এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মানবতার খাতিরে দাসপ্রথা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোনো জাতি মনে করে যে সমস্ত বিদেশী অস্পৃশ্য এবং জীবজন্তুর চেয়ে মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং সেই সঙ্গে মানবতার উপদেশ বা আদর্শের প্রতি কর্ণপাত না করে, অথবা যদি এক বর্ণের মানুষ বিধাতার সৃষ্ট অন্য বর্ণের মানুষের প্রতি অতিরিক্ত বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করে,—মানবতার খাতিরে সেইরূপ মানবতা বিরোধী জাতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং তাদেরকে দাসে পরিণত করা এবং ঐ জাতির অধীনে তাদের রাখা উচিত যাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য নাই অথবা জাতিগত বা ভাষাগত বিদ্বেষ নাই। আমরা আশা কর্‌ব এমন অবস্থার সৃষ্টি যেন না হয়।

(৪৫১) ইসলামে দাসত্ব সংক্রান্ত আইনের জন্য আমি উসমানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত নিবন্ধ روسی اور اسلامی ادارہ غلامی পাঠ করতে বলি। এতে একটি গ্রন্থপঞ্জীও আছে ; আমার নিবন্ধ "Slavery In Islam" (ইসলামে দাসত্ব) দেখ্‌তে বলি, যে Ramadan Annual of Muslim Digest-এ ১৯৬০ সালে দারবানে রজত জুবিলি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(গ) মুক্তিপণ

(৪৫২) কুরআনে মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ৪৭ : ৪) এবং মহানবীর জীবনে বিভিন্ন প্রকার মুক্তিপণ ও ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, মুসলমান বালকদেরকে লেখাপড়া তাদের

শেখাতে হতো[৪৬] ; কখনো কখনো স্বর্ণ বা রৌপ্য আদায় করা হতো [৪৭], আবার কোনো সময়ে বর্শা[৪৮] এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করা হতো। এ আমাদের দেখার দরকার নাই। সেই মুক্তিপণ বন্দীর নিজস্ব টাকা থেকে অথবা তাদের বন্ধুবান্ধব কিংবা সরকারের কাছে থেকে দেওয়া হতো। খলিফা দ্বিতীয় উমর বাইযানটাইনদের কাছে থেকে মালাতিয়া নগরীর বিনিময়ে পুরা এক লক্ষ বন্দী মুক্ত করে দিয়েছিলেন।[৪৯]

(ঘ) বন্দী বিনিময়

(৪৫৩) মহানবীর জীবনে বিশেষ এক প্রকার মুক্তিপণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ঃ কখনো এক জনের বিনিময়ে একটি [৫০] ও একাধিকের জন্য একটি মুদ্রা গ্রহণ করা হত।[৫১] পরবর্তীকালে একসঙ্গে হাযার হাযার বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার মতো জটিল প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। কোনো কোনো সন্ধিতে বন্দীদের মুক্তিপণের পরিমাণ নির্দিষ্ট অর্থে নির্ধারিত হত।[৫২]

(৪৫৪) ইহা স্বাভাবিক যে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বন্দীদের পরিবহনের জন্য গাড়ীর চলাচল যাকে cartel বলা হত— নিরাপত্তা দেওয়া উচিত।[৫৩]

ইহাও স্পষ্ট যে, এই নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবহনকালে তারা যেন শত্রুতা-পূর্ণ কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ না করে, যাতে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

(ঙ) বিনা পণে মুক্তি ঃ

(৪৫৫) আল-কুরআনে ইহার বিধান আছে, যখন শত্রুতার অবসান হয়ে যায় (দ্রষ্টব্য ৪৭ : ৪)। মহানবীর জীবনে এর দৃষ্টান্ত কম নয়। বদরের যুদ্ধ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শঃ ঐরূপ বিনা পণে মুক্তি দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৫৪] মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধারণ করবে না এই প্রতিশ্রুতিতে মুক্তির দৃষ্টান্তও মিলে [৫৫]।

(৪৫৬) বিজয়ীদের মধ্যে গনিমতের বণ্টনের পূর্বে, যে গনিমতের মধ্যে মুসলিম আইন অনুসারে বন্দীও শামিল থাকে, সেনাপতি ইচ্ছামতো

বন্দীদের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য স্বাধীনতা ভোগ করেন[৫৬]। কিন্তু তাদের দাসে পরিণত করার ও বণ্টন করে দেওয়ার পর গ্রহীতার সম্মতি[৫৭] প্রয়োজন। সেনাপতির ঐ সমস্ত কাজে তাদের ব্যবহার করতে পারেন যাতে দাসে পরিণত বন্দীদের মালিকের বিপুল ক্ষতি না হতে পারে। হাওয়াযিন বন্দীদের ক্ষেত্রে একটি ভালো দৃষ্টান্ত আছে : মহানবী (সঃ) বায়তুল মাল থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা ঐ সব ব্যক্তিদের দান করেছিলেন, যারা তাদের গনিমত প্রাপ্ত ক্রীতদাসদিগকে ছাড়তে সম্মত হয় নাই।[৫৮]

———

টীকা ঃ

১। সারাখ্শী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৩, মহানবীর জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯।

৩। আবু য়ূসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ১২১।

৪। কুরআন, ৯ ঃ ৬০।

৫। কুরআনের যে কোনো তাফ্সীর দ্রষ্টব্য। ইবনে তাইমিয়াও দ্রষ্টব্য—মন্তব্য উদ্ধৃত, পৃঃ ১৭।

فی الرقاب یدخل فیه اعانة المکاتبین وافتداء الاسری

অর্থাৎ, 'মস্তক বা ঘাড় বাঁচানোর মধ্যে মুক্তিপণ দ্বারা দাস ও বন্দীগণের মুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা।'

৬। বুখারী, ৫৬ ঃ ১৭১।

৭। আবু য়ূসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ১২১।

کل اسیر کان فی ایدی المشرکین من المسلمین ففکاکه من بیت مال المسلمین -

অর্থাৎ, 'প্রতিটি মুসলমান বন্দীর মুক্তিপণ (مال المسلمین) বায়তুল মাল থেকে দিতে হবে।'

৮। মাকরিযি কৃত খিতাত, অধ্যায়—দারুস—সানাআ' ইবনুল আসিরের কামিল, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, ৩২৬ ; মাসুদী কৃত তামবিহ্ পৃঃ ১৮৯—৯০ দ্রষ্টব্য।

৯। Finlay, History of the Byzantine Empire (ed. 1853), I, 106 ; Khuda Bakhsh, von kremer এর ইংরেজী অনুবাদ, পৃঃ ৩২৩ এর টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। সারাখ্শী شرح السير الكبير, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

১১। ঐ ৪৭ : ৪।

১২। ঐ ৮ : ৬৭।

১৩। بداية المجتهد ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১ (সম্পাদনা মুস্তাফাবাবী প্রেস)।

১৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৫৮। উভয়ে ইসলামের মারাত্মক শত্রু ছিল ; তাহাদের মুক্তি ইসলামের জন্য সাংঘাতিক বিপদজনক ছিল।

১৫। দাবুসী, আসরার, পৃঃ ১৪৮।

১৬। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩৭—৩৮।

১৭। প্রাগুক্ত।

১৮। খারাজ, পৃঃ ৮৮।

১৯। প্রাগুক্ত।

২০। কুরআন, ৭৬ : ৫—৯।

২১। বুখারী, ৫৬ : ১৪২ ইবনে সাদ, ২।১, পৃঃ ১১১।

২২। ইবনুল আসিরের কামিল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯, বদরের যুদ্ধবন্দীগণ ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য - যে কোনো সীরাত গ্রন্থে।

২৩। সারাখ্শী شرح السير الكبير চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪১—৪৩।

২৫। মুকডিকাসের কন্যার প্রতি ব্যবহার প্রসঙ্গে মাক্রিযি কৃত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৭ : تحفة الأحباب (বার্লিন পাণ্ডুলিপি) ; ইত্যাদি।
ان لا ولا والمكوك شاذا ليس لغير هن

২৬। জাহিয البيان والتبيين ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২ (ارحموا عزيز قوم ذل) ইবনেআসফির—(اذا اتاكم كرايم قوم فاكرموه)

২৭। জাহিয, البيان و التبيين ১ : ২২ (ارحموا عزيز قوم ذل) ইবনে আসাকির ; اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه

২৮। এইসব বিষয়গুলি সেনাপতির ইচ্ছাধীন।

২৯। প্রগুক্ত।

৩০। খারাজ, পৃঃ ১২১।

৩১। ঐ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩—১৪।

৩২। ইবনে রুশ্‌দ بداية المجتهد ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১ (সম্পাদনা মুস্তাফাবাবী প্রেস)।

৩৩। কুরআন ঃ ৩৩ ঃ ৫০।

৩৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৮৯।

৩৫। Deuteronomy, xx, 10—14,

৩৬। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৭৭-৭৮ ; তাবারী ও অন্যেরা।

৩৭। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭২৯।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮৩।

৩৯। সারাখ্‌শী কৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

৪০। কানযাল—উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪।

৪১। কুরআন, ৯০ ঃ ১৩, ২ ঃ ১৭৭ ; দাসদের মুক্তি অনেক পাপের ক্ষমা হিসাবে ধরা হত—কুরআন ৪ ঃ ৯২, ৫ ঃ ৮৯, ৫৮ ঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

৪২। কুরআন, ৯ ঃ ৬০।

৪৩। কুরআন ২৪ ঃ ৩৩।

৪৪। শিবলী আল—ফারুক (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا)

৪৫। নিজাম বাহাদুর কর্তৃক ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত জায়গীর পণ্ডিচেরির সেরেস্তায় সংরক্ষিত আছে যে, ফরাসী সম্রাট এই মর্মে হুকুম দিয়েছিলেন যে, ফরাসী অধিকৃত এলাকার সমস্ত লোকই তাদের ক্রীতদাসদেরকে খামখেয়ালীপূর্ণ শাস্তির যন্ত্রণা হিসেবে অল্প সময়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে বাধ্য হবে। No. 29 Editdu Roy donny a Versailles an mois de Mars, 1724. art 2 তুলনীয়। সকল ক্রীতদাসকে ক্যাথলিক, খৃষ্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত রোমীয় ধর্ম (খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত করার রোমীয় প্রথা) সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাদেরকে দীক্ষিত করতে হবে। যারা নিগ্রো কিনবে, সেইসব ব্যবসায়ীদেরকে আমরা নির্দেশ

দান করি যে, যেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয় এবং যথাসময়ে তাদের ইচ্ছামত শাস্তির দণ্ডের এলান হিসাবে তাদেরকে দীক্ষিত করে। ইণ্ডিজ কোম্পানীর ডাইরেক্টর জেনারেল ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন যথাযথভাবে এই হুকুম পালন করেন। ইহা ডুপ্লেইক্স ও অন্যান্যদের দ্বারা চুক্তি সাধিত হয়। কিন্তু ইসলাম এমনকি ক্রীতদাসকেও ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে বাধ্য করে না।

৪৬। ইবনে সা'দ, ২/১, পৃঃ ১৪, ইবনে হাম্বালের মসনদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬—৪৭।

৪৭। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৬২ ইত্যাদি।

৪৮। ইবনে হাজার, ইসাবা, ৮৩৩৬; কাত্তানী, نظام الحكومة النبوة ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮।

৪৯। আবু আবদুল্লাহ ইবনে সালিমা ইবনে জাফর কৃত (পাণ্ডুলিপি তোপকা পুসারায়ী) عيون المعارف وفنون اخبار الخلائف

৫০। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪৫-৪৬, ১৮৬২।

৫১। সহীহ্ মুসলিম, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫০, অধ্যায় التنفيل وفداء المسلمين بالا سرى

৫২। কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে এই গ্রন্থে Finlay সাহেবের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৫৩। সারাখ্শী, شرح السير الكبير ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭—২৮। لئلا ينسبو الى الغدر و ليطئنوا اليهم فى مثل هذا فى المستقبل

শায়বানী অনুসারে আরও কতিপয় জটিল বিষয়ের জন্যে সারাখ্শীর শারেহ্ আস, সিয়ারুল কবীর ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৬ তুলনীয়।

৫৪। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫৪, দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

৫৫। মহানবীর যে কোনো সিরাত তুলনীয়। বদরের বন্দীগণ ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৭১।

৫৬। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, الاحكام السلطانية পৃঃ ১৩২।

৫৭। شرح السير الكبير ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯।

৫৮। তাবারী: ইতিহাস: পৃঃ ১৬৭৫—৭৯।

———

ষোড়শ অধ্যায়

অন্তর্ভুক্ত এলাকার অধিবাসিগণকে অধিকার দান

(৪৫৭) বিজিত এলাকায় কোনো শত্রুর প্রাক্তন প্রজাগণকে বিজয়ীর প্রতি শান্তিকামী, আইনানুগ আশা করা যায় এবং কোনোক্রমেই শত্রু-ভাবাপন্ন ভাবা যায় না। কিন্তু যদি তাদের জেলা বা দেশ নূতন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবু তাদেরকে নূতন রাষ্ট্রের নাগরিক বলপূর্বক করা হবে না; কিন্তু তাদেরকে একটি বৎসর[১] সময় দেওয়া হয়, যাতে তারা হয় দেশ ত্যাগ করে যাবে নতুবা তাদের নূতন প্রভুর মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। সমস্ত অধিবাসিগণকে প্রজা হিসাবে গ্রহণ করার আবশ্যকতা নাই; তাদের কিয়দংশকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। খলিফা উমর ইহুদী, গ্রীক ও দস্যুদিগকে (الروم و اللصوت) জেরুযালেমে বাস করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।[২]

(৪৫৮) যদি তারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া কিংবা নতুন সরকার ও তাদের মধ্যে যে চুক্তি হত, তা দিতে হত।[৩] অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করার পর তারা সাধারণ প্রজা বলে গণ্য হয়। অমুসলমান প্রজাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায় ও খ সেকশন দ্রষ্টব্য।

———

টীকা ঃ

১। মাওয়ার্দি, অভিমত উদ্ধৃত, الأحكام السلطانية পৃঃ ১৩২।

২। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০৫—০৬।

৩। দৃষ্টান্তস্বরূপ খলিফা উমরের সঙ্গে বনু তাগলিব গোত্রের চুক্তিটি স্মরনীয়। এই গোত্রটি জিযিয়া দিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কিন্তু অন্যান্য কর অধিক দিতে চেয়েছিল। আবু য়ুসুফ ইত্যাদি তুলনীয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

অনুমোদিত কার্যাবলী

১। সাধারণ

(৪৫৯) এখন আমরা যুদ্ধসংক্রান্ত মুসলিম আইনসম্মত কার্যাবলীর তালিকা দান করব:

১) শত্রু অনুপস্থিত থাকলে তার অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকা চলবে,[১] হাজির থেকেও নাগালের বাহিরে থাকলে তাকে অবরোধ[২] করা যেতে পারে, তা শিবিরেও হতে পারে, দুর্গে অথবা এমনকি ভূগর্ভস্থ কোন সুরক্ষিত স্থানে (Matmurah) ; যে ব্যাপারে অনেক আলোচনা[৩] করা হয়েছে। প্রকৃত সম্মুখ সংঘর্ষে শত্রু যোদ্ধাগণকে নিহত,[৪] আহত,[৫] পশ্চাদ্ধাবন করা[৬] এবং বন্দী করা যেতে পারত।[৭] যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করত না তাদেরকে আত্মরক্ষা ব্যতিরেকে আর কোনো সময়ে হত্যা চলত না। আব্বাসীয় আমলের ফকিহ্‌গণ শিশু, স্ত্রীলোক[৮] এবং বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার দরুন যুদ্ধে অসমর্থ বা অন্য কোনো কারণে বৃদ্ধগণকে ব্যতিক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন— তাঁদের মতে এদেরকে নিহত করা যেত; যদি তারা শাসক, সেনাপতি বা যুদ্ধকার্যে রণনীতি বিষয়ে পরামর্শদাতা হত এবং যদি তাদের মৃত্যু শত্রুদের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।[৯]

তদুপরি দিনের আলোকে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান যদি দূরে হয় এবং চেনা না যায়, অথবা এমনকি লক্ষ্য করা গেলেও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শত্রু কর্তৃক বেসামরিক লোকদের আশ্রয় হিসাবে যদি নিয়ে আসে,

তাহলে তীর নিক্ষেপ মার্জনীয়। তায়েফ অবরোধের সময় রসূলুল্লাহ পাথর ছুঁড়বার যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।[১০]

আব্বাসী আমলের জুরীরা আর একটি ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল : শিশু, স্ত্রীলোক, বার্ধক্যজনিত কারণে যে সব পুরুষেরা যুদ্ধে অক্ষম, তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। তারা বলেন,[১১] যদি তারা শাসক, সেনাপতি অথবা যুদ্ধ কলাকৌশলের ব্যাপারে পরামর্শদাতা হন, তা হলে এটা স্বভাবতই মনে করা যেতে পারে, তাদের মৃত্যু শত্রুদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

এই সম্বন্ধে কুরআনের নির্দেশ "অতঃপর কাফেরদের নেতাগণের সঙ্গে যুদ্ধ করো"[১২] সমর্থন হিসাবে লক্ষ্যণীয়। কাসানী ব্যাখ্যা করেনঃ নীতি হ'ল এই যে, যুদ্ধ করুক বা নাই করুক, যুদ্ধক্ষম নয় তাঁদেরকে হত্যা করা যাবে না, তবে হত্যা করা যাবে যদি তারা সক্রিয়ভাবে বা অন্যভাবে, মতামত দ্বারা, প্রভাব দ্বারা, উত্তেজনা ইত্যাদি দ্বারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।[১৩]

(৪৬০) ২) কৌশলও যুদ্ধে অবলম্বন করা যেতে পারে।[১৪] মহানবী যুদ্ধে সাধারণতঃ এমন সব বাহ্যতঃ বিভ্রান্তিকর[১৫] কথা (تورية) রটিয়ে দিতেন এবং অস্পষ্ট ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী[১৬] ব্যবহার করতেন যার ফলে শত্রুপক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। "যুদ্ধ কৌশল বা কুটনীতি"[১৭] (الحرب خدعة)—মুসলিম সামরিক সাহিত্যে ইহা বিখ্যাত নীতি যা মহানবীর কথা বলেও সুবিদিত আছে।

(৪৬১) ৩) প্রচারনা সম্পর্কে পৃথক আলোচনা করা যেতে পারে। মহানবীর জীবদ্দশায় এমন সব দৃষ্টান্ত মিলে যে, তখন গুপ্তচর পাঠানো হত শত্রুর ও তার মিত্রদের দলের ভিতরে অনৈক্য বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য[১৮] এবং শত্রুকে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম করার উদ্দেশ্যে[১৯] তারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করত অথবা শত্রুর নিকট থেকে অন্য কোনো মতলব হাসিল করার জন্য ইহা করা হত।[২০] এক সময়ে মক্কায় দুর্ভিক্ষ চলছিল এবং মহানবী সেখানে সাহায্যের উদ্দেশ্যে পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা বা দিনারের চমৎকার উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মক্কার নেতাগণ যদিও সে দান

প্রত্যাখ্যান ও ফেরত দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখায় নাই, কিন্তু তারা বুঝতে পারল যে "মক্কার যুবকগণকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে"[২১] ইহা ছিল একটি শক্তিশালী কৌশল ما يريد محمد بهذا الا ان يخدع شباننا কুরআনের বিখ্যাত আয়াতে ইসলামী বাজেট সম্বন্ধে[২২] যা পাওয়া যায় তাতে প্রচারণার জন্য আয়ের কিয়দংশ বরাদ্দ করা হয়েছে (والمؤلفة قلوبهم)। আবু ইয়া'অলা আল-কার্‌রার মতে কুরআনের শব্দ চার শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে,

(১) মুসলমানের সাহায্যে যাদের অন্তঃকরণ জয় করা দরকার।

(২) মুসলমানের ক্ষতি সাধন থেকে তাদেরকে বিরত রাখা।

(৩) ইসলাম কবুল করতে তাদেরকে প্রেরণা দেওয়া।

(৪) তাদের মাধ্যমে অন্যান্যকে উদ্বুদ্ধ করা।[২৩]

অবশ্য তাদের বেশীর ভাগ হবে অমুসলমান এবং আমাদের গ্রন্থকারও ইহা স্পষ্ট স্বীকার করেছেন।

(৪৬২) ৪) শত্রুকে সর্ব প্রকার অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করা যেতে পারে।[২৪] এই বিষয়ে জাহাজ ও দুর্গগুলিকে একই ভাবে গণ্য করা হত।[২৫] অবশ্য অনাবশ্যক রক্তপাত পরিহার করতে হবে। মহানবীর জীবদ্দশায় মুসলিম সেনাবাহিনীতে শ্রেষ্ঠতর রণনীতি ও কৌশল এবং নতুন গঠন পদ্ধতি ও নূতন আত্মরক্ষা পদ্ধতি দেখা যেত। মহানবীর পূর্বে হিজাযে পরিখা যুদ্ধ বলে কিছু ছিল না। যথাসম্ভব বিস্ময়কর কার্য বা আকস্মিকতা ও যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত থাকত যার ফলে রক্তপাত কম হত এবং সহজ বা অনায়াস আত্মসমর্পণে সাহায্য করত।[২৬] খলিফা মু'আবিয়া তাঁর নৌ-অভিযানসমূহে আগ্নেয়াস্ত্র (محرقات) ব্যবহার করতেন।[২৭] এস, পি, স্কট উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানগণ কামানের অনুরূপ কিছু ব্যবহার করতেন।[২৮] ক্রুসেডকালে মুসলমানরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাইন ব্যবহার করতেন।[২৯] একই সময়ে সালাহ্‌উদ্দীন খৃষ্টানদের দ্বারা অবরুদ্ধ জাহাজ গুলিতে শূকর রেখে এবং মুসলিম নাবিকগণকে খৃষ্টান পোশাক পরিধান

করিয়ে তাঁর বন্দরে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৩০] অন্ততঃ কয়েক শত বৎসর পূর্বের এক লেখক বিষবাষ্পের অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন ঃ

و اما المكليدة فى الحرب كالنيران و المداخين و المياه المدبرة و الروائح المنتنة القاتلة لخراب الحصون و الا قلاع وادهاش العدو جائزة -

অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে অগ্নি, ধূম্র, প্রস্তর, তরল পদার্থ এবং দুর্গন্ধযুক্ত মারাত্মক বাষ্প ইত্যাদির ব্যবহারে শত্রুর দুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত করতে ও শত্রুকে সন্ত্রস্ত করা বিধেয় ছিল।[৩১]

গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত ; ১২৩১ হিজরীতে পাণ্ডুলিপি কপি করা হয়েছিল। আরবীতে লিখিত অপর একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে বিষাক্ত বাষ্প উৎপাদনের বিবিধ সূত্র লিপিবদ্ধ আছে।[৩২] বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানীর মতো প্রবীণ গ্রন্থকারও ধূম্রের সাহায্যে আক্রমণকে উল্লেখ ও সমর্থন করেছেন (মৃত্যু ঃ ৬১৬)।[৩৩] আশ্-শায়বানী আকস্মিক হামলা, দুর্গে অগ্নিসংযোগ এবং পানিতে দুর্গ প্লাবিত করা বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন।[৩৪] আরব ও অন্যান্য মুসলমানগণ শত্রুকে ভীতচকিত করার মানসে ভীতিকর ও কর্কশ শব্দ করবার যন্ত্রাদি ব্যবহার কর্‌ত।[৩৫]

(৪৬৩) ৫) হত্যা ঃ ইহা মুসলিম আইন অনুসারে বৈধ এবং ইহা ন্যায়সংগত হতে পারে ঐ শর্তে যে, ইহা অধিকতর রক্তপাত ও অশান্তি হ্রাস বা লাঘব করে দেয় এবং ইহা অবলম্বন করা হয় দুইটি অনিষ্টকর কাজের ভিতর অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর বিবেচনা করে। মহানবীর জীবনে এই বিষয়ে অনেক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত মিলে। আবুল হাকায়েক,[৩৬] কাব ইবনুল আশরাফ,[৩৭] আবু রাফে[৩৮] ও সুফিয়ান ইবনে আনাসের[৩৯] বিরুদ্ধে প্রেরিত তাঁর অভিযানসমূহ সফল হয়েছিল এবং আবু সুফিয়ানের[৪০] বিরুদ্ধে অভিযানটি ফলপ্রসূ হয় নাই।

(৪৬৪) ৬) মহানবীর জীবনকালে রাত্রিতে হামলার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এমন কি তৎকালীন ব্যবহৃত

শ্লোগানও উল্লেখ করেছেন।[৪১] এক সময়ে মুসলমানদের দুইদল ভ্রান্তি বশতঃ পরস্পরের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল এবং ভুল ধরা পড়বার পূর্বেই কিছু রক্তপাত ঘটে গিয়েছিল। মহানবী একমত ছিলেন যে ইহা ভুল বশতঃ ঘটেছিল এবং ইহার দরুণ কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নাই।[৪২]

(৪৬৫) ৭) পূর্বে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মরক্ষা ব্যতিরেকে কোন মানুষকে হত্যা করা চলবেনা। রাত্রির আক্রমণের দরুণ অথবা দূর থেকে যখন আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় সেক্ষেত্রে অনিচ্ছায় যে সব শান্তিকামী ব্যক্তি নিহত হয়ে যায়; তার জন্য কোনো শাস্তি নাই; কিন্তু সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিতে হবে যেন তাদেরকে তারা লক্ষ্য করে যুদ্ধাস্ত্র না ছোড়ে।[৪৩]

(৪৬৬) ৮) দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দূর থেকে অবরোধকালে শত্রুর দিকে গুলী বর্ষণ করা মাঝে মাঝে আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রায়শঃ অবরুদ্ধ স্থানে শান্তিকামী ব্যক্তিই শুধু নয়, নিরপেক্ষ, এমন কি পর্যটনকারী মুসলমান ও বন্দী ইত্যাদি ব্যক্তিগণকেও দেখা যায়।[৪৪] আবার কখনো কখনো শত্রুরা স্ত্রীলোক, শিশু কিংবা মুসলমান বন্দীদের পশ্চাতে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা ঐসব শান্তিকামী, নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ না করে।[৪৫]

(৪৬৭) ৯) শত্রুদের বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস বা অধিকার করা যেতে পারে। ইহা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

(৪৬৮) ১০) শত্রুদের পানি সরবরাহ বন্ধ করা যেতে পারে, কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তা ব্যবহারের অযোগ্য করে দেওয়া যেতে পারে।[৪৬] মহানবী বদর[৪৭] ও খায়বারের[৪৮] যুদ্ধে শত্রুদের পানি সাফল্যের সাথে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

(৪৬৯) ১১) মানুষের খাদ্য ও পানীয় শত্রুদের দেশ হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে।[৪৯] সাধ্যমতো মহানবী প্রেরিত সেনাবাহিনী, জিনিসপত্রের বিনিময়ে মূল্য প্রদান করতেন, তার প্রমাণ আছে। সে কথা তিরমিযি

উল্লেখ করেছেন: অনুবাদ: হাদীসের মর্ম হল এই যে, তারা অভিযানে বের হয়ে যে সব দেশের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতেন সে সব দেশের লোকেরা নগদ টাকার বিনিময়ে তাদের জিনিসপত্র বিক্রয় করত না। এই কারণে মহানবী বলেছিলেন: যদি তারা বিক্রয় করতে অস্বীকৃত হয় এবং শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত তাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে না চায়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করো.........খলিফা ওমরও একই নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[৫০]

(৪৭০) পক্ষান্তরে চাহিদা[৫১] জানিয়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের মতো মানুষের ও প্রাণীর খাদ্য গণিমত হিসাবে গণ্য করা হয় না, অর্থাৎ, সরকার বা বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করা হয় না, বরং সংগ্রহকারী বা লুণ্ঠনকারীই তার মালিক হয়ে যায়।[৫২]

(৪৭১) ১২) ব্যক্তিগণের অথবা লোকালয়ের জরিমানা অথবা অন্য কোন শাস্তি হতে পারে যদি তারা বিজয়ী সেনাবাহিনীর প্রতি অশিষ্টাচার দেখায় কিংবা শত্রুতা পোষণ করে।

(৪৭২) আইন ও আচরণ সংক্রান্ত এইগুলি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ। সমস্ত বৈধ কার্যাবলীর বিশদ তালিকা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, যা নিষিদ্ধ নয়; তা-ই বৈধ (الأصل الإباحة)[৫৩] অর্থাৎ, মৌলিকভাবে সবই আইনসঙ্গত।

২। আকাশ যুদ্ধ

(৪৭৩) আল-মাক্কারী তাঁর 'নাফে' আত্-ত্বিব' (نفع الطيب) পুস্তকে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, কিরূপে আব্বাস বিন ফিরনিস (মৃত্যুঃ ২৭৫ হিঃ/৮৮৮ খৃীঃ) একটি মানুষ-দ্বারা চালিত উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছিলেন এবং কিরূপে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উড়বার পর মাটিতে অবতরণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর এই গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় এবং আকাশে প্রভাব বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হয় নাই।

তথাপিও এতে কোনো সংশয় নাই যে, যদি এইরূপ প্রচেষ্টায় বেশী লোক রত থাকত এবং প্রয়োজনীয় পাইলট শিক্ষিত হত, তা হলে যুদ্ধকালে এদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত, যেমন এক হাজার বৎসর পর য়ুরোপীয় খৃষ্টানেরা করছে। স্বাভাবিকভাবে আকাশযুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রাচীন সাহিত্য নাই। যাহোক, সাধারণভাবে যে মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে তা এই যে, মুসলমানরা চুক্তি ও সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ করে। আকাশযুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন বা আচরণবিধি, যদিও সাময়িক, তথাপি ঐগুলো মুসলিম আইনেরই অংশবিশেষ বলা যেতে পারে, কেননা এ যাবত স্বাধীন মুসলিমরাষ্ট্র-গুলো ঐ সব আইন অনুসরণ করে চলেছে। এসব আচার-আচরণের জন্য ওপেনহেইম (Oppenheim) বা অন্য কোন লেখকের বই পাঠ করা যেতে পারে, যাতে আধুনিক এই সব আইন সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির সুবিধা হয়।

৩। সামুদ্রিক যুদ্ধ বিগ্রহ ঃ

(৪৭৪) সামুদ্রিক যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের তথ্যাবলী এতো সামান্য নয়। অষ্টম হিজরীতে মুতার অভিযানের উদ্দেশ্যে আয়্‌লা নামক স্থানে মহানবী (সঃ) মানুষ ও দ্রব্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য সামুদ্রিক অভিযানে বের হন, কারণ তথায় জনৈক মুসলিম দূত নিহত হয়েছিল।[৫৪] নবম হিজরীতে লোহিত সাগরে এক দ্বীপের বিরুদ্ধে এক বাহিনী প্রেরণ করেন, কেননা নিগ্রো জলদস্যুরা তথাকার মুসলিম অধিবাসীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। মুসলমান সেনাপতি ছিলেন আলকামা ইবনে মুজায্‌যিয্‌।[৫৫] সেই বৎসরে আয়লার অধিবাসিগণের সঙ্গে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে নৌকা ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়।[৫৬] কুরআনে সামুদ্রিক অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং এর বিপদাপদেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই মহাগ্রন্থে কোনো অঞ্চলে বিদেশী জাহাজ দর্শনের প্রাক-ইসলামী অভ্যাসকে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখিয়ে নিষিদ্ধ

করা হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে, যা কুরআনে অন্যায় মনে করা হয়েছে[৫৭]। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ইয়েমেন জয় করার জন্য নৌকার ব্যবহার করেছিল, যার ফলে মক্কার বিরুদ্ধে শাসনকর্তা আব্রাহার বিফল অভিযান চালাবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, শুধু তাই নয়, মহানবীর (সঃ) মক্কার সাহাবীরা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে নৌকা ব্যবহার করেছিলেন।[৫৮] এমন কি মক্কাবাসী সুহায়েল ইবনে আমরের বক্তৃতার উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে তিনি মহানবীর মৃত্যুর পর তাঁর নাগরিকবৃন্দকে স্বধর্ম বর্জন করে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধা দিয়েছিলেন এবং বক্তৃতাকালে বলেন 'আমার উটের কাফেলা বাহিনীই কেবল নয়, সামুদ্রিক জাহাজও সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আছে।'[৫৯]

(৪৭৫) মহানবীর জীবদ্দশায় এইরূপ শান্তি ও যুদ্ধকালে নৌ-বাহিনীর ব্যবহারের ফলে উষ্ট্রচালকও অচিরে সুদক্ষ নাবিকে পরিণত হয়েছিল। তাবারীর মতে আবুবকরের খিলাফতকালে ইরাক অভিযানে নৌ-বাহিনী ব্যবহৃত হয়েছিল। বালাযুরীর[৬০] মতে প্রথম উমরের খিলাফতকালে উমানের শাসনকর্তা দায়বুলের (করাচী), তার্ণার (বোম্বাই), বারুস-এর (Bharoach) বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এবং ইনিই ফুসতাত (কায়রো) থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি খাল খনন করান মদিনার বন্দর জার-এ খাদ্য দ্রব্য পাঠাবার জন্য।[৬১] আমীরুল মুমেনিনের নামে এই খাল নীল নদের ভিতর দিয়ে লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্য সাগরকে সংযুক্ত করেছিল, তা আধুনিক কালের সুয়েজ খালের কাজ করত। খলিফা উসমানের সময়ে নৌ-অভিযানসমূহ এবং অনেক দ্বীপ ও বন্দরের বিজয় বৃহদাকারে ঘটেছিল এবং তাঁর বাহিনী স্পেনে প্রবেশ করে তথায় অবস্থান করার জন্য সাগর পাড়ি দিয়েছিল।[৬২]

(৪৭৬) সেকালের নৌ-যুদ্ধের বিবরণ পাঠে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থল-যুদ্ধ ও জল-যুদ্ধের আইন-কানুনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, (বৈধ কার্যসমূহ-এর অন্তর্ভুক্ত ৪ নং) খলিফা মুআবিয়ার রাজত্বকালে তথাকথিত 'গ্রীক অগ্নি' মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল ; প্রতিশোধ স্বরূপ শত্রুদের নৌ-বাহিনী

ধ্বংস করার জন্য। দীনাওয়ারী নিমজ্জিত নৌকার অংশ রং করার জন্য এক প্রকার শাক-শব্জীর উপকরণ তৈয়ার করার পদ্ধতির কথাও বলেছেন।[৬৩] যেহেতু মুসলমান ফকিহ্গণ নৌকা বা জাহাজকে স্থলের উপর দুর্গের মতোই মনে করতেন, তাই নৌ-অবরোধ ও ব্লোকেড সংক্রান্ত কোনো বিশেষ আইনের কথা তাঁরা উল্লেখ করেন নাই। একইভাবে সামুদ্রিক অভিযানে প্রাপ্ত গণিমত ও স্থল অভিযানে প্রাপ্ত গণিমতের বণ্টনের ব্যাপারে একই আইন প্রযোজ্য। শত্রুদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নৌকা দখলকারী সৈন্যের ভিতর বণ্টন করা হত কিংবা সরকার দখল করত, অন্যান্য জমি ও স্থাবর সম্পত্তির মতো, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না। এমন কি প্রথম উমরের খিলাফতকালেও বাইযানটাইনরা মুসলমান রাজ্যভুক্ত মিসর ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান চালাত। এইসব হামলা এবং প্রত্যুত্তরে মুসলমানদের পাল্টা হামলা রীতিমতো সামুদ্রিক যুদ্ধে পর্যবসিত হত এবং প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে জলদস্যুতার অপরাধে অভিযুক্ত করত। প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্যাপিরাস রেকর্ড—পত্রে মুসলিম বন্দরগুলিতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক ঘাঁটিগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, শুধু তাই নয়, বরং জাহাজ নির্মাণ, বাহিনীতে ভর্তি ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবরণও মিলে।[৬৪] যদি আমরা একদিকে ভেবে দেখি যে, গোটা ভূমধ্যসাগর মুসলিম হ্রদে পরিণত হয়েছিল, যেখানে তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং অপর দিকে দেখি যে, আরবী ভাষাতে বিবিধ প্রকার নৌকা ও জাহাজের জন্য তিন শতাধিক শব্দ প্রচলিত আছে এবং সেই সঙ্গে যদি বিবেচনা করি যে, আরবী শব্দসমূহ থেকে এ্যাডমিরাল (Admiral) আর্সেনাল (Arsenal) প্রভৃতি শব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় নেয়া হয়েছে, তাহলে আমরা যথেষ্ট উপকরণ পাই, যার ভিত্তিতে আমরা সমুদ্রে মুসলমানদের প্রভুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। সূরা রূম-এর যে আয়াত (৩০ : ৪১) কুরআনে আছে (বাইযানটাইনদের সম্পর্কে) তাতে বলা হয়েছে, "স্থলে-জলে উভয় স্থানে ফিতনা (অশান্তি) ছেয়ে গেছে মানুষের কর্ম ফলের দরুন"—ইহাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী-জীবনকালেই আরবের চারদিকে সামুদ্রিক এলাকাসমূহে

জলদস্যুতা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীনকালে উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা সামুদ্রিক বীমা প্রবর্তন করেছিল, যার জন্য জীবনের অন্য এক দিকেও তাদের অবদানের কথা প্রমাণিত হয়।

(৪৭৭) বিবিধ উপাদান ও আইনের দিক থেকে প্রচুর কৌতুহলোদ্দীপক উপকরণ আছে এবং নৌ-যুদ্ধের সংগে সংশ্লিষ্ট মুসলিম আইন সংক্রান্ত বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনার পূর্বে সেগুলো সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়নের প্রয়োজন।[৬৪] বর্তমানের মতো আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই পরিতৃপ্ত থাকি।

টীকা:

১। আল কুরআন: ৯: ৫।

২। প্রাগুক্ত।

৩। সারাখ্শী, শরেহ্ আস সিয়ারুল কবীর ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৫-৫০ (৯২ অধ্যায়)।

৪। আল কুরআন, ৮: ১২, ৯: ৫, ৪৭: ৪ ইত্যাদি।

৫। প্রাগুক্ত, ৩: ১৭১; ৮: ১২।

৬। ঐ ৩: ১৭২. ৪: ১০৪।

৭। ঐ ৪৭: ৪, ইত্যাদি।

৮। সারাখ্শী, শরেহ্ আস-সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪; ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৮-৯; তুলনীয় "Acts Forbidden" (নিষিদ্ধ কার্যসমূহ)।

৯। সারাখ্শী, শরেহ্ আস-সিয়ারুল কবীর ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৩।

১০। ইবনে সা'দকৃত তাবাকাত ২/১, পৃ: ১১৪; ইবনে হিশামকৃত সীরাত, পৃ: ৮৭২-৩। এবং সারাখ্শী পৃ: ১৪৭।

১১। তুলনীয়, ৪২১ (২)।

১২। আল কুরআন ৯: ১২।

১৩। কাশানীকৃত 'বাদায়ী-আস-সানাঈ' ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০১।

১৪। বুখারী শরীফ, ৫৫ : ১৫৭ ; মুসলিম, ৫ : ১৪৩ ; সারাখ্‌শী।

১৫। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৯৪।

১৬। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০২-৩।

১৭। সারাখ্‌শী, শরেহ্‌ আস-সিয়ারুল কবীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

১৮। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৮৩-৪।

১৯। ইবনে হাজার 'ইসাবা' পৃঃ ৩০৭৪।

২০। 'তাবারী' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮৬।

২১। সারাখ্‌শী শরেহ্‌, আস-সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

২২। আল কুরআন ৯ : ৬০ এবং আমার (লেখকের) লিখিত প্রবন্ধ, রবিউল আউয়াল ১৩৫৭ হিঃ হায়দারাবাদ হতে প্রকাশিত مجلہ نظامیہ পত্রিকায় প্রকাশিত।

২৩। আবু-ইয়ালা আল-ফারা : الاحكام السلطانية, পৃঃ ১১৬ ; (সম্পাদনা মিসর, ১৩৫৭ হিঃ) এবং আমার (লেখকের) প্রবন্ধ Budgeting and Taxetion in the time of the Holy Prophet Journal of Pak. Hist, Soc., Karachi, 1955, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১-১১।

২৪। আল কুরআন ৮ : ৬০, (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) সারাখ্‌শী ৩য়, ২২২ (ইহা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ নয় : যদি তারা শত্রুদের দুর্গে আগুন লাগায়, জলমগ্ন করে, পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করে কিংবা পানি প্রবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয় অথবা পানি ব্যবহারের অনুপযোগী করার উদ্দেশ্যে তাতে রক্ত, ময়লা, বিষাক্ত দ্রব্য ইত্যাদি মিশ্রিত করে পক্ষান্তরে মালাকাত-ই-খলীলের মতানুসারে বিষাক্ত তীর ব্যবহার নিষিদ্ধ (নিষিদ্ধ কার্যসমূহ নং ১৮)।

২৫। সারাখ্‌শী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।

২৬। তুলনীয় : مجموعه تحقیقات علمیه ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম খণ্ড, এবং عهد نبوی کی میدان جنگ আমার (লেখকের) লিখিত।

২৭। সারাখ্‌শী شرح السير الكبير ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

২৮। History of Moorish Empire in Europe, III, p-634.

২৯। Lawrence, principles of International Law, p. 511.

৩০। ইবনুল আসীরকৃত 'কামিল' ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪ ; ইবনে শাদ্দাদ : النوادر السلطانيه و المحاسن اليوسفيه - পৃঃ ১৭৮।

৩১। رسالة فى كيفية الحرب و الاسرى و المرتدين ফেকাহ্-হানাফী, পৃঃ ১০৮০ ; অধ্যায় ২৭।

৩২। المكايد الحربية পাণ্ডুলিপি হামিদীয়া, ইস্তাম্বুল নং ১৮৯ পৃঃ ৩০৮-১৭।

৩৩। المحيط البرهانى ৩য় খণ্ড ; অধ্যায় ২৩ (পাণ্ডুলিপি ইয়ানী-জামী, ইস্তাম্বুল)।

৩৪। শায়বানী الجيش الذى غزا فى اهل الحرب (পাণ্ডুলিপি, আয়াসোফিয়া, ইস্তাম্বুল)।

৩৫। তুলনীয় ; Islamic Culture, April, 1941 : A Note on Noise as a Consternater in Islamic Armies, pp. 240ff.

৩৬। তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭৯।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ .৩৭২ ; বুখারী শরীফ ; ৫৪ : ১৫।

৩৮। প্রাগুক্ত, ১ম ; পৃঃ ১৩৭৫-৬ ; বুখারী শরীফ ; ৫৪ : ১৬।

৩৯। সারাখ্শী شرح السير الكبير ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৯।

৪০। তাবারী, 'ইখ্তিলাফ আল-ফুকাহা', (পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল) ; ইবনে সা'দ ২/১, পৃঃ ৬৮ ; ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৪।

৪১। ইবনে সা'দ ২/১, পৃঃ ১৭ ; ইবনে হাম্বলকৃত মুসনাদ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫ ; মাওয়ার্দি الاحكام السلطانيه পৃঃ ৬০।

৪২। মুহিত বুর্হানী, অধ্যায় ২৩; তুলনীয় ; অধ্যায় ৩৬ ; ৫।

৪৩। সারাখ্শী ৩য় ; পৃঃ ২১৩ ; বুখারী ৫৪ : ১৪৬।

৪৪। সারাখ্শী 'মুহিত' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯।

৪৫। সারাখ্শী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৬ ; আবু ইয়ালা الاحكام السلطانيه পৃঃ ২৭।

৪৬। তুলনীয় ৪ ; ২৫।

৪৭। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৯-৪০।

৪৮। সারাখশী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

৪৯। দীনওয়ারী الاخبار الطوال পৃঃ ১২০।

كان المسلمون اذا فنيت ازوادهم و اعلافهم جردوا الخيل فاخذت البر حتى هبط على المكان الذى يريدون و يغيرون فينصرفون بالطعام و العلف و المواشى -

(মুসলিম বাহিনী যখন খাদ্য এবং পশু খাদ্যের অভাববোধ করতেন, তখন বাহনসহ বেরিয়ে পড়তেন এবং প্রাপ্তীস্থান আক্রমণ করে হলেও প্রয়োজনীয় খাদ্য, পশু খাদ্য ও পশু সংগ্রহ করে নিয়ে ফিরে আসতেন)।

৫০। তিরমিযি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১, (সম্পাদিত Bulaq)।

৫১। দীনাওয়ারী পৃঃ ১২০ ; তুলনীয়, 'ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি'।

৫২। যে কোন আইনের বই, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যায়' ; সারাখশী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮ ইত্যাদি।

৫৩। তুলনীয়, Supra part I, ch vi, No 10-126,

৫৪। ইবনে আসাকির, 'তারিখে দামেশক' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬।

৫৫। ইবনে সা'দ ২/১, পৃঃ ১১৮ ; মাকরিযি 'ইমতা' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩-৪।

৫৬। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯০২, আমার (লেখকের) লিখিত Documents, ২য় খণ্ড, নং ১৯ এবং الوثائق নং ৩১ দ্রষ্টব্য।

৫৭। অধ্যায় ১৮ ; পৃঃ ৭৯।

৫৮। ইবনে হিশাম, পৃঃ ২১৮।

৫৯। বালাযুরী কৃত 'আনসাব' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪ ইবনে হাবীব-কৃত মুনাম্মাক্ পৃঃ ৩৬০-৬১ (হায়দ্রাবাদ ; দাক্ষিণাত্য সংস্করণ)।

৬০। Futuhul Buldan in Loco.

৬১। তাবারী, স্মৃতি ইত্যাদি, তুলনীয় ; ২০২।

৬২। তুলনীয়, তাবারী, পৃঃ ২৮১৭ ; anno 27 H. গীবন, Decline and Fall. v. p. 555.

৬৩। ইবনে সামাজুন কর্তৃক উদ্ধৃত, 'জামী' (পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়াম) বিরুনীকৃত সাইয়েদেনা (পাণ্ডুলিপি বারুসা)।

৬৪। ইসমাঈল সারহাঙ্গ বাশা, 'হাকায়েকুল আখবার আন দুয়াল আল বিহার' কায়রো ; ৩য় খণ্ড এবং A. M. Fahmy কৃত Muslim Sea Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth Century, 1950. বিস্তারিত বিবরণ আছে।

৬৫। অনুরূপ এ, এম, ফাহমীকৃত একটি গ্রন্থে উদ্ধৃত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গুপ্তচর

(৪৭৮) প্রাচীনকালে গুপ্তচরগণ প্রতিপক্ষের এতোটা ক্ষতিসাধন করতে পারত না, যেমন আধুনিক কালে করে থাকে, কেননা গুপ্তচরবৃত্তি একটি কৌশল থেকে উন্নত হয়ে এখন রীতিমতো একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকালেও শত্রুর নিকট থেকে সংবাদ গোপন রাখতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত। মহানবী (সঃ) কখনো কখনো জনগণের[১] (حبس الطرق) যাতায়াতের জন্য সব পথ বন্ধ করে দিতেন যাতে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ বাইরে যাওয়া সম্ভব হত না।

(৪৭৯) মুসলিম আইনে বাস্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন গুপ্তচর ও শান্তিকালীন গুপ্তচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। ঐ সব ব্যক্তি, যারা শত্রুর পক্ষে আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করে বা সংগ্রহ করতে প্রয়াস পায় এবং তা শত্রুর কর্ণগোচর করে দেয়, তাদেরকে গুপ্তচর বলে গণ্য করা হয়। এমনকি কোন মুসলমানও ঐরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে পারে এবং বিদেশীর মতো ঠিক একই শাস্তি তাকেও দেয়া যেতে পারে।

(৪৮০) স্বাভাবিকভাবে বিদেশী গুপ্তচরদের সম্পর্কে অনেক অন্ন লৌকিকতা বা অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। মহানবীর (সঃ) সময়ের দুইটি কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

ক) হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায় মক্কাবাসীদের তরফ থেকে ভঙ্গ করার দরুন। গোপনে অনেক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল সন্ধি বিরোধী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। হাবীব ইবনে আবি বাল্‌তা'আ নামে এক প্রবীন মুসলমান কোথায় ঐ সকল প্রস্তুতি নেওয়া হত, তা

অনুমান বা ধারণা করেছিলেন। তিনি মক্কার বন্ধুদের নিকট পত্র দিলেন যে, প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ তা মক্কার বিরুদ্ধে, সুতরাং মক্কাবাসীরা যেন সতর্ক থাকে। এই কাজের দ্বারা তিনি আশা করেছিলেন যে, মক্কায় অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথায় হেফাযতে থাকবে সেগুলির প্রতি মক্কাবাসীদের সদয় দৃষ্টি থাকবে। পত্রটি ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং যখন মহানবী নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, পত্রের পিছনে কোনো কুমতলব ছিল না অথবা তার দ্বারা কোনো ক্ষতি সাধিত হয় নাই তখন তিনি হাবীবকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এবং ইসলামের অন্যান্য খেদমত করার জন্য মাফ করে দেন।[২]

(খ) আল-বুখারী ও আবু দাউদ একটি ঘটনার কিছু বিবরণ দিয়েছেন যাতে জানতে পারা যায়, কোন এক অভিযান কালে মহানবী জনৈক সন্দেহভাজন গুপ্তচরকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ফেলার নির্দেশ দেন এবং ধরা পড়লে তার শিরশ্ছেদ করা হয়।[৩] আমরা জানিনা : তার কোনো কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল কিনা, কিংবা তাকে কেন এবং কিভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল।

(৪৮১) আবুয়ুসুফের অভিমত হল—অমুসলমান গুপ্তচরকে, নাগরিক হউক বা বিদেশী হউক, অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এবং যারা মুসলমান তাদেরকে জেল বা দৈহিক শাস্তি দিতে হবে।[৪] তাঁর সমসাময়িক আশ্-শায়বানী দস্যুতা থেকে গুপ্তচরবৃত্তিকে কম দূষণীয় মনে করেছেন এবং তাই তিনি নাগরিক গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতী নন। বিদেশীদের জন্য তাঁরও কোনো দয়া নাই।[৫]

(৪৮২) শাস্তির বেলায় পুরুষ ও রমণী গুপ্তচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না।[৬] তথাপি মুসলমান ফকিহ্গণের মতে নাবালককে কোনোক্রমেই চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না।[৭]

———

টীকা ঃ

১। আবুয়ূস্থফ কৃত খারাজ, পৃঃ ১৩১।

২। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮১০; সারাখ্‌শী, শারেহ আস্‌-সিয়ারুল কবীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

৩। বুখারী, ৫৬ ঃ ১৭৩ ; আবু দাউদ, ১৫ ঃ ১১০ (হাওয়াযিন অভিযান), সারাখ্‌শী।

৪। আবুয়ূস্থফ, খারাজ, পৃঃ ১১৭।

৫। তুলনীয় শরেহ আস্‌-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৬-৭।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। প্রাগুক্ত।

———

ঊনবিংশ অধ্যায়

নির্ধারিত পোশাক

(৪৮৩) যুদ্ধের উন্মত্ততার সময় শত্রু-মিত্র চিনবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এর দ্বৈত উদ্দেশ্য আছে, আরাম লাভ ও পার্থক্যকরণ।

(৪৮৪) মহানবী (সঃ) সামরিক অভিযানকালে বিশেষ পরিচ্ছদ পরিধান করতেন বলে শোনা যায়।[১] যুদ্ধকালে প্রখ্যাত যোদ্ধাগণ বিশেষ পরিচ্ছদ পরিধান করতেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] তিরমিযির বক্তব্য অনুযায়ী কোন বিশেষ অভিযানে রসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশ[৩] ছিল বলে মনে হয়: 'অবিশ্বাসী ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল টুপির ওপর পাগড়ী বাঁধা।' তথাপি এমন কোনো প্রমাণ নাই যে, মহানবীর সময়ে অভিযানের গোটা বাহিনীকে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত করার বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। কেবল ব্যতিক্রম ঘটেছিল বদরের যুদ্ধের সময়, যখন মহানবী সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে বিশেষ নিদর্শনে সজ্জিত হতে আদেশ দিয়েছিলেন, কেননা ফিরেশতাগণ—যারা সেদিন মুসলমানদের সাহায্যার্থে এসেছিলেন তাঁরাও ঐ নিদর্শনে সজ্জিত ছিলেন।[৪] صوفة (সুফাত) নামক এক প্রকার পশমী বস্ত্র ঐ উপলক্ষে মুসলমানরা পরিধান করেছিলেন বলে শোনা যায়।[৫] মহানবীর জীবনীতে দেখা যায় তিনি এমন এক কৌশল উদ্ভাবন করতেন যা দিবারাত্রি উভয় সময়ে উপযোগী হত। প্রত্যেক অভিযানের জন্য তিনি স্লোগানের বিধান বা নির্দেশ দিতেন এবং যুদ্ধকালে স্লোগানের দ্বারা শত্রু ও মিত্র চিনতে পারা যেত।[৬]

(৪৮৫) খলিফা আলীর[৭] সময়ে বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিম ও মুতাওয়াক্কিল নির্ধারিত পোশাকে সজ্জিত বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন বলে জানা যায়। সমস্ত নিয়মিত সৈনিক হালকা বাদামী বর্ণের পোশাক পরিধান করত।[৮]

টীকা ঃ

১। বুখারী, ৫৪ ঃ ৯০।

২। তাবারীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯৩, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪-১৫ ; ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৪৮ ইত্যাদি।

৩। তিরমিযি অধ্যায় لباس পৃঃ ৪২ ; আবু দাউদ অধ্যায় لباس পৃঃ ২১।

৪। তাবারীর তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৪, সূরা ৩ ও ১২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

৫। প্রাগুক্ত (اول ما كان الصوف ليومئذ يعنى بدر) অর্থাৎ 'ঐদিনে বদরের যুদ্ধে প্রথম পশমের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়।'

৬। ইবনে হাম্বলের মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৯, লেখকের "Battlefields of the prophet Muhammad" পৃঃ ১৬, ২৮, ৩৪ ও ৪৫ দ্রষ্টব্য।

৭। মসুদী, মুরুজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৯ (য়ুরোপে সম্পাদিত)

৮। Ameer Ali, A Short History of the Saracens, পৃঃ ৪০১ (১৯২১ সালে সম্পাদিত) "All regulars were given light brown Cloaks."

বিংশ অধ্যায়

শান্তির পতাকা

(৪৮৬) প্রাচীনকালে আত্মসমর্পণের নিদর্শন ছিল উপরে হাত তোলা এবং অস্ত্র বর্জন। খলিফা আলীর সময়ে "শান্তির পতাকা"[১] নামে একটি কথা পাই। কিন্তু মুসলিম সামরিক বিজ্ঞানের শব্দ প্রণয়নকারী শাখায় এ সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন করা হয় নাই।[২]

(৪৮৭) এখানে মুআবিয়ার সেনাবাহিনী কর্তৃক কুরআন উত্তোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে : যার দরুন উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী যুদ্ধ ক্ষান্ত করেছিল।[৩]

(৪৮৮) এতক্ষণ আমরা শত্রুদের দৈহিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে যুদ্ধের দরুন শত্রুর সম্পত্তির উপর কি প্রভাব পড়বে, তা আলোচনা করতে চাই।

টীকা :

১। য়ূসুফ ইবনে মুহম্মদ আল-আন্দালুসী :

الأعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام Fol. 14a, b,

২। Fries, Heerwesen der Araber zur Zeit der Umaljaden, Kiel, 1920 ; wustenfeld, Heerw seen der Muhammedaner, Gollingen, 1980 ; Encyclopaedia of Islam S.V. Tabal Khana, etc ; Lord Munster : فهرسة الكتب التى نرغب ان ابتاعها

lithographed, 1840 ;

৩। তাবারী, ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৫২-৫৩।

হায়দ্রাবাদ সরকারী পাঠাগারে এক কপি আছে।

একবিংশ অধ্যায়

শত্রুর সম্পত্তি

প্রাথমিক মন্তব্য

(৪৮৯) সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর হতে পারে। ইহা ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে পারে। এমন কি যদিও এতে কারো মালিকানা না থাকে, তবু ইহা কোনো রাষ্ট্রের এলাকাধীন হলে সেই রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে কোনো রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত সমস্ত জমি, তা নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হোক বা সরকারের অধীনস্থ হোক, সবই সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে। কারণ কোনো রাষ্ট্রের ভিতর কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বিদেশী বা বহিরাগত হামলা রাষ্ট্রের অবমাননার নামান্তর, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উপর হামলা বলে গণ্য হবে। এই কথা একটি ভাবের বা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হল এই যে, গোটা পৃথিবী এবং তার ভিতর যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র সম্পত্তি[১] এবং তিনি যাকে খুশী দান করেন[২] এবং কোনো দেশের শাসক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।[৩] অতএব আইনের বিধান হল এই যে, মুসলিম এলাকার সমগ্র অংশ মুসলমান শাসকের কর্তৃত্বাধীন (ان نواحى دار الاسلام تحت يد امام المسلمين)[৪] মহানবীর এক হাদীসে আছে ঃ

عادى الارض لله و لرسوله ثم لكم من بعده فمن احيا ارضا ميتة فهى له و ليس لمحتجر حق بعد ذالك سنين -

অর্থাৎ—আদি জমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সম্পত্তি। এবং তৎপর তোমার, সুতরাং যে কেউ পতিত জমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে, ইহা

তারই হবে। তথাপি তিন বৎসর পর একে কেউই বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে না (যদি একে সে উন্নত না করে থাকে)।[৫]

(৪৯০) জনৈক মুফাস্‌সির (ব্যাখ্যাকারী) বলেন :

يقال للشئى القديم "عادى" لنسبة الى قوم عاد لقدم زمانهم سواء كان لهم او لغير هم - و المراد هيهنا ما كان قبل الاسلام فى غير ملك أحد اى فى مكان ليس له ملك -

অনুবাদ কোনো প্রাচীন বস্তুকে বলা হয় 'আদী', আদ জাতির প্রাচীনত্বের জন্য প্রাচীন বস্তুকে এই নামে অভিহিত করা হয়, তারা এর মালিক হোক বা নাই হোক। এখানে এই শব্দের অর্থ হল এক খণ্ড জমি, যার উপর প্রাক-ইসলামী আমলে কারো মালিকানা ছিল না।[৬]

(৪৯১) এই হাদীসের তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে কুদামা ইবনে জাফর বলেছেন :

و جملة الامر ما لم يقع عليه ملك مسلم و لا معاهد فان حكم ذالك الى الامام يقطعه من اختار -

অর্থাৎ– এই প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করলে বলতে হয়, যা কিছু মুসলমান বা মিত্র বিদেশী কারও মালিকাধীন না থাকে, তা শাসকের এখতিয়ারে চলে যাবে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারবেন।[৭]

(৪৯২) ইহা লক্ষ্যণীয় যে, কোনো রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি কখনো স্বীয় এলাকাভুক্ত থাকে না এবং বেশ কিছু সম্পত্তি অন্য দেশে থাকতে পারে। দূতাবাসের সম্পত্তি, বিদেশী নাগরিকগণ যারা সাময়িকভাবে বাস করে কিংবা ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাস করে তাদের সম্পত্তি এবং ঋণ ও ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি ইহার (আলোচ্য বিষয়ের) দৃষ্টান্ত।

(৪৯৩) মুসলিম আইনে শত্রুদের সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণ নীতি এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

নীতি হল, যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত করা যেতে পারে তা গণিমত হিসাবে গণ্য হতে পারে, অন্য কিছু হবে না। কারণ দখলে আসার ফলে যে অধিকার তা অন্যান্য উপায়ে অধিকারের ন্যায়, যা মালিকানায় রদবদল ঘটায়। এই রূপে যা-ই অন্যান্য পদ্ধতিতে অধিকার করা যায় তা দখলের বলেও করা যায়।[৮]

(৪৯৪) পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি নিম্নবর্ণিত নানা উপায়ে ব্যবহৃত হতো :

১। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি

(৪৯৫) ইহা স্থাবর ও অস্থাবর দুই-ই হতে পারে এবং হয় বায়তুল-মালের কর্তৃত্বাধীনে নয়তো রাজ-পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। ইহার বিশেষ গুরুত্বের দরুন আমরা শত্রু রাষ্ট্রের ভূভাগ বা এলাকা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি :

(৪৯৬) ক) ভূভাগ বা এলাকা—কোনো ভূভাগের জয় ও অধিকার দ্বারা, তার সার্বভৌমত্ব এবং সেই সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও প্রজাগণের আনুগত্যসহ সব কিছু বিজয়ীর উপর বর্তায়। অধিকার বা দখল, স্থায়ী বা কূটনৈতিক এবং সাময়িক যাই হোক না কেন, অধিকারীকে কর আদায় করার, শাসন করার এবং সেই বিজিত দেশ বা অঞ্চলকে তার রাজ্যভুক্ত অংশ বলে গণ্য করার অধিকার দান করে।

(৪৯৭) ইসলামের ইতিহাসে গোড়ার দিকে বিজিত এলাকার দায়িত্ব নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়ে গেছে। মহানবীর দৃষ্টান্ত খুঁজলে দেখা যায়, বিষয়টি সম্পর্কে তেমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। কারণ তিনি কখনও কখনও গণিমত হিসাবে বিজয়ী বাহিনীকে বিজিত এলাকা বণ্টন করে দেন এবং অন্য সময় বিজিতদের স্বাধীনতার উপরই শুধু ছেড়ে দেন নাই, বরং তা স্পর্শও করতেন না। খলিফা উমরের সময়ে এই বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা লিপিবদ্ধ করার পূর্বে বিষয়টির সূক্ষ্ম পরীক্ষা আবশ্যক।

(৪৯৮) যতোটা আমি অবগত হতে পেরেছি, মহানবী কর্তৃক বাহিনীর ভিতর বিজয়ী ভূমির বণ্টন কেবল বনু নাযির ও বনু কায়নুকা গোত্রের বেলায় ঘটেছিল। মদিনার এই উভয় গোত্রেই মহানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করেছিল। কুরআনে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগের নির্দেশ আছে।[৯] হতে পারে, মহানবী ইহুদীদের কর্মের প্রতিফল দান করেছিলেন।[১০]

'যখন তোমরা কোনো নগরীর কাছাকাছি যাও যুদ্ধের জন্য, তখন তাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করবে এবং যদি তারা শান্তির প্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং তাদের নগর-দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তারা তোমাদের অধীনতা স্বীকার করবে এবং তারা তোমাদের সেবা করবে। কিন্তু যদি তারা শান্তি কামনা না করে এবং যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে সেই নগর তোমরা অবরোধ করবে। এবং যখন তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ইহা সমর্পণ করবেন তখন তথাকার প্রত্যেকটি পুরুষকে তোমরা হত্যা করবে। কিন্তু স্ত্রীলোকগণকে, শিশু ও প্রাণীদিগকে এবং সমস্ত ধন-সম্পত্তিকে তোমরা গ্রহণ করবে; আর তোমরা তোমাদের শত্রুদের গণিমত ভক্ষণ করবে যা তোমাদের আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন'[১১]

(৪৯৯) বনু নাযিরের বেলায় মহানবী তাদেরকে নির্বাসিত করে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং প্রত্যেকটি মানুষকে এক উটের বোঝা ধন-দৌলত সঙ্গে লওয়ার অনুমতি দান করেন।[১২] বনু কুরায়যার বেলায় তাদেরই পছন্দ মতো সালিসের মতানুসারে, যা ঠিক 'Deutronomy'র মতের[১৩] অনুকূলে ছিল, শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সালিসের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে মহানবী কেবল এই মন্তব্য করলেন যে, সপ্তনভোমণ্ডলের উপর থেকে ইহা আল্লাহ্ই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যদি ইহুদীরা মহানবীর নিকট দয়া ভিক্ষা চাইত, তাহলে তারা আরও লঘু দণ্ড পেতে পারত, কিন্তু তারা তাদের প্রাক্তন মিত্র এক সাধারণ মুসলমানকে পছন্দ করল; এবং ইহুদীদের উপর তখন মুসলমানদের ক্রোধের কারণ ছিল: তারা বনু নাযির ইহুদীদের সংগে কোমল ব্যবহার করেছিল, অথচ তারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে খন্দকের অবরোধের ব্যবস্থা করেছিল এবং ঠিক অবরোধের পূর্বে মহানবীকে ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদিনা হতে দুই সপ্তাহের পথ দুমাতুল জান্দালে যেতে হয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মহানবী ষড়যন্ত্রের জাল থেকে রক্ষা পেয়ে অবরোধকারিগণের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার প্রস্তুতি গ্রহণ করবার জন্য মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন,[১৪] এবং খন্দকের ভীষণ অবরোধের সময় মদিনার বনু কুরায়যা

গোত্রের এই ইহুদীরা মুসলমানদের পশ্চাতে আঘাত হানতে প্রয়াস পেয়েছিল। এমনকি ওয়েনসিঙ্ক (wensinck) যিনি মহানবীর প্রতি মোটামুটি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, তিনিও স্বীকার করেছেন।[১৫] পূর্বে বনু নাযির গোত্রের প্রতি যে কোমল ব্যবহার করা হয়েছিল তার ফল হয়েছিল অপ্রত্যাশিত এবং কোনো রাজনীতিবিদই পুনর্বার কোমল ব্যবহার করার মতো ভুল করতে পারত না।

(৫০০) খয়বরের ইহুদীরাও নির্বাসিত হয়েছিল যখন তারা যুদ্ধ করে অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছিল; কিন্তু পরে মহানবী তাদেরকে রাখতে সম্মত হয়েছিলেন এবং পুনর্বার আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ইজারা হিসাবে কাজ করতে নির্দেশ দেন।[১৬] এই আদেশগুলি খলিফা উমরের পূর্বে দেওয়া হয় নাই এবং উমর মহানবীর মৃত্যু-কালীন[১৭] ইচ্ছানুযায়ী আরব থেকে মেসোপটেমিয়ায় অন্যান্য সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে নির্বাসিত করেন।[১৮] খয়বরের ইহুদিগণের মতো ফেদাক ও 'ওয়াদিউলকুরা'র ইহুদিগণও একই ইজারার শর্তে সম্মত হয়।[১৯]

(৫০১) যুদ্ধের পর সমর্পণের বেলায় যারা ইহুদী নয় তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সরকারী দলিল কৌতূহলজনক: আল্লাহ্ রাহ্মানুর রহীমের নামে। ইহা আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহম্মদের নির্দেশ ইসলাম কবুল করার সময় উকায়েদীরের জন্য এবং আল্লাহ্‌র তরবারী (আরবীতে সায়ফুল্লাহ) সেনাপতি খালিদ ইবনে ওলিদের সম্মুখে মিথ্যা দেব-দেবী ও পুতুলগুলো বর্জন করা এবং দুমাতুল জান্দাল ও তার চতুষ্পার্শ্ব সংক্রান্ত।

আমাদের জন্য সমস্ত ভূমি যার পানি-সম্পদ নাই এবং যার আবেষ্টনী নাই, কর্ষণযোগ্য ও অবহেলিত এবং অস্ত্রশস্ত্র, প্রাণী এবং দুর্গ এবং তোমাদের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত তালগাছের বাগান-এ কর্ষিত জমির পানি বরাদ্দ থাকবে।

তোমাদের পশু-প্রাণীকে অবাধ চারণের অধিকার দেয়া হবে। কর দানের ব্যাপারে ভগ্নাংশ সংখ্যা হিসাবে ধরা হবে না। চারণভূমি তোমাদের জন্য বন্ধ হবে না। তোমরা প্রত্যহ উপাসনা করবে এবং যাকাত দান করবে।

—তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের যামিন হিসাবে রাখো। বিনিময়ে তোমাদের জন্যে সদিচ্ছা পোষণ করা হবে এবং রীতিমতো সব কিছু প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে।[২০]

(৫০২) রাষ্ট্রের পক্ষে সমস্ত মালিকহীন জমি ও দুর্গ বাজেয়াপ্ত হবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিচালনার ব্যয়ভার বিজিতদের উপর ন্যস্ত হবে, যাদের নির্বাসন অভিপ্রেত ছিল না।

(৫০৩) যুদ্ধবিহীন সমর্পণের বেলাতেও সমস্ত এলাকা সম্বন্ধে একই নিয়মাবলী প্রযোজ্য হত। কারণ আমরা মহানবীর জীবনে আরব ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অংশে জমি সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাই, যা ঐ সব ব্যক্তিকে দেওয়া হত যারা মুসলিম রাষ্ট্রের উপকার করত, যদিও ঐ স্থানগুলি শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের অধিকারে এসে গিয়েছিল। ঐরূপ জমির দান সম্পর্কে সে সব দলিলপত্রে আমরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি উক্তি পাই, যা এইরূপ—'যদি এই জমি কোনো মুসলিম নাগরিকের অধিকারে না থাকে।'[২১]

(৫০৪) মহানবীর পরেই অল্প দিনের মধ্যে যখন ইরাক ও সিরিয়ার উর্বর জমি মুসলিম বাহিনী দখল করে নেয়, সৈন্যরা গণিমতের বণ্টনের জন্য, (যার মধ্যে তারা মুসলিম আইন অনুসারে জমিও অন্তর্ভুক্ত করেছিল) দাবী করতে লাগল। বিষয়টি রাজধানী মদিনাতে জানানো হল এবং সেখানে দীর্ঘ আলোচনা চলল। সিদ্ধান্ত সমস্ত বাহিনীর সেনাপতিদের নিকট প্রেরিত হল। আবু য়ুসুফ বিস্তারিতভাবে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন এবং ইরাকী ও সিরীয় বাহিনীর নিকট প্রেরিত ফরমান লিপিবদ্ধ করেছেন।[২২] পরবর্তী দলিলের অনুবাদ আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট :

আবু উবায়দা খলিফা উমরকে সংবাদ দিলেন : অমুসলমানদের পরাজয়ের, আর যে গণিমত আল্লাহ্‌ তাদেরকে দান করেছিলেন তার কথা এবং ঐ সকল সন্ধির শর্তাবলীর কথা যা বিজিত দেশের জনগণ স্বীকার করেছিল এবং গণিমত হিসাবে নগরী ও তার অধিবাসীরা, জমি, গাছপালা, ফসলের অংশ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের অনুরোধের

কথা এবং সেই সঙ্গে তিনি (আবু উবায়দা) আরও জানিয়েছেন যে. সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর (খলিফার) মতামত এ বিষয়ে তিনি চেয়ে পাঠান।

উমর প্রত্যুত্তরে লিখে পাঠানঃ পাঠ করুন, আপনি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত যে গণিমত ও শহর-নগরের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধির কথা লিখেছেন। আমি মহানবীর সাহাবার সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা এ বিষয়ে একমত হন নাই। আমার অভিমত আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণের ভিত্তিতে আপনাকে জানাচ্ছিঃ

এবং যা আল্লাহ্‌ তাদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে দেন, তোমরা তার জন্য কোনো অশ্ব বা উষ্ট্র দাবী করো না, কিন্তু আল্লাহ্‌ রসুলকে প্রভুত্ব দেন ঐ সব বিষয়ের উপর যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্‌ সকল ক্ষমতার অধিকারী। যা আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে শহরের অধিবাসীবৃন্দের নিকট থেকে দান করেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের জন্য, এবং নিকট আত্মীয় ও এতিমদের জন্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য তা যেন তোমাদের ভিতর ধনীদের মধ্যে বিতরণ করো না, এবং রসুল যা তোমাদেরকে দেন তাই গ্রহণ করো এবং যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাকো। এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য করো। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

'এবং এই গণিমত ঐ গরীব পলাতক ব্যক্তিদের জন্য, যারা গৃহ ও আসবাবপত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে এবং যারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ঐশ্বর্য চায় এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করে। তারা অনুগত'।[২৩] ইহা গোড়ার দিকের মক্কার মুহাজিরদের বেলায় প্রযোজ্য। আরও আয়াত আছেঃ

'এবং যারা গৃহে অবস্থান করে, ঈমানকে বজায় রাখে. আর যারা তাদের নিকট পালিয়ে আশ্রয় নেয়—তাদেরকে ভালোবাসে এবং যা তাদেরকে দান করা হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোনো কামনা পোষণ করে না, বরং তাদের উপর মুহাজিরদের স্থান দেয়, যদিও তার ফলে তারা দারিদ্র হয়ে যায়। এবং যারা লোভ-লালসা থেকে নিষ্কৃতি পায় তারাই সাফল্য অর্জন করে।'[২৪]

নিশ্চয়ই এরাই আনসার (অর্থাৎ মদিনার সাহায্যকারী)। ইহা ছাড়াও আয়াত যা আছে তা এই :

'এবং যারা ইহাদের উপরে ঈমান আনে।[২৫] ইহারা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ আদমের সন্তান ; এবং আল্লাহ্ কিয়ামত বা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত গণিমতের অংশীদার হিসাবে নির্ধারিত করেছেন।'

সুতরাং আল্লাহ্ যা তোমাদেরকে গণিমত হিসাবে দিয়েছেন তা প্রাক্তন মালিকের অধীনস্থ থাকতে দাও, তথাপি তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারিত করো, যা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং যা দেশের সমৃদ্ধির একটা উপায় হতে পারবে। কারণ তারা এ সম্বন্ধে তোমাদের অপেক্ষা ভালো জানে এবং শ্রেষ্ঠতরভাবে এর সদ্ব্যবহার করতে পারবে। কোনোক্রমেই তোমরা অথবা তোমাদের সঙ্গের মুসলমানরা তোমাদের গণিমতের অংশ বলে গণ্য করো না এবং বণ্টন করো না, যেহেতু তোমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছ এবং তাদের অবস্থানুযায়ী জিযিয়া আদায় করেছ। এবং বস্তুত : আল্লাহ্ আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন :

'উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, অথচ আল্লাহ্কে ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। এবং আল্লাহ্ ও তার রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষেধ করো এবং সত্য ধর্মের অনুসরণ করো না যতোক্ষণ তারা নত হয়ে অবস্থানুযায়ী জিযিয়া আদায় না করে।[২৬]

যেমনই তাদের নিকট থেকে জিযিয়া নেবে, তেমনই তাদের বিরুদ্ধে কোনো উপায় বা পথ থাকবে না। আমাকে বলো দেখি আমরা যদি তাদের লোকজন বন্দী করি ও বণ্টন করি, তাহলে মুসলমানদের জন্যে কি থাকবে যারা আমাদের পরে আসবে ? আল্লাহ্র কসম, তারা কারও সঙ্গে কথা বলবার মতো লোক পাবে না, অথবা কারও নিকট থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাবে না। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজিত জাতিকে দাস-দাসীতে পরিণত না করি, তারা আমরণ মুসলমানদের আহার যোগাবে ; এবং যখন আমরা এবং তারাও মরে যাব,

আমরণ আমাদের পুত্রগণ তাদের পুত্রগণের নিকট থেকে আহার পাবে। যতোদিন ইসলাম জয়যুক্ত হবে তারা ইসলামের অনুসারী সমস্ত মানুষেরই দাস বলে বিবেচিত হবে।

অতএব তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করো। তাদেরকে দাসে পরিণত করো না এবং তাদেরকে নির্যাতন ও অনিষ্ট করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বিরত রাখো। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে তাদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং যে সন্ধির শর্তাবলী তাদেরকে প্রদান করেছ সেগুলো পুরোপুরি কার্যকরী করো। ভোজকালে খৃষ্টানদের ক্রুশের মিছিলের ব্যাপারে বৎসরে একবার হলে আর যদি তা বিনা পতাকায় অনুষ্ঠিত হয়, এবং নগরের বাইরে তা ঘটলে তাদেরকে বাধা দিও না, কেননা তারা এর জন্য তোমাদের নিকট অনুরোধ জানিয়েছে। নগরের অভ্যন্তরে মুসলমানদের ও তাদের মসজিদের ব্যাঘাত ঘটলে কোনো ক্রুশকে আসতে দেওয়া হবে না।[২৭]

(৫০৫) তখন থেকে ইহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ পাওয়া যায় না, যদিও মুসলমান ফকিহ্‌গণ তত্ত্বের দিক থেকে মত পোষণ করেন যে, নূতন দেশ বিজয়ের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকের স্বাধীনতা আছে; উহাকে (যিম্মীর ধনসম্পদকে) গণিমত হিসাবে বণ্টন করা, কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করা এবং সেক্ষেত্রে উহার আয় থেকে গোটা জাতির ব্যয় নির্বাহ করা।[২৮] যাহোক, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নাই যে, যখনই মুসলমানরা কোনো শর্তাবলী গ্রহণ করবে সেগুলোকে অবশ্যই সদুদ্দেশ্যে পালন করতে হবে।[২৯]

(৫০৬) ক) পবিত্র দেশ—বিজিত দেশের প্রতি বা ভূখণ্ডের প্রতি ব্যবহারের বেলায় আর একটি বৈশিষ্ট আছে। অমুসলমানদেরকে আরব থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে, কেননা তারা তথায় বসবাস করতে পারে না।

(৫০৭) খ) খাস জমি—মুসলমান ফকিহ্‌ ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা উমর রোমের দশ প্রকার জমিকে খাস জমি হিসেবে গণ্য করেন, যথা— প্রাক্তন শাসকের অথবা তার পরিবারবর্গের জমি,

পরাজিত ও নিহত ব্যক্তিদের জমি, যা মালিকহীন হয়ে পড়ত। ঐসব ব্যক্তিদের জমি যারা পলায়ন করে আর প্রত্যাবর্তন করে নাই এবং ডাকঘর, বনজঙ্গল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট জমিসমূহ।[৩০]

(৫০৮) গ) কনডোমিনিয়াম—কিছু জটিলতার উদ্ভব হতে পারে ঐসব জমির ক্ষেত্রে যা দুই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকে এবং তন্মধ্যে একটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে।[৩১] তথাপি কোন যুদ্ধরত শক্তি জমিকে নিরপেক্ষ গণ্য করবে না, যদি উহা সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে যুদ্ধমান দুই শক্তির কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়, যেমন সৈন্যের চলাচল, যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত ও মেরামতকরণ ইত্যাদি। কেবল নিরপেক্ষতার ঘোষণা নিস্ফল হবে—যদি যুদ্ধমান শক্তির কোনটি অলিখিত বাধাকে স্বীকার না করে।

(৫০৯) ঘ) বাহিনীর সাজসজ্জা—যুদ্ধ এলাকায় যুদ্ধের উপকরণের বেলায় ব্যক্তিগত ও সরকারী জমির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। মানুষ ও যুদ্ধাস্ত্র উভয়কেই ধৃত, বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধের আঘাত সামলাতে হত। আমরা পূর্বেই যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী অধ্যায় গণিমত বণ্টনের বিষয় আলোচিত হবে।

২। ব্যক্তিগত সম্পত্তি

(৫১০) যুদ্ধ এলাকায় শত্রুর অধীনস্থ জমি এবং ব্যক্তিগত জমির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি কোন নগর বা দুর্গ আক্রান্ত হয় তবে অনেক কিছু নির্ভর করে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর উপর। খয়বরে মহানবী শর্ত নির্ধারণ করেন যে, পরাজিত শত্রুগণ একমাত্র পরিহিত বস্ত্রাদি ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুই সমর্পণ করবে, যদিও পরবর্তীকালে উদারতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি এই দাবী ত্যাগ করেছিলেন। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা ও বশীভূত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ বিজিত শহরগুলোর নির্বিচারে লুণ্ঠনের উল্লেখ প্রাচীন কালের ইতিহাসে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

৩। গণিমতের বন্টন

(৫১১) এই বিষয়ে মুসলিম আইনের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। যখন তাদের দেশ মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়ে তথায়

একটি নগর-রাষ্ট্র গঠন করেছিল তখন গণিমত সম্বন্ধে তাদের কোন আইন-কানুন ছিল না। সাধারণতঃ এ ক্ষেত্রে মহানবী আহ্‌লে কিতাবদের অনুসরণ করেন। সুতরাং যখন ইবনে জাহাশ, বদর যুদ্ধের পূর্বে এক অভিযানে বহির্গত হন[৩২] তিনি রাষ্ট্রকে এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করে দেন।[৩৩] মহানবী গণিমত গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁর বিনানুমতিতে যুদ্ধ করার জন্য তিরস্কার করেন। তিনমাস পরে বদর যুদ্ধের পরে অনেক বন্দী দেখা গেল। মহানবীর মজলিসে-শূরার সভ্যগণের ভিতর মতানৈক্য ঘটল, একদল তাদের মৃত্যুদণ্ড, অপরদল মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্তির প্রস্তাব দিলেন। মহানবী দয়ার্দ্রচিত্তে শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন।[৩৪] এবং সাধারণভাবে গণিমত সংক্রান্ত ব্যাপারে মহানবী স্বীয় পূর্ণ ইচ্ছার প্রয়োগ করলেন।[৩৫] আরও কিয়ৎকাল পরে কুরআনে এক আইন পাওয়া গেল যে, যুদ্ধের পরে লব্ধ গণিমত এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যে, বাহিনী $\frac{4}{5}$ অংশ ও রাষ্ট্র $\frac{1}{5}$ অংশ[৩৬] পায়, অশ্বারোহী পাবে পদাতিকের তুলনায় দ্বিগুণ,[৩৭] এবং সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হবে না। বিনা যুদ্ধে লব্ধ গণিমতের ক্ষেত্রে সমস্তটা বায়তুলমালে জমা হত এবং রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছাধীন থাকতো।[৩৮] এই প্রকার গণিমতকে 'ফায়' নামে আখ্যায়িত করা হতো এবং ইহা গণিমা বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা প্রাপ্ত ধন হতে পৃথক ছিল।

(৫১২) যদি কোন দেশ আক্রান্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করত, যা কিছু সন্ধি অনুযায়ী মুসলিম সরকার লাভ করত তা 'ফায়' এর অন্তর্ভুক্ত হত। বার বার দেয় কর, সন্ধি অনুযায়ী সাময়িকভাবে দেয় অর্থ শত্রুর দেশ-প্রাপ্ত, যুদ্ধ-প্রাপ্ত নয়, এরূপ মালিকহীন সম্পত্তি—এইগুলো উপরোক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত।[৩৯] ফিদাকের অধিবাসীরা খয়বরের ভাগ্য দেখে ভীত হয়েছিল এবং খয়বরের বিজিত অধিবাসীদেরকে যে শর্তাবলী প্রদান করা হয়েছিল, সেই শর্তাবলীর ভিত্তিতে মহানবীর নিকট শান্তির জন্য অনুরোধ জানাল। খয়বরের ধন-সম্পদকে গণিমা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, কিন্তু ফিদাকের ধনসম্পদকে "ফায়" হিসাবে

গণ্য করা হয়েছিল, এবং একই কারণে মহানবী স্বেচ্ছায় বিলি-ব্যবস্থা করেছিলেন।

(৫১৩) গণিমা ও ফায় উভয়ই গবাদি পশু বা অস্থাবর বস্তুই শুধু নয়, স্থাবর ও ক্রীতদাসও হতে পারে।

(৫১৪) জমি ও যুদ্ধবন্দীদের বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। যদি কোন ক্রীতদাস বন্দী হয় এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে, কিংবা অদল-বদল করে, অথবা বিনা অর্থে নিষ্কৃতি না পায়, তা হলে সাধারণভাবে তার সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাংশের দরুন অসুবিধা দূরীকরণার্থে ক্রীতদাসদের নীলামে বিক্রয় করা হয় এবং প্রাপ্ত অর্থ বিজয়ী বাহিনী ও মুসলিম রাষ্ট্রের পর্যায়ক্রমে সাধারণ নিয়মে চার ভাগে ও এক ভাগে বণ্টন করা হয়।

(৫১৫) গণিমত ইসলামী এলাকায় বণ্টন করা হয়, যার মধ্যে সদ্য বিজিত দেশও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদি তা মুসলিম এলাকাভুক্ত করে লওয়া হয়—এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও। মুসলিম ফকীহ্গণ বদরকে কেবল একটা স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেথায় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা হয়েছিল, কিন্তু স্থানটি এলাকাভুক্ত করা হয় নাই।[৪০] পক্ষান্তরে খয়বর ও বনু মুসতালিক গোত্রের দেশটি অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছিল, যেমনই মহানবী সেগুলো জয় করে নিয়েছিলেন।[৪১] এই কারণে বদর, হুনায়েন ও অন্যান্য স্থানের গণিমাত—যেগুলো ইসলামী এলাকাভুক্ত ছিল না, বণ্টন করা হয় নাই; এবং খয়বরের ক্ষেত্রে উহা সেখানেই বণ্টন করা হয়েছিল।

(৫১৬) বলা হয়েছে, চার-পঞ্চমাংশ গণিমত বিজয়ী সেনাবাহিনীকে পুরস্কার স্বরূপ দান করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক ও নিয়মিত বেতনভোগী সৈনিক অথবা বেসরকারী ও অফিসারের মধ্যে, এমন কি প্রধান সেনাপতির ক্ষেত্রেও কোন তারতম্য করা হয় না—সকলেই সমান অংশ পেয়ে থাকে।[৪২] তবু অশ্বারোহী সৈনিকের অর্ধেক এবং কারও কারও মতে এক-তৃতীয়াংশ পায় পদাতিক সৈনিক।[৪৩] যাহোক, বাহিনীর

অনুসারী, যারা সচরাচর যুদ্ধ করে না, যেমন ঠিকাদার ব্যবসায়ী ইত্যাদি, গণিমতের অংশ পায় না, ব্যতিক্রম হয় যখন তারা যুদ্ধ করে।[৪৪] যারা প্রকৃতই যুদ্ধ করত ও যাদের যুদ্ধ করার দরকার হয় নাই তাদের কোন পার্থক্য করা হয় নাই। আবশ্যক হলে তারাও যুদ্ধ করতে পারত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যারা অবস্থান করত এবং রক্ষীবাহিনী বা যারা প্রহরায় রত থাকত। বদরের যুদ্ধে মহানবী আটজন ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগদান না করা সত্ত্বেও গণিমাতের অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁরা সেনাপতি কর্তৃক স্কাউটিং-এর মতো বিশেষ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন।[৪৫] স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস, নাবালক, অমুসলমান, যদিও তাদের মূল্যবান কার্যের জন্য পুরস্কৃত হত তথাপি তারা পূর্ণ বয়স্ক মুসলমান সৈনিকের মতো সমান অংশ পেত না। যাহোক, একটি ব্যতিক্রম করা হতো অমুসলমান সৈনিকদের ক্ষেত্রে, যদি তারা নিজেরা প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে কাজ করত, কিংবা তাদের বাদ দিলে মুসলমান বাহিনী বিশেষ শক্তিশালী হতে পারত না: সে ক্ষেত্রে তারাও মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সমান অংশ লাভ করত।[৪৬]

(৫১৭) গণিমতের চার-পঞ্চমাংশ পাওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে আরও দুই প্রকার পুরস্কার পেত, যা তানফিল ও সালাব নামে অভিহিত হত। এ বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

(৫১৮) ক) মুসলিম আইন তানফিলের অর্থে কোন সৈনিক বা সৈনিকগণকে জীবন বিপন্ন করে যে সকল কাজ করা হয়ে থাকে তজ্জন্য যে উপহার বা উপঢৌকন দেয়া হতে পারে তাকে বুঝায়। ইহা রাষ্ট্রের অংশ থেকে দেয়া হয়।[৪৭] পূর্বাহ্নে পুরস্কার ঘোষণা সম্পর্কে সারাখ্‌শী[৪৮] দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

(৫১৯) রসূলের অনেক হাদীস আছে যাতে জানতে পারা যায় যে, তিনি অগ্রাভিযানের সময়ে বাহিনীর বিজয়ের জন্যে রাষ্ট্রীয় অংশ থেকে $\frac{1}{4}$ অংশ এবং প্রত্যাবর্তন করার সময়ে $\frac{1}{3}$ অংশ দান করতেন।[৪৯] কারণ স্বরূপ, যা আমি জনৈক সামরিক অফিসারের নিকট থেকে জানতে

পেয়েছি তা এই যে, অগ্রাভিযান ও অগ্রগতি অপেক্ষা বিজয়হীন প্রত্যাবর্তন কিংবা পশ্চাদপসরণ সবসময়ই অনেক বেশী শোচণীয় বা দুরূহ হয়ে থাকে।

(৫২০) খ) সালাব অর্থে বুঝায়—নিহতদের নিকট থেকে বিজয়ী সৈনিক যে গণিমত পেয়ে থাকে। হানাফী মযহাব মতে তখন এই রীতি কার্যকরী হবে যখন প্রধান সেনাপতি পূর্ব থেকে ঐ রূপ কোনো ঘোষণা করে থাকেন।[৫০]

(৫২১) সালাবের গোটাই বিজয়ী সৈনিক পেয়ে থাকে। কেবল মালেকী মযহাব ব্যতীত সরকার এক পঞ্চমাংশ পায় না। যাহোক, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন খলিফা উমর সালাবের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখেছিলেন। কথিত আছে, আলবারা ইবনে মালিক মল্লযুদ্ধে জনৈক পারসিক শাসনকর্তাকে হত্যা করেছিল এবং তার ⅕ অংশ গণিমতের মূল্য ছিল পঞ্চাশ সহস্র ড্রাকমা এবং খলিফা বলেছিলেন বলে জানা যায়ঃ "যদিও আমরা সচরাচর ⅕ অংশ সালাব থেকে লই না, ইহা বিরাট একটি টাকার অঙ্ক"—এবং এইবারই প্রথম রাষ্ট্র সালাব থেকে ইহার অংশ গ্রহণ করেছিল।[৫১] ইহা প্রমাণ করে যে, সালাবের মতো পুরস্কার রাষ্ট্রেরই একটা অনুগ্রহের ব্যাপার।

(৫২২) ইবনে জুমা'আ বিস্তারিতভাবে ঐ সব অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন—যখন কোনো ব্যক্তি যাদেরকে সে হত্যা করেছে, তাদের ভূসম্পত্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করতে পারে। তিনি বলেন[৫২]ঃ

ক) জীবন বিপন্ন করে যদি দুর্গ থেকে কিংবা পশ্চাদদিক থেকে গুলীবিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সালাব প্রাপ্তির অধিকার জন্মাবে।

খ) যুদ্ধকালে হত্যা করা; যখন শত্রু পরাজিত বাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করছে না।

গ) প্রতিরোধকালে হত্যা করা; দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন শত্রু তার অস্ত্র ত্যাগ করে নাই, কিংবা বন্দী হয় নাই।

ঘ) শত্রুকে হত্যা করা, অন্ততঃপক্ষে তার হস্তপদ উভয়ই, কিংবা একই দিকের হস্ত এবং পদ কর্তন করে অথবা তাকে অন্ধ করে অকর্মন্য করে ফেলা।

৬) কারও মতে যারা পূর্ণ অংশ পায় না, যেমন ক্রীতদাসেরা, তারা সালাবও পাবে না।

(৫২৩) সালাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ শুধু নয়, অশ্ব ইত্যাদিও।

(৫২৪) আমরা পূর্বে দেখেছি[৫৩] যে, প্রাক-ইসলামী আরবে রাযিয়ার (Razzia) সেনাপতিদের ¼ অংশ গণিমতের উপর, অবিভাজ্য ভগ্নাংশ সংখ্যার উপর, শত্রুর পরাজয়ের পূর্বে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর উপর, সাধারণ লুণ্ঠন এবং বাছাই করা জিনিসপত্রের উপর দাবী ছিল, সেই সব জিনিসপত্র হল তরবারি, ক্রীতদাসী, অশ্ব ইত্যাদি—যা সে বিজয়ী বাহিনীর মধ্যে বিতরণের পূর্বেই নিজের জন্য বেছে নিত। আমরা এখনই দেখলাম যে, এই গুলোর মধ্যে ¼ অংশকে মহানবী ⅕ অংশে হ্রাস করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত তহবিলে বা রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত তহবিলে জমা হত না। পছন্দ বা সাফী নামে যাকে অভিহিত করা হয়, তা মহানবীর এখতিয়ার ছিল[৫৪] এবং ইহা অধিকাংশ ফকিহগণের অভিমত যে, ইহা মহানবীর বিশেষ ক্ষমতাভুক্ত, ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম আবু সত্তর, যিনি অভিমত পোষণ করতেন যে, এই বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মহানবীর উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৫৫] অন্যান্য অবশিষ্ট রীতিনীতিগুলো ইসলাম রহিত করে দিয়েছিল।

৪। শত্রু কর্তৃক ধৃত মানুষ ও অধিকৃত দ্রব্য সামগ্রীর প্রত্যর্পণ

(৫২৫) মুসলিম আইনে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদি কোনো শত্রু মুসলমানদের নিকট থেকে কোনো বস্তু হস্তগত করে, তাহলে সে তার ন্যায্য মালিক হয়ে যাবে,[৫৬] এমন কি সে অন্য মুসলমানের নিকট উহা বিক্রয় করতেও পারবে।[৫৭] এবং যদি সেইরূপ সম্পদের মালিককে আশ্রয় ও দান করা হয়, তথাপি মুসলিম আদালতে উহার

বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ গৃহীত হবে না, যদিও সেই সম্পত্তির সাবেক মালিক কোন মুসলমান হয়ে থাকে।[৫৮] সংক্ষেপে বলতে গেলে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে মুসলিম আইন একই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এই দুনিয়ায় দুঃখকষ্টের বেলায় মুসলিম ফকিহ্‌গণের মতে মুসলমান ও অমুসলমান সমান বলে গণ্য হয়।[৫৯]

(৫২৬) যদি শত্রুর হাতে মুসলিম বাহিনীর কোন সৈনিক, মুসলমান বা অমুসলমান যাই হোক না কেন, ধৃত হয়ে দাসে পরিণত হয়, তাহলে সে যে মুহূর্তেই শত্রুর এলাকার বাহিরে পা দিবে সেই মুহূর্তেই সে আযাদ হয়ে যাবে।[৬০] অনুরূপভাবে মুসলিম বাহিনীর হাতে শত্রু ধরা পড়লেও একই আইন তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। পলায়ন করে যদি নিরাপদ স্থানে পৌঁছুতে পারে, তাহলে সে স্বাধীনতা ফিরে পায়।[৬১]

(৫২৭) সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ইহা লক্ষ্যণীয় যে, যদি মুসলমানদের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস শত্রুর হাতে ধরা পড়ে এবং তা পুনরুদ্ধারও হয়, তথাপিও গণিমত বণ্টনের পূর্বে প্রমাণ দেখাতে পারলে সেই মালিককে পুনর্বার তা ফিরিয়ে দেয়া হত।[৬২] কারণ রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। যদি মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেই জিনিসটি হস্তান্তরিত হয়ে যেত, সে ক্ষেত্রে প্রাক্তন মালিক নূতন মালিকের নিকট থেকে মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করে নিতে পারত, অর্থাৎ তাকে ক্রয় করবার অগ্রাধিকার দেওয়া হত।

(৫২৮) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, গ্রোটিয়াস (grotius) তাঁর লেখা 'De Jure Bell ac pacis' গ্রন্থে মুসলমানদের ভিতর অন্ততঃপক্ষে এই রেওয়াজ বা রীতির উল্লেখ করেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন যখন তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, এরূপ রীতি অখৃষ্টান ও য়ুরোপীয় মহাদেশের বাইরের দেশগুলোতে প্রচলিত ছিল।[৬৩]

টীকা :

১। কুরআন, ৭ : ১২৮।

২। প্রাগুক্ত।

৩। কুরআন, ৩৮ : ২৬, ৫ : ১৬৫।

৪। সারাখ্‌শীকৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

৫। আবু য়ুসুফের খারাজ, পৃঃ ৩৭ ; কুদামা ইবনে জাফর কৃত, খারাজ, ৭ম খণ্ড, ৫ম অধ্যায় (পাণ্ডুলিপি, কোপরুলু, ইস্তাম্বুল।

৬। আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ আর রাহাবীকৃত শরহে কিতাব আল খেরাজ লেআবী য়ুসুফ (পাণ্ডুলিপি ১৬০৯ নং, ইস্তাম্বুল)

৭। অভিমত উদ্ধৃত, ৭ম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় (পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল)।

৮। রাযিউদ্দীন আস্‌-সারাখ্‌শীকৃত মুহিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৯বি (পাণ্ডুলিপি ওলীউদ্দীন, ইস্তাম্বুল)।

৯। কুরআন, ৫ : ৪৪, ৪৮, তুলনীয় এই গ্রন্থের ২য় অংশ, চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ 'Persons (b)''।

১০। সালিশের রায় শুনিয়া মহানবী মন্তব্য করেন, আল্লাহ্‌ সপ্ত নভোমণ্ডলের উপর হইতে ইহা নির্ধারিত করিয়াছেন। তাবারী : ইতিহাস : পৃঃ ১৪৯৩ ; ইবনে সাদ ১/২ পৃঃ ৫৪।

১১। Deuteronomy, xx, 10-14.

১২। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৫০ ; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৪৫১, ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ৪১।

১৩। Deuteronomy, খণ্ড, ২০, পৃঃ ৫-১৪।

১৪। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৬৮ ; লেখকের Battle fields, p. ২৫।

১৫। Der Islam, Vol. 2, P, 289 তুলনীয়।

১৬। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৬৪, আবু য়ুসুফ, পৃঃ ২৯।

১৭। ইবনে হিশাম, পৃঃ ১০২১ : এবং অন্যেরা।

১৮। ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ৮৩।

১৯। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৬৪ : বালাযুরী কৃত ফুতুহ, পৃঃ ৩২-৩৫।

২০। আবু উবাইদ, كتاب الاموال ৫০৮, ইবনে সা'দ ২/১, পৃঃ ৩৬ বালাযুরী, পৃঃ ৬১।

২১। ইবনে সা'দ, ২/১, পৃঃ ৪৫ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২ ইত্যাদি তুলনীয়।

২২। আবু ইউসুফ, ১৩-৫ ৮১-২।

২৩। কুরআন, ৫৯ঃ ৬-৮।

২৪। কুরআন, ৫৯ঃ ৯।

২৫। কুরআন, ৫৯ঃ ১০। প্রাগুক্ত, ৯ঃ ২৯।

২৬। কুরআন, ৯ঃ ২৯।

২৭। আবু য়ুসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ৮১-৮২।

২৮। আবু য়ুসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ৩৫-৩৬।

২৯। আবু য়ুসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ৫।

৩০। আবু য়ুসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ৩২ ; ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদমের খারাজ, পৃঃ ৪৫ (সম্পাদনা Brill) ; কুদামা ইবনে জাফরের খারাজ সপ্তম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় (পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল) ; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ২৩৭১। তুলনীয় মাওয়ার্দি ও বালাযুরী ইত্যাদি।

৩১। তাঁর নবুয়তে সাহায্যের জন্য হযরত মূসার প্রার্থনা (و اشركه فى امرى) কুরআন, ২০ঃ ৩২। সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুদান মিসর ও বৃটেনের কনডোমিনিয়াম ছিল।

৩২। ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ৫। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১২৭৫ এফ

৩৩। প্রাগুক্ত।

৩৪। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৩৫৬ ; ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ১৪।

৩৫। তাবারী, পৃঃ ১৩৩৪।

৩৬। কুরআন, ৮ঃ ৪১।

৩৭। বস্তুতঃ মহানবী অশ্বারোহীর জন্য দ্বিগুন বা তিনগুন বেশী দিতেন। (আবু য়ুসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ১১)। পার্থক্য সমতল ভূমি বা পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধের জন্য।

৩৮। কাসানী, বাদায়ী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬।

৩৯। প্রাগুক্ত।

৪০। কাসানী কৃত বাদায়ী, পৃঃ ১২১।

৪১। প্রাগুক্ত।

৪২। শায়বানী কৃত আস্ল, ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় الفقه এবং যাকাত এর অধ্যায়, পৃঃ ২৩৮ ; তাবাররীর ইতিহাস, পৃঃ ১৩৬২, যাহাতে মহানবীর সময়ের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে।

৪৩। ইবনে রুশ্দ بداية المجتهد, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৮-১৯ ; আবু য়ুসুফ, পৃঃ ১০-১১।

৪৪। ইবনে রুশ্দ, অভিমত উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৬-১৭।

৪৫। ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ৬।

৪৬। সারাখ্শী কৃত শারহে আস্ সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৯।

৪৭। কাসানী, ৭ম খণ্ড; পৃঃ ১১৪-১৬।

৪৮। সারাখ্শী : ৬৭-৬৮, ৭৩-৭৬, ৮০-৮১, ৮৩, ৮৫ ইত্যাদি।

৪৯। ইবনে রুশ্দ, অভিমত উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০ ; সারাখ্সী কৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

৫০। সারাখ্শী, আল-মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭।

৫১। ইবনে রুশ্দ, অভিমত উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১। তাবারী اختلاف الفقهاء (ইখতিলাফুল ফুকাহা), পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল الاسرار (আল্-আসরার), পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল ; কুদামা ইবনে জাফরের কিতাবুল খারাজ, ৭ম খণ্ড, ১৯ অধ্যায়।

৫২। তাহ্রীরুল আহ্কাম লে-বদরুদ্দীন ইবনে জামা'আত (পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল)।

৫৩। তুলনীয়, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৯, পৃঃ ১১১।

৫৪। সারাখ্শী শারহে-আস-সিয়ার আল কবীর ২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ ইবনে রুশ্দ, অভিমত উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৬, আবু য়ুসুফ কৃত আল্ খারাজ, পৃঃ ১৩

৫৫। ইবনে রুশ্দ, অভিমত উদ্ধৃত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।

৫৬। সারাখ্শী কৃত আল-মাবসুত। ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

৫৭। শারহে আস-সিয়ার আল-কবীর পৃঃ ১২৬-১৩০। প্রাক্তে মাবসুত পৃঃ ৬১।

৫৮। প্রাগুক্ত পৃঃ ২২, ৬১।

৫৯। দাবুসী, আল্-আসরার, অধ্যায় ইসাবাতুল কুফ্ফার।

৬০। সারাখ্সী, আল্-মাব্সুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

৬১। প্রাগুক্ত।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪; ইবনে উমরের অশ্ব ও ক্রীতদাস সংক্রান্ত বিষয়ে সারাখ্শী দ্রষ্টব্য, শায়বানী অধ্যায় ابواب السير فى ارض الحرب। (পাণ্ডুলিপি, আয়া সোফিয়া)।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মুসলিম সেনাবাহিনীতে মহিলাগণ

(৫২৯) রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন সেবিকা (Nurse)[১] আহত এবং মৃত্যুদেহ বহনকারিনী[২] পাচিকা[৩] পানি বহনকারিনী[৪] এবং সাধারণ খাদিম হিসেবে[৫], কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিকার যোদ্ধা হিসেবেও তাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন।[৬] কাদেসিয়ার যুদ্ধে (১৪শ হিজরী) মহিলাগণ মৃতের জন্য কবর খনন করেছিলেন।[৭] সারাখ্শীর সময়ে (মৃঃ ৪৮৩ হিঃ) সেনা ছাউনীতে ভাণ্ডার রক্ষক পদেও মহিলাদের নিয়োগ করা হতো।[৮]

(৫৩০) যদিও পরবর্তীকালের বিচারকগণ (মুফতী) মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার জন্য বেশী বয়সের হওয়া[৯] যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন ; তথাপি আমরা দেখতে পাই মহানবী (সঃ)-এর সময়কালীন অভিযান সমূহে অবিবাহিতা যুবতিগণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন। (ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৭৬৮) মহানবী (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা যুবতী হওয়া সত্ত্বেও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য স্বেচ্ছা-সেবিকাগণের সঙ্গে আহত যোদ্ধাদের পানি পান করিয়েছেন।[১০] বুখারী শরীফের উক্তি অনুযায়ী মহানবীর (সঃ) স্ত্রিগণ পর্দাপ্রথা নাযিল হওয়ার পরও যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অনুগমন করতেন। খায়বর যুদ্ধে এক যুবতী মেয়ের গল্প শোনা যায়।[১১] বুখারীতে কয়েকটি অধ্যায় আছে যেখানে তিনি স্ত্রীলোকদের নৌযুদ্ধে যাওয়ার কথা, আহতদের শুশ্রূষা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিংবা সেনাবাহিনীকে

অন্যান্য সাহায্য দানের কথা আলোচনা করেছেন।[১৩] শায়েবানীর মতে সামরিক অভিযানে যুবতী স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে কাজ করতে পারে যদি তাহাদের আত্মীয়দের আপত্তি না থাকে: একটি স্বাধীন স্ত্রীলোক অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আইনসঙ্গতভাবে সামরিক অভিযানে যেতে পারে আহদের সেবা করার জন্য; কিন্তু নিকট আত্মীয়ের বিনা অনুমতিতে তার যাওয়া উচিত নয়, বর্ষীয়সীই হোক, কিংবা যুবতীই হোক।[১৪]

(৫৩১) মহানবীর খালা স্বহস্তে এক ইহুদীকে হত্যা করেছিলেন, যখন যে ছোট দুর্গের মধ্যে তাঁকে নিরাপত্তার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাঁর চারিপাশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।[১৫] মহান খালিদের স্ত্রীও কন্যারা অশ্বারোহনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মোটা লাঠি নিয়ে একদল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা যুদ্ধে মূল্যবান সাহায্য করেছিলেন।[১৬] এবং এক সময় দলবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করে চলাতে নাযুক অবস্থা হতে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেন, কেননা তাঁদেরকে দেখে সাহায্যকারী বাহিনী বলে মনে হচ্ছিল।[১৭] এই যুদ্ধে একটি গোত্রে কেবল সাতশত বিধবা স্ত্রীলোক ও অন্যান্য স্ত্রীলোক ছিল।[১৮] যা থেকে মহিলা বাহিনীর সংখ্যা আন্দায করা যেতে পারে। জামালের (উটের) যুদ্ধে আয়েশা চতুর্থ খলিফা আলীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।

— —

টীকা:

১। সারাখশী شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২০৬, বুখারী, ৫৬: ৬৭; ইবনে হিশাম পৃঃ ৬৮৮; উমার ইবনে মুহাম্মদ نصاب الاحتساب অধ্যায় احتساب على النساء fol. 11a b (পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল) সারাখশী الو جيز fol. 150a (পাণ্ডুলিপি ফতেহ ইস্তাম্বুল)।

২। বুখারী, ৫৬ : ৬৭ ; সারাখ্শী شرح السير الكبير ৪র্থ পৃঃ ২০৬।

৩। সারাখ্শীকৃত المبسوط ১০ম পৃঃ ৭০।

৪। বুখারী ; ৫৬ : ৬৮ : ৬৪ : ২২।

৫। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৬৮ (খায়বর অভিযান প্রসঙ্গে)।

৬। প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭৩ Burhanuddin al-Marghinainy المحيط ৩য় অধ্যায় من يجوز له الخروج الى الجهاد من غير كراهية

৭। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ২৩১৭।

৮। সারাখ্শী الوجيز fol. 50a (পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল)।

৯। ফতওয়া-ই-আলমগিরী।

১০। বুখারী ৫৬ : ৬৫, ৬৭।

১১। প্রাগুক্ত।

১২। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৬৮।

১৩। বুখারী, ৫৬ : ৬৩, ৬৭,

১৪। সারাখ্শী, শারহে আস্ সিয়ারুল কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৬।

১৫। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৪৭৯-৮০।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬২-৬৩।

১৭। প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৮৭।

১৮। ঐ, পৃঃ ২০৬৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
নিহতদের প্রতি আচরণ

(৫৩২) আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মৃত শত্রুর অঙ্গচ্ছেদ মুসলিম আইনে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। মৃতকে সর্বদা সম্মান করতে হবে। সুতরাং মহানবী দাঁড়িয়ে পড়তেন এমনকি যদি অমুসলমানেরও লাশ নিয়ে যাওয়া হত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য।[১] পরাজিত শত্রুর[২] লাশকেও মুসলমানদের লাশের মতই[৩] সমাধিস্থ করতে হবে। যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনো লাশ তাদেরকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ আসে, তা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে না। সুতরাং খন্দকের যুদ্ধকালে[৪] মহানবী ঐরূপ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, এমনকি লাশ ফেরত দেয়ার বিনিময়ে শত্রুদের তরফ থেকে অর্থ প্রদানও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যাহোক, আবু হানিফার মতে শত্রুদের তরফ থেকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব এলে, বা দিতে চাইলে তা গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁর যুক্তি হল যে, মুসলমানরা শত্রুর সম্পত্তি দখল করতে পারে এবং যদি তারা স্বেচ্ছায় দান করতে চায়, তা হলে তা গ্রহণ নিষিদ্ধ হতে পারে না।[৫] লাশ বিনা অর্থে মহানবীর ফেরত দেওয়ার তাৎপর্য ছিল তাঁর মহত্ত্ব, তা আইনের আইনের ব্যাপার ছিল না। তাক্ওয়া ফতোয়া নয়, মাত্র টাকা অপেক্ষা গভীরতর মানসিক উদ্দেশ্য ও প্রচারণার উদ্দেশ্য হাসিল করে।

টীকা ঃ

১। বুখারী, ২৩ ঃ ৫০ — এখানে মহানবীর বাণী ও কার্যের আলোচনা আছে।

২। আবু ইয়া'লা, আল্-আহ্‌কামুস সুল্‌তানিয়া, পৃঃ ৩৪ (সম্পাদনা মিসর), বদরের যুদ্ধে মহানবীর আচরণ; তুলনীয় ইবনে হিশাম।

৩। তাবারীর, ইতিহাস ঃ পৃঃ ২৩১৭

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭৬ ; ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১।

৫। শায়্‌বানী কৃত 'আস্‌ল।' ঃ ما زاد محمد فی اخر کتاب السیر

—

চতুর্বিংশ অধ্যায়

যুদ্ধমান পক্ষের সঙ্গে অ-বৈরীমূলক যোগাযোগ

(৫৩৩) যুদ্ধকালে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে যখন যুদ্ধমান পক্ষদ্বয় সাময়িক পারস্পরিক অ-বৈরীমূলক যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। যদিও আইনতঃ শত্রুতা চলতে থাকে, তবু যুদ্ধক্ষেত্রে সমগ্র এলাকা কিংবা উহার আংশিক অঞ্চলে বাস্তবিক পক্ষে অভিযান বন্ধ থাকে। ইহা পুরোপুরি নির্ভর করে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সমঝোতার উপর।

১) আলাপ আলোচনা

(৫৩৪) এইরূপ যোগাযোগের প্রথম উদাহরণ হল ভাব বিনিময়। এইরূপে যখন একপক্ষ প্রতি পক্ষের সংগে আলোচনা বা ভাব বিনিময়ের আকাঙ্খা পোষণ করে, তখন সেই পক্ষ কিছু বোধগম্য ইংগিত ইশারার আশ্রয় লয়। অধুনা সাধারণতঃ শ্বেত বর্ণের পতাকা ব্যবহার করে এবং তার দ্বারা এই অনুরোধ জানানো হয় যে, ঐ পক্ষের দূতকে যেন অপর পক্ষের সেনাপতির নিকট যেতে দেওয়া হয়, যাতে সে তার নিকট যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যেন সেই সেনাপতির নিকট পেশ করতে পারে। ঐরূপ দূতদের সঙ্গে সাধারণতঃ ভাষ্যকার পাঠানো হয়ে থাকে।

(৫৩৫) অনাদিকাল থেকে শত্রুর বাণী বাহক বা দূতের হিফাযতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তা অলঙ্ঘনীয় মনে করা হয়েছে। ইসলাম এই যুক্তিপূর্ণ প্রথাকে মেনে নিয়েছে।[১] এমনকি প্রত্যাবর্তন কালেও শত্রু পক্ষের দূতের উপর কোন নির্যাতন, কিংবা দৈহিক আঘাত বা অবমাননা

করা চলবে না।[২] তথাপি ইহা আবশ্যক নয় যে, সর্বদা প্রতিপক্ষের দূতকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হতে হবে; এবং সেরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের কথা অবশ্য ঘোষণা করতে হবে।

(৫৩৬) দূতকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়, তথাপি যদি সামরিক কারণে আবশ্যক হয়, তাহলে তার চোখ বেঁধে দেওয়া যেতে পারে; এবং তাকে দৈহিক কোনো উপায়ে বাধা দেওয়া হোক বা না হোক, সে মর্যাদার খাতিরে সামরিক তথ্য জানবার জন্য কোনো সুযোগ গ্রহণ করবে না। সচরাচর তাকে সামরিকভাবে ধরে রাখা হয় না, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে অবস্থার গুরুত্বের অবসান হওয়া পর্যন্ত তাকে সামরিকভাবে সসম্মানে রাখা যেতে পারে।[৩] প্রয়োজন বশতঃ তাকে অন্যত্র রাখা যেতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত সফরের জন্য ব্যয়ের কারণে তাকে ক্ষতি-পূরণ দেওয়া যেতে পারে; এবং তাকে নিরাপদ স্থানে অবশ্যই রাখতে হবে।[৪]

(৫৩৭) দূতের তরফ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ তার কঠোর শাস্তি হতে পারে এবং ইহা তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন করবে। কারণ, দূতদের অধিকার অন্যান্যদের মতো তাদের বাধ্য-বাধ্যকতার উপর নির্ভরশীল (لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)[৫]

২) বন্দী বিনিময়

(৫৩৮) যুদ্ধকালে কখনও কখনও বন্দী বিনিময় এবং অন্যান্য জিনিস-পত্রের আদান-প্রদান ও পত্রালাপ ইত্যাদি ঘটতে পারে। যেহেতু এই সব বিষয় পারস্পরিক স্বার্থের ব্যাপার সেজন্য এই গুলোকে স্বীকার করা হয়। বিশেষতঃ পূর্বের এক অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, মুক্তিপণের বিনিময়ে বা অন্যভাবে বন্দী মুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল বিশিষ্ট কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করা হয় এই উদ্দেশ্যে। তাদের মাঝে মাঝে শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এবং কখনও একটি স্থানে বেছে নেওয়া হয়। তারা এবং জাহাজ ও যানবাহনের জন্য

অন্যান্য গাড়ী ইত্যাদি যা নির্ধারিত স্থান থেকে যাতায়াত করে, সকলেই নিরাপত্তা ভোগ করে থাকে। অবশ্য এইসব যাত্রীদল শত্রুতামূলক কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারবে না, কিংবা খাদ্যদ্রব্য বহন করার মতো আবশ্যকীয় কাজ ছাড়া বা যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তা ব্যতীত, বিনানুমতিতে অন্য কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। অন্যথায় তারা তাদের নিরাপত্তা হারাবে। বাস্তব ঘটনার বিবরণের জন্য মাসুদীর 'আত্-তাম্বিহ ওয়াল আশরাফ' দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১৮৯-৯০

৩) পর্যটন, মালপত্র পরিবহন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লাইসেন্স

(৫৩৯) আইন বিষয়ে প্রাচীন মুসলিম লেখকগণ 'অবরুদ্ধ' ও মারাত্মকভাবে পরাজিত শত্রুকে আশ্রয় দান এবং মুসলিম এলাকায় ভ্রমন বা ব্যবসায়ের আদর্শ এর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য করেন নাই। অধিকন্তু চুক্তিভুক্ত কিংবা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক যে রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকে, তার অমুসলিম অধিবাসী এবং যুদ্ধরত কোনও রাষ্ট্রের অমুসলিম অধিবাসী উভয়কেই একই নামে অভিহিত করা হয়। এবং ইহা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে একটির আইন ও অপরটির আইনকে পৃথক করা যদি গ্রন্থকারগণ গুণবাচক বিশেষণ দ্বারা সেগুলোকে চিহ্নিত না করে দেন। তাঁরা সবই উল্লেখ করেন আশ্রয়দান (امان) নামক সাধারণ অধ্যায়ে।

(৫৪০) আমরা আমাদের এই আলোচনার প্রারম্ভে দেখেছি যে, যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজাগণকে এবং রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত অধিবাসীদেরকে মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবসায় করতে দেবে কিনা এবং দিলেও তা কি পরিমাণে দেবে তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করবে মুসলিম রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর এবং মুসলিম ফকিহগণ ঐ সব ব্যক্তির সঙ্গে একমত, যারা বলে সবই বৈধ, যদি নিষিদ্ধ না হয়।[৬] এই সব বিষয় অন্তর্ভুক্তকারী শর্ত থেকে ব্যবসায় বাদ পড়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

(৫৪১) শত্রু নাগরিকগণ ভ্রমণ করার অনুমতি পেতে পারত[৭] এবং বস্তুতঃ পেত ইসলামী এলাকার ঐ অংশে এবং ততোক্ষণ যার উল্লেখ তাদের কাগজপত্রে ও ছাড়পত্রে পাওয়া যেত। আমরা আরও দেখেছি,

প্রাচীনকালে ইহা স্বাভাবিকভাবে রেওয়াজ বা প্রথা হিসেবে ধরা হত যে, যদি কোনো ব্যবসায়ী অনুমতি লাভ করত তবে সে অনুমতি তার ভৃত্যগণ, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার বেলায় ও প্রযোজ্য হত, যদিও কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকত। ব্যবসায়-বাণিজ্য কিংবা পর্যটনের অনুমতি জান-মাল উভয়ের নিরাপত্তা দান করতে, বা পরাজিত ও অবরুদ্ধ শত্রুকে আশ্রয় দান করলে পেত না, যদি লিখিতভাবে তার উল্লেখ না থাকত। অনুমতি পত্রে যে সময়কালের উল্লেখ থাকে তার ভিতর মুসলিম এলাকায় অবস্থানকালে অনুমতিপত্র সংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য প্রয়োজন হলে স্বাভাবিকভাবে তার রক্ষার্থে মুসলিম আদালতে নালিশ করা যেতে পারে। আশ-শায়বাণী দৃঢ়ভাবে বলেন ঃ ইহা একটি নীতি যে, মুসলিম আইন আশ্রিত বিদেশীরা যতোদিন আমাদের এলাকায় বাস করে তাদের রক্ষা করতে এবং দুষ্কৃতিকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে বাধ্য থাকবে।[৮] ইহাও ধরে নিতে হবে যে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজারা নালিশ করতে পারবে। বিদেশীরা তাদের গুরুতর অপরাধের জন্য[৯] মুসলিম ফৌজদারী আইন অনুসারে বিচার প্রাপ্ত হবে এবং তাদের দেওয়ানী আইন দ্বারা তাদের অন্যান্য কার্যের বিচার হবে। এবং এমন কি যখন তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে, যদি তাদের দেশ মুসলমানদের অধিকারে চলে না গিয়ে থাকে, কিংবা তারা বন্দী হয়ে না পড়ে, তাদের ঋণ ও অন্যান্য বিষয়াদি বলবত থাকবে ; এবং তাদের মৃত্যুতে তাদের উত্তরাধিকারীরা সেগুলো দাবী করতে পারবে।[১০] আমি জানি না, যদি তারা পরবর্তীকালে মুসলমান প্রজা হয়ে যায় তবে এই অধিকারগুলো তারা পাবে কিনা ? কিন্তু ইহা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, বিদেশীদেরকে মুসলিম এলাকায় প্রবেশের পূর্বে কোনো কর্ম বা লেন-দেনের জন্য মুসলিম আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে না, এমন কি মুসলিম প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেও।[১১]

৪) ব্যবসায়ে নিষেধাজ্ঞা

(৫৪২) রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে কখনো কখনো যুদ্ধকালে শুধু নয়, এমন কি শান্তিকালেও বিদেশে কিছু দ্রব্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা আবশ্যক

হয়ে পড়ে। একে টেকনিক্যাল অর্থে ব্যবসায়ে নিষেধাজ্ঞা বলা হয়ে থাকে যা ইসলামী আইন শাস্ত্রে পুরাতন একটি বিষয়, মহানবীর কালেও যার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।[১২] পরবর্তী কালের ফকিহ্গণের বিবরন স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত বিস্তারিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁরা বলেন, যা কিছু সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তা মুসলিম এলাকা থেকে রপ্তানী করা বৈধ হতে পারে না; এবং তাঁদের বক্তব্য কেবল মহানবীর দৃষ্টান্তের উপরই নয়, নিম্নলিখিত কিছু কুরআনের আয়াতের উপরেও ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

ক) 'এবং এসব লোকের প্রতি ঘৃণা, যারা তোমাদেরকে পবিত্র কাবা গৃহের অভিমুখে যেতে দেয় নাই, তোমাদেরকে যেন তারা সীমা লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে; বরং তোমরা পরস্পর সততা ও সৎ কর্তব্যের প্রতি সহায়ক হও। এবং তোমরা পরস্পরকে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে সাহায্য করো না।'[১৩]

খ) 'হে নবী! বিধর্মী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন। তাদের প্রতি কঠোর হোন।'[১৪]

ঐরূপ একজন লেখক বলেন:

একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা বৈধ নয় যে, সে কোনো শত্রুর দেশে কিছু পাঠায়, যার সাহায্যে যুদ্ধমান কোনো শক্তি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তা ব্যবহার করতে পারে, যথা—অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব, অমুসলিম ক্রীতদাস এবং যুদ্ধে যা কিছু প্রয়োজনে লাগে।[১৫]

এবং তিনি স্পষ্টভাবে অন্যান্য বস্তুকে এর বাইরে রেখেছেন বা অন্তর্ভুক্ত করেন নাই: এবং বস্ত্র, গৃহের আসবাবপত্র[১৬] খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি করা আপত্তিকর নয়। কারন ঐগুলো সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত নহে।[১৭]

এবং সবকালেই ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়-বানিজ্য উপলক্ষে শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে থাকে। এবং কেহই তাদের উপর দোষারোপ করে নাই।[১৮]

(৫৪৩) ইহা নিশ্চিত যে, নিষিদ্ধ জিনিস-পত্রের তালিকার প্রস্তুতি পরিপূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভর করে, যে সরকার সময়ে সময়ে

সেই তালিকার অদল-বদলও করতে পারে। এই বিষয়ে মহানবীর সময়ের এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানি, যখন ইয়ামামার সর্দার সুমামা ইবনে উসাল ইসলাম গ্রহণ করল এবং মক্কাবাসীদেরকে সংবাদ দিলঃ যতোক্ষণ আল্লাহ্‌র রসূল অনুমতি না দিবেন ইয়ামামা থেকে এক কণাও তোমাদের নিকট পৌঁছুবে না।"[১৯] যখন সেকারণে মক্কাবাসীদের চরমে পৌঁছোয়, তারা মহানবীকে অনুরোধ জানায় খাদ্য ও বস্ত্রের (ميرة) উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য এবং সে অনুরোধ অনুগ্রহ পূর্বক রক্ষা করা হয়।[২০]

(৫৪৪) স্বভাবতঃ কেবল মুসলমান প্রজাগণই নয়, মুসলিম এলাকার সমস্ত অধিবাসিকে অমুসলমান দেশসমূহে নিষিদ্ধ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানী করতে নিষেধ করা হয়। সুতরাং কাসানী বলেনঃ

'এবং তদনুরূপ কোন যুদ্ধরত ব্যক্তি মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করলে তাকে অস্ত্র ক্রয় করতে দেওয়া হবে না ; এবং যদি সে ক্রয় করেও থাকে, তাহলে সেই দ্রব্যগুলোকে যুদ্ধরত দেশে রপ্তানী করতে দেওয়া যাবে না।'[২১]

(৫৪৫) যদিও বিদেশী প্রজারা ইচ্ছামতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতে পেত এবং ফেরত নিয়ে যেতে পারত, তবু একরূপ অস্ত্রের পরিবর্তে অন্যরূপ অস্ত্র নিতে দেওয়া হত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি তারা পরিবর্তন করে, প্রাচীন লেখকদের ভাষায়, তীরধনুকের সঙ্গে, তাদেরকে নূতন অর্জিত জিনিসগুলো নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এমন কি যদি তরবারীর বদলে তরবারী, বর্শার বদলে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে হয়, তথাপি দেখতে হবে নতুন জিনিস গুলো উত্তম কিনা। যদি তা হয়, তাহলে সেগুলো নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে গণ্য হবে। নতুবা যদি জিনিস একই হয় অথবা নিকৃষ্ট হয় তাহলে কোন বিধি-নিষেধ থাকবে না। এবং তার নিজের আমদানীকৃত দ্রব্য খুব উচ্চমানের হলেও সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা চলবে না কিংবা অন্য জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করাও চলবে না কারণ তা চুক্তির খেলাফ হবে।[২২]

(৫৪৬) যা হোক, এই শেষ বিষয়টিতে একটি ব্যতিক্রম করা হয়। মুসলিম ফকিহ্‌গণ[২৩] বলেন, কোন ক্রীতদাস মুসলমান হলে বিদেশীদের

মালিকানার অধীনে থাকতে পারবে না এবং কোন যুদ্ধরত দেশে তাকে রপ্তানী করা চলবে না, যদিও তার মালিক বিদেশী কোন দেশের অধিবাসী হয়ে থাকে এবং সে আমদানী করে থাকে ; তার প্রভুর পক্ষে ঐ ইসলামে দীক্ষিত ভৃত্যটিকে বিক্রয় করে বা অন্যভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে ছেড়ে যেতে হবে। ইহা এই জন্য যে, পাছে তাকে পুনরায় ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। এবং ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়।[১৪]

(৫৪৭) এই অধ্যায়কে আমরা সমাপ্ত করতে পারি মহানবীর কালের একটি রাষ্ট্রীয় দলিলের উল্লেখ করে, যাতে শত্রুর সঙ্গে ব্যবসায় স্পষ্টভাবে বৈধ বলা হয়েছে।

"করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে—

রুবিনের পুত্র জন ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবী ও রসূলের রক্ষা কবচ।

তাদের নৌকা এবং জলে ও স্থলে তাদের ব্যবসায়ীরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল হযরত মুহম্মদের হেফাযত লাভ করবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সিরিয়ার ও ইয়েমেনের অধিবাসীরা এবং ঐ সব সমুদ্র পারের অধিবাসীরা (اهـل البحر) যারা মুসলমানের সংগে আছে।[১৫]

(৫৪৮) ইহা লক্ষ্যণীয় যে, আয়লা (আধুনিক আকাবা, লোহিত সাগর তীরবর্তী) বশীভূত ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল—মহানবী (সঃ) কর্তৃক তাবুক অভিযানকালে নবম হিজরীতে, যখন তিনি বাইযানটাইনীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। এর ফলে তিনি তাঁর অধীনস্থ শক্তিকে শত্রুর সংগে ব্যবসায় করতে বাধা দেন নাই।

(৫৪৯) যুদ্ধের পর সন্ধি চার প্রকারের হতে পারে :

(৫৫০) ক) প্রথম সন্ধি হতে পারে যাতে সন্ধির স্থান-কাল নির্দিষ্ট ও সীমিত। ইহা সাধারণতঃ ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকালে, যাতে উভয়পক্ষ আলাপ-আলোচনা চালাতে পারে, মৃতকে সমাধিস্থ করতে পারে, কিংবা প্লাবনে ইত্যাদির মতো সার্বজনীন বিপদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

(৫৫১) দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সেই সন্ধি, যা নির্দিষ্ট স্থানের জন্য, তথাপি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে। ইসলামের ইতিহাসের গোড়ার দিকে এরূপ কোনো দৃষ্টান্ত মেলে না। আধুনিক অসামরিকীকরণ ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন তুরস্ক যার শিকার হয়েছে মাঝে মাঝে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা যেতে পারে।

(৫৫২) তৃতীয় প্রকার সাধারণ সন্ধি। কিন্তু তবু কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে, ইহা শান্তিচুক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। এই সন্ধি বলবৎ থাকা কালে যুদ্ধকালীন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইহাও সম্ভব হতে পারে যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই সাধারণ সন্ধি পূর্ণ সন্ধি হতে পারে, আলাপ-আলোচনার জন্য সুযোগ মাত্র না হতে পারে। এই প্রকার সন্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মহানবী ও মক্কাবাসীদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি, যা নির্দিষ্ট দশ বৎসরের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার পর প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষকে বিনা সংবাদে আক্রমণ করতে পারত। আমরা খলিফা মুআবিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি তিনি বাইযানটাইনদের সংগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করেছিলেন এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদের সীমান্ত অভিমুখে সসৈন্যে রওয়ানা হয়েছিলেন, যাতে তিনি সন্ধিকাল অবসান হওয়ার সংগে সংগে হামলা করতে পারেন। কিন্তু জনৈক প্রবীন সৈনিক তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিল যে, মহানবীকে সে বলতে শুনেছিল :

'যে কেউ কোনো জাতির সংগে সন্ধি করেছে, সে তাতে কোনো গ্রন্থিও বাঁধবে না কিংবা খুলবেও না ; শান্তিকাল অবসান না হওয়া পর্যন্ত।'[২৬]

(৫৫৩) খলিফা তাঁর সেনাবাহিনীকে অপসারণ করলেন ও প্রত্যাবর্তন করার আদেশ দিলেন। কিন্তু ইহা সন্দেহজনক যে, এই কাজ সততা ও করুণা দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল কিনা।

(৫৫৪) চতুর্থ ও শেষ প্রকার সন্ধি হল সময় ও স্থান উভয়ের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট বা সীমাহীন, যা যুদ্ধের অবসানের পর ঘটে থাকে যখন এক পক্ষ পরাজিত হয় অথবা উভয় পক্ষ শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আগামী অধ্যায়ে ইহার পুনরালোচনা হবে।

(৫৫৫) সীমিত এলাকায় সীমিত সময়ের জন্য সন্ধি করার কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে প্রধান সেনাপতির উপর, যার ধারণা আমরা উদাহরণ থেকে পেয়েছি। অন্যান্য তিন প্রকার সন্ধি কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা তার ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্মচারীরা সম্পাদন করতে পারে।[১৭]

(৫৫৬) সন্ধির ফলাফল—সংক্ষেপে উভয় পক্ষ যে শর্তাবলীতে সম্মত হয় তা পালন করতে উভয়পক্ষ বাধ্য থাকে এবং মুসলমানরা শর্তাবলী পালন করে।[১৮] সন্ধিকালে উভয় পক্ষ শত্রুতাপূর্ণ কার্যাবলী ও চুক্তি ভংগ ব্যতীত অন্যান্য কাজ ইচ্ছামতো করতে পারে।

টীকা ঃ

১। সারাখ্শী কৃত আল-মাবসুত. ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।

২। তুলনীয় এই পুস্তকের ২য় খণ্ড, কূটনীতি (Diplomacy)

৩। সারাখ্শী, শরহে-আস-সিয়ারুল কবীর. ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০-২২

৪। আহ্কাম-আস-সালাতীন ওয়াল-মুল্ক, ৪র্থ অধ্যায় (পাণ্ডু-লিপি, আরিফ হিকমাত. মদীনা)।

৫। কুরআন, সূরা ২; আয়াত ২৮৬।

৬। তুলনীয়, এই পুস্তকের ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় (পূর্বোক্ত ৬৯ নং)

৭। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবু য়ুসুফ কৃত খারাজ, পৃঃ ৭৮।

৮। সারাখ্শী, শরহে-আস-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৮।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। শায়বানী কৃত আস্ল (পাণ্ডুলিপি, আয়া সোফিয়া)।

১১। শায়বানী, জামেউস-সাগীর, পৃঃ ৪০ ৪১ (পাণ্ডুলিপি আয়া সোফিয়া, নং ১৩৮৫)।

১২। সারাখ্শীর شرح السير الكبير ঃ ১৪৯, ১৫৫ (৩য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৭৭, ২৭৩) তুলনীয়।

১৩। কুরআন, ৫ : ২।

১৪। কুরআন : ৯ : ৭৩।

১৫। কাসানী, বাদায়ী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, সারাখ্শী : شرح السير الكبير : ১৫৫, (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩)।

১৬। গৃহের আসবাবপত্র, ঠিক যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাহা হল متاع, যার (সিয়ারুল কবীরের ষষ্ঠ খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) অর্থ হয় বিছানাপত্র, পিয়ালা বা পাত্র ইত্যাদি, যাহা খাদ্য সামগ্রী নয়।

১৭। কাসানী, প্রাগুক্ত।

১৮। প্রাগুক্ত।

১৯। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৭।

২০। প্রাগুক্ত।

২১। কাসানী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০২ ; তুলনীয় সারাখশীকৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯১ ; আবু য়ুসুফকৃত খারাজ, পৃঃ ১১৮।

২২। প্রাগুক্ত, কাশানী : সারাখ্শী ; ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৭৯-৮৫।

২৩। সারাখ্শী কৃত মাবসুত, ১০ ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

২৪। তুলনীয় এই গ্রন্থ, ৪৪৭ নং অনুচ্ছেদ ও তার টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯০২ ; ইবনে সা'দ, ২/১, পৃঃ ৩৭ ; আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল।

২৬। আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল ; তিরমিযি, ২য় খণ্ড, বিশ্বাসঘাতকতা অধ্যায়। شرح السير الكبير : ৪৩ অধ্যায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭)।

২৭। তুলনীয় তাবারী, ইখতিলাফুল-ফুকাহা ; সুহায়লারী, আর-রওযুল আনাফ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

২৮। মহানবীর উক্তি, সারাখ্শী কর্তৃক উদ্ধৃত শরহে-আস-সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

যুদ্ধের অবসান

(৫৫৭) মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধের অবসান নিম্নলিখিত যে কোনো উপায়ে হতে পারে :

(৫৫৮) ১) উভয় পক্ষই পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত এবং শান্তিকালীন সময় নির্ণয় না করে যুদ্ধ বন্ধ করে। ইহা ঘটে থাকে যখন উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অথবা এক পক্ষ জয় করলেও যুদ্ধ চালাতে সাহস পায় না, কিংবা পরাজিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরও শত্রুতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে উহাকে পুরোপুরি বশীভূত করতে চায় না। শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটে যখন দুর্বল পক্ষটি অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে। ঐরূপ সন্ধির ক্ষেত্রে যে কোনো সময়ে শত্রুতার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা মহানবীর কালের বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের কথা বলতে পারি, যখন যুদ্ধরত পক্ষদ্বয় তাদের সম্পর্ক স্থির না করে যুদ্ধ ক্ষান্ত করে। একই ব্যাপার ঘটেছিল মুতায়, যখন মুসলিম বাহিনী সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিরোধিতা করতে অগ্রসর হয়েছিল এবং খিযিমা গ্রন্থের (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩) আবদুল কাদেরের কথায় উভয় পক্ষ চূড়ান্ত মীমাংসা না করে উভয় পক্ষ চলে যায়।

(৫৫৯) ২) অমুসলিম শত্রু, যে সাধারণতঃ তাদের সার্বভৌম কর্তা ইসলাম কবুল করে। ইহা সর্বদা আবশ্যক নয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রের ও নূতন মুসলিম রাষ্ট্রের একত্রীকরণ থেকেই হবে। মহানবীর চিঠিপত্র যা তিনি গাস্সান,[১] বাহ্রায়েন[২] ও উমানের[৩] সর্দারগণকে লিখেছিলেন, তাতে স্পষ্ট উল্লেখিত আছে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে শক্তি বা প্রভুত্বে স্থায়ী থাকতে পারবে। মুসলিম ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান

করে যে, আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী (Negus) ইসলাম কবুল করেছিল।[৪] যদি ইহা সত্য হয় ; আমরা জানি যে তার রাজ্য মহানবীর আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা তো হয়ই নাই, বরং মহানবীর আদেশ ছিল যে, যে পর্যন্ত আবিসিনিয়াবাসীরা আগ্রাসন না করবে বা প্রথম হামলা পরিচালনা না করবে আবিসিনিয়াকে হামলা করা চলবে না।[৫]

(৫৬০) ৩) শত্রুর পরাজয় এবং তাদের এলাকার অন্তর্ভুক্তি। মহানবীর মক্কা, খয়বর ও অন্যান্য দেশের বিজয় এই বিষয়ের উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত। এইরূপ ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা ও সন্ধি সচরাচর আবশ্যক হয় না। মক্কাতে মহানবী কোনো সন্ধি করেন নাই। যা হোক, খয়বরে যে শর্তাবলীর ভিত্তিতে শত্রুদের জীবনও ধনসম্পদ রক্ষা পেয়েছিল, সে শর্তাবলী আলাপ আলোচনা পূর্বক গৃহীত হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ সেগুলো একটি দলিলে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।[৬]

(৫৬১) ৪) শত্রু কর্তৃক মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। নাযরান, তাইমা, ফিদক, আয়লা ইত্যাদির সমর্পন এই প্রকারের দৃষ্টান্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধও হয় নাই, যদিও তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তারা প্রতিরোধ করলে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হবে।[৭]

(৫৬২) ৫) আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসা, আর উভয় পক্ষই তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে।

(৫৬৩) যুদ্ধের ফলাফল সাধারণতঃ চুক্তির শর্তাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। সচরাচর একটা অস্থায়ী চুক্তি প্রথম গৃহীত হয় যাতে প্রাথমিক বিষয়গুলো মীমাংসা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই শত্রুর উপর জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির অধিকার সামরিক কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। পরবর্তীকালে চূড়ান্ত ফয়সালার সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো আলোচিত ও গৃহীত হয়। এখন আমরা এই বিষয়টির আলোচনা করব।

শান্তি চুক্তির স্বরূপ

(৫৬৪) মাঝে মাঝে চুক্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে ভবিষ্যত মিত্রতা ও সহযোগিতার কথা স্বীকৃতি লাভ করে। প্রায়শঃ ইহা শত্রুতার অবসান করে ও সুষ্ঠ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। অপেক্ষাকৃত দুর্বলপক্ষ প্রায়ই ক্ষতিপূরণ ও কর দিতে স্বীকৃতি প্রদান করে। গাত-ফানের সংগে সাময়িক, অমীমাংসিত চুক্তিতে মহানবী মদিনার মরুদ্যান সমূহের উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দিতে চেয়েছিলেন যদি তারা তাদের মিত্র মদিনার অবরোধকারীদেরকে পরিত্যাগ করতে পারত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে যদি তারা পৃথক একটি চুক্তি অবিলম্বে করতে পারত।[৮]

(৫৬৫) ইসলামী রাষ্ট্র নীতি এক ধর্মাবলম্বী বা উম্মার ভিত্তিতে গঠিত বলে অমুসলমানদের সংগে চিরন্তন মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করা অচিন্তনীয় ব্যাপার। যখন মহানবী মক্কায় হিজরত করার পর অনতিবিলম্বে একটি নগর-রাষ্ট্র কায়েম করেন, তিনি ইহুদিগণের সংগে এক মৈত্রী সংঘের সংগঠনের জন্য সম্মতি দান করেন।[৯] অধিকন্তু মদিনার চতুষ্পার্শ্বে বিশেষতঃ ইয়াম্বু অভিমুখে, বিধর্মী গোত্রদের সংগে, যে পথ দিয়ে কোরেশদের কাফেলা সিরিয়া যেত এবং সিরিয়া ও অন্যান্য উত্তরাঞ্চলের দেশ থেকে ফিরে আসত, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চুক্তি করেন।[১০] মুসলিম রাষ্ট্রের প্রারম্ভিককালে যে সকল সন্ধি সম্পন্ন হত সে গুলোতে কোনো সময়-সীমার উল্লেখ নাই। কুরআনে[১১] সময়-সীমাবিহীন অনেক মিত্রতাচুক্তি যা অমুসলমানদের সংগে করা হয়েছিল সেগুলোর উল্লেখ আছে। শুধু হুদাইবিয়া চুক্তিতে "দশ বৎসরের"[১২] মেয়াদের উল্লেখ আছে, যে সময়ের মধ্যে চুক্তি বলবৎ ছিল।

(৫৬৬) মহানবীর শেষ জীবনের দিকে কুরআন বলেছেঃ "হে বিশ্বাসিগণ! ইহুদী ও খৃস্টানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহন করে সে তাদেরই একজন। দেখো! আল্লাহ্ অন্যায়কারীদেরকে সুপথ দেখান না......তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং যারা

মুমিন (বিশ্বাসী) এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত (অতিরিক্ত সম্পদের উপর ধার্য কর) আদায় করে এবং সিজদা করে। এবং যারা আল্লাহ, রসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু মনে করে তারা দেখবে যে আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়ে থাকে। হে বিশ্বাসিগণ! ঐ সব আহ্লে কিতাব (ঐশী গ্রন্থের অধিকারী) যারা তোমাদের পূর্বে ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে এবং বিধর্মীদেরকে—যারা তোমাদের ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, বন্ধু হিসাবে পছন্দ করোও না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, আল্লাহ্‌র কর্তব্য করো।[১৩]

এমন কি আরও বলা হয়েছে ঃ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণকে বন্ধু জ্ঞান করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফর-এর মধ্যে আনন্দ লাভ করে। তোমাদের মধ্যে যারা উহাদিগকে বন্ধু মনে করবে তারা হবে অন্যায়-কারী।[১৪]

(৫৬৭) এতদ্ব্যতীত কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী (৯ ঃ ১–২) মহানবী ঘোষণা করেছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে সমস্ত সন্ধি আছে তা কার্যকরী হবে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত, তথাপি বিধর্মীদের সংগে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সমস্ত সন্ধি, যার কোনো সময় সীমা নাই, চার মাসের নোটিশ দিয়া রদ করা হত।

(৫৬৮) এই সব কারণে ফকিহ্‌গণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, অমুসলমানদের সংগে স্থায়ী কোন সন্ধি করা উচিৎ হবে না। হুদাইবিয়া সন্ধির প্রেক্ষিতে ফকিহগণ সাধারণতঃ একমত হয়েছেন যে, খুব বেশী হলে দশ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ রাখা যেতে পারে। যাহোক, সুহায়লী[১৫] বলেন যে, হিজাজের ফকিহ্‌গণের মতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এমন কি দশ বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত সন্ধি করা যেতে পারে, যদি কোন নিম্নস্তরের কর্তৃপক্ষ নয়, স্বয়ং সর্বোচ্চ শাসক যদি তা সঙ্গত মনে করেন।"[১৬]

শান্তিচুক্তির ফলাফল

(৫৬৯) প্রধান ফলাফল নিম্নে উল্লেখিত হল ঃ

১) যে বিষয় নিয়ে শত্রুতা ঘটেছিল তার মীমাংসা হয়ে যায়।

২) যুদ্ধকালীন অধিকারগুলি যথা হত্যা, বন্দীকরণ, লুণ্ঠন, দখল ইত্যাদি যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব কার্যের অবসান হয়ে যায়।

৩) সন্ধিতে যদি বিপরীত কিছু না থাকে তাহলে সন্ধির পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তাই স্থির থাকে।

৪) যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় হয় কিংবা মুক্তি দেওয়া হয়, যার জন্য সাধারণতঃ স্পষ্ট বিধান থাকে। অন্য গণিমত, স্পষ্ট নির্দেশ ব্যতিরেকে বিনিময় হয় না।

৫) যে মুহূর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যে চুক্তি যুদ্ধকালে স্থগিত থাকে এবং যার পুনর্বিবেচনার আবশ্যক হয় না, স্বাভাবিকভাবে কার্যকরী হয়; এবং যুদ্ধকালে আচরণ সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়ে থাকে তা বাতিল হয়ে যায়।

সন্ধির বা চুক্তির বিষয়বস্তু

(৫৭০) কুরআনের নির্দেশ "যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করো, তখন লিখিতভাবে তা করো"[১৭] এই নির্দেশ ও মহানবীর দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে শায়বানী ও[১৮] অন্যেরা বলেন যে, চুক্তি অবশ্যই লিখিত হওয়া উচিত। চুক্তি লেখার তারিখ এবং যে তারিখ থেকে বলবৎ হবে এবং চুক্তির মেয়াদ সবকিছু সঠিকভাবে লিখতে হবে।[১৯] কতকগুলো সাধারণ বিষয়বস্তু ছাড়া, যেমন যুদ্ধ বন্ধ হওয়া, যুদ্ধের কারণ সমূহের নিষ্পত্তি; যে সব অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে সম্মতি এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়সমূহ ছাড়া চুক্তিতে শর্তাবলী পালনের দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিশ্রুতির কথা,[২০] ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দরখাস্ত[২১] ও যামিন সংক্রান্ত ও মৃত্যুদণ্ড দান সংক্রান্ত কথাবার্তা থাকবে[২২]। এবং এবং আসল চুক্তির সংগে কখনো কখনো অন্যান আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহ, গোপন সংবাদসমূহ সন্নিবেশিত থাকে।

(৫৭১) বস্তুতঃ চুক্তির বিষয় বস্তুর কোনো নির্দিষ্ট সীমা শেষ নাই[২৩] সুতরাং চুক্তির অত্যাবশ্যক ও প্রাথমিক বিষয়সমূহ ছাড়া অধিক কিছু বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।

চুক্তির চূড়ান্তকরণ

(৫৭২) সাধারণতঃ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা চুক্তির আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বে-আইনি কার্যকলাপের জন্য তারা শায়বানীর সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করত।[২৪] ইতিহাসে একটি পত্রের কথা পাওয়া যায় যাতে ইয়েমেন থেকে খালিদ বিন ওলিদ মহানবীর নিকট কিছু নির্দেশ না চেয়েছিলেন।[২৫] সর্বোচ্চ কর্মচারী বা রাষ্ট্রপ্রধান হাতের কাছে পাওয়া না গেলে মীমাংসাধীন চুক্তি যোগ্য কর্তব্যক্তিগণের দ্বারা চূড়ান্ত ফয়সালায় পরিণত করা হয়। চূড়ান্ত ফয়সালা অস্বীকার করাও সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত চুক্তিই বাতিল হয়ে যায়। মহানবীর জীবদ্দশায় এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন মহানবী স্বয়ং একটি চুক্তি করেছিলেন এই শর্তে যে, উহা রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংগে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হবে। বাস্তবিকপক্ষে তাঁরা শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করে দেন এবং লেখা সব মুছে দেওয়া হয়।[২৬]

সন্ধির ব্যাখ্যা

(৫৭৩) আন্তর্জাতিক আইন ও আইনের উৎস সম্বন্ধে মুসলিম লেখকগণ সন্ধির শর্তাবলীর ব্যাখ্যার নীতির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমি শায়বানীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, যাতে দেখা যায় সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত সমৃদ্ধিকালে মুসলমান ফকীহগণ সন্ধির শর্তাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এবং কলঙ্ক ও অসম্মান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিরূপ সতর্কতা তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন। এইগুলো এমন সব জিনিস মুসলমানরা বিনা উল্লেখে মেনে নিতে পারে, কিন্তু অন্য জাতি তা না করতে পারে। এই জিনিষগুলো স্পষ্ট ভাবে লিখিত হওয়া উচিত অন্যথায় চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষ চুক্তির খেলাপ বলে ভাবতে পারে। এবং আমরা উল্লেখ করেছি চুক্তিপত্র এমন ভাবে লিখতে হবে যেন তা চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করে এবং প্রতারণার কোনো অভিযোগ উত্থাপনই সম্ভব না হতে পারে।[২৭]

(৫৭৪) অন্যত্র একই গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে যদি কোন অবরুদ্ধ দুর্গ আত্মসমর্পন করে এই শর্তে যে, স্বাধীন বা আযাদ ব্যক্তিগণ অত্যাচারিত হবে না এবং ক্রীতদাসগণের মালিকানা বিজয়ী বাহিনীর উপর বর্তাবে এবং উভয়পক্ষ কিছু ব্যক্তির মর্যাদা সম্বন্ধে একমত হয় না, তাহলে ধরে নিতে হবে যে তারা আযাদ, যেহেতু মৌলিকভাবে প্রত্যেকটি মানুষই আযাদ।[২৮]

সন্ধির পরিবর্তন

(৫৭৫) যে কোন সময়ে উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে সন্ধির আংশিক গোটা সন্ধিটা পরিবর্তন না করে ও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

সন্ধি বর্জন বা প্রত্যাখ্যান

(৫৭৬) ইহা সম্ভব যে, সময়ের পরিবর্তনে সন্ধির কিছু শর্ত কার্যকরী করা যায় না এবং পরিবর্তিত অবস্থার দরুণ সেই শর্তগুলোকে পরিবর্তন করা উচিত। মুসলমান ফকিহগণ বলেন যদি মুসলিম শাসক পূর্বেকার সন্ধি প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি তা করতে পারেন না যতোক্ষণ তিনি অপর পক্ষকে অবহিত না করবেন এবং তিনি চুক্তি বিরোধী কোনো কাজ করতে পারেন না যতোক্ষণ যুক্তিসংগত সময় উত্তীর্ণ না হয়, যে সময়ের মধ্যে আশা করা যায় যে, সংবাদ অপর পক্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পৌঁছে থাকবে।[২৯]

যামিন ও প্রতিশ্রুতি

(৫৭৭) প্রাচীন মুসলিম ফকিহ্‌দের আমলে যামিন বিনিময় হত কিংবা এক পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী পালন করবার প্রতিশ্রুতি হিসাবে তা দিত।

(৫৭৮) শায়বানী কর্তৃক এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আমি একটি আইনের কথা বলব যাকে পরবর্তী খলিফাগণ বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বারা সমর্থন করেছিলেন। যদি মুসলমান যামিনে রাখা ব্যক্তিগণকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়, তাহলে শত্রুর

যাম্মিনকে সে অপরাধের জন্য সে দায়ী নয়, তার জন্য কোনো দুর্ভোগে তাকে পড়তে হবে না। এই বিষয়ে আমাদের গ্রন্থকারগণ মুয়াবিয়া ও মনসুর[৩০] প্রমুখ খলিফাগণের দৃষ্টান্ত এবং মহানবীর দৃষ্টান্ত ও বারবার উল্লেখিত কুরআনের[৩১] একটি আয়াতের উল্লেখ করেন। বিকল্প ব্যবস্থা হল, আবু হানিফার মতে যাম্মিনে রাখা ব্যক্তিদের মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা হয়ে থাকতে বাধ্য করা, যেহেতু তারা মুসলিম যাম্মিন ফিরে না তারা ফিরতে পেত এবং তাদের হত্যা ইহাদের প্রত্যাবর্তনকে অসম্ভব করে তুলত, ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান স্থায়ী হয়ে পড়ত।[৩২]

প্রাচীন হুদাইবিয়া চুক্তি

(৫৭৯) এই বিষয়ে আলোচনা মহানবীর সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি হুদাইবিয়ার সন্ধির দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যেতে পারে।

(৫৮০) ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের দরুন হিজরত করে এবং দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী সামরিক ক্ষেত্রে নিপীড়িত হওয়ার পর মহানবী (সঃ) তাঁর পিতার শহরে ও তাঁর মারাত্মক শত্রুদের ঘাঁটি শহরটিতে, অর্থাৎ মক্কা শহরে হজব্রত পালনের জন্য গমন করেন। তৎকালে, উত্তরদিকে সুরক্ষিত দুর্গ খায়বারে তাঁহার জঘন্য শত্রু ইহুদীরা ছিল এবং দক্ষিণে ছিল বিক্ষুব্ধ কিন্তু বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত মক্কার কোরেশগণ। খয়বর ও মক্কার মধ্যে একটা আঁতাত আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। অন্ততঃ ইহা নিশ্চত ছিল যে, যদি মুসলমানরা মক্কা অভিমুখে অভিযান করতেন, ইহুদীরা শূন্য ও অরক্ষিত মদিনার উপর হামলা করত এবং মুসলমানরা যদি খয়বরের উপর হামলা করতেন, একই ভয় ছিল মক্কাবাসীর ক্ষেত্রে[৩৩] মুসলমানরা তখন আদৌ সেরূপ শক্তিশালী ছিলেন না যে, একাধারে দুই দিকে অভিযান পরিচালনা করবেন। অন্ততঃ পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীকে রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট বাহিনীও তাঁদের ছিল না, যদি মক্কা বা খয়বরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হত।

(৫৮১) অধিকন্তু, পারস্যবাসীরা (ইরানীরা) বাইযানটাইনদের[৩৪] হাতে নিনেভাতে কেবলই একটা পরিপূর্ণ পরাজয় বরন করেছিল এবং

এই ছিল আরবের জন্য উপযুক্ত সময়, এর অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান করে আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করার, অন্ততঃ পক্ষে ইরানী প্রভাব হত নিষ্কৃতি দিয়ে আরবের প্রদেশগুলিকে মুক্ত করার অর্থাৎ, বাহরায়েন, উমান, ও ইয়েমেনকে উদ্ধার করার।

(৫৮২) মহানবী খয়বর ও ইরান সম্বন্ধে স্বাধীন ইচ্ছা মতো কাজ করতে চেয়েছিলেন এমন কি তাঁর সম্মানহানিকর কিছু শর্তাবলীও তিনি মানতে রাজি ছিলেন। এ হল এক দিক।

(৫৮৩) পক্ষান্তরে, সিরিয়া,[৩৫] ইরাক,[৩৬] ইয়ামামা[৩৭] এমন কি ইয়েমেনের[৩৮] খাদ্যদ্রব্যের বাজার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চারদিকে ইসলামে দীক্ষিত গোত্রসমূহ[৩৯] দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাদের বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত,[৪০] অনাবৃষ্টিতে ভুগে,[৪১] মহানবী যখন দুর্ভিক্ষে সাহায্যকল্পে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রার মতো মোটা অংকের সাহায্য দান করে,[৪২] ইয়ামামার রবিশস্যের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে[৪৩] এবং সন্ধিকালে শত্রুদের জাতীয় পবিত্র গৃহ দর্শন করে অনেকের মনোরঞ্জন ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন, তখন এ আশা করা গিয়েছিল যে, এই সফল অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরেশরা অনায়াসে সন্ধি করবে, যদি তাদের মুখ রক্ষা করার মতো কিছু শর্ত সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৫৮৪) এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে মহানবী ১৪০০ সৈন্যসহ মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপন করেন। এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার[৪৪] পর নিম্নলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়ঃ

চুক্তির মর্ম

তোমার নামে হে আল্লাহ্!

এই স্থির হলো, আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ ও আম্র এর পুত্র সুহায়েলের মধ্যেঃ

তাঁরা উভয়েই সম্মত হন, জনগণের তরফ হতে দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং দশ বৎসরকাল জনগণ শান্তিতে বাস করবে এবং পরস্পর যুদ্ধ হতে বিরত থাকবে।

এবং যে কেউই হযরত মুহম্মদের সহচরগণের (সাহাবীগণ) ভিতর হতে হজ্জ বা উমরার জন্য কিংবা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে (অর্থাৎ ব্যবসায় উপলক্ষে),—তুলনীয় কুরআন (৬২ : ১০), ইয়েমেন বা তায়েফ হয়ে মক্কা যাবে, সেই ব্যক্তির জান-মাল নিরাপদে থাকবে।

এবং যদি কোরেশদের মধ্যে কেউ তার অভিবাবকের (মওলার) অনুমতি ব্যতিরেকে হযরত মুহর্ম্মদের নিকট আসে, তাহা হলে তিনি (মহানবী) তাকে কোরেশদের নিকট প্রত্যর্পণ করবেন ; এবং হযরত মুহর্ম্মদের নিকট হতে কেউ কোরেশদের নিকট এলে তারা তাকে তাঁর নিকট ফেরত দিবে না।

এবং আমাদের ভিতর উভয় পক্ষই শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবে, এবং নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে কোন কাজ কে করবে না।

এবং যে কেউ হযরত মুহম্মদ ও তাঁর পক্ষে যোগদান করতে চায় সে তা করতে পারবে ; এবং যে কেহ কোরেশ পক্ষে যোগদান করতে চায়, করতে পারবে।

— অতঃপর বনু খুযা'আ দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল : আমরা হযরত মুহম্মদ ও তাঁর দলের সংগে যোগ দিতে চাই এবং বনু বকর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল : আমরা কোরেশদের সংগে যোগ দিতে ইচ্ছুক।

এবং আপনি (হযরত মুহর্ম্মদ) এই বৎসর কোরেশদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবেন না ; এবং আগামী বৎসরে আমরা আপনাদের নিকট হতে অন্যত্র যাব এবং আপনি সহচরগণ সহ প্রবেশ করে তিন রাত্রি অবস্থান করবেন, আপনাদের সংগে উষ্ট্র চালকের অস্ত্র মাত্র থাকবে : কেবল তরবারি ; তরবারি ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ আপনি করবেন না।

এবং কুরবানীর প্রাণী (আপনি যা আনবেন) তা কুরবানী করা হবে যেখানে আমরা তাদেরকে পেয়েছিলাম (অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে) এবং আপনি সেগুলিকে আমাদের নিকট মক্কায় পাঠাতে পারিবেন না।

সম্ভবত : হযরত মুহম্মদের সীল মোহর
ও সুহায়েলের সীল মোহর।

সাক্ষিগণ ঃ

মুসলমান পক্ষ ঃ আবুবকর, উমর, আবদুর রহমান বিন আওফ, আবদুল্লাহ, ইবনে সুহায়েল, ইবনে আম্র, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মাহ্মুদ ইবনে মাস্লামা, প্রমুখ।

মক্কাবাসীর পক্ষ ঃ মিকরায ইবনে হাফ্স, প্রমুখ।

লেখক ও সাক্ষী ঃ আলী ইবনে আবি তালিব।

(৫৮৫) চুক্তিটির দুই কপি প্রস্তুত করা হয়। এক কপি মহানবী কর্তৃক রক্ষিত হয় এবং অন্য কপিটি কোরেশদের প্রতিনিধি সুহায়েলকে দেওয়া হয়।[৪৬]

(৫৮৬) মহানবী কোরেশ দূত বা প্রতিনিধিকে আটকে রেখেছিলেন যতক্ষণ মক্কায় অন্যায়ভাবে আটক মুসলমান দূত প্রত্যাবর্তন করে নাই।[৪৭]

(৫৮৭) উভয় পক্ষ সম্মতি দান করার পর, কিন্তু দস্তখত হওয়ার পূর্বে কোরেশ দূতের পুত্র, যে ইসলাম কবুল করার দরুণ নির্যাতীত হয়েছিল তার পিতার নিকটে অন্তরীণ অবস্থা হতে পলায়ন করে মুসলমান শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাকে ফেরত দেওয়ার দাবী করায় মহানবী তাকে বহিস্কার করেন এবং বলেন যে, চুক্তি কার্যকরী হবে সম্মতি জ্ঞাপনের পরই, প্রকৃত বাস্তবায়নের প্রতীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নাই।[৪৮]

(৫৮৮) মহানবী কেবল পুরুষ মানুষ ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহার হুদাইবিয়া ত্যাগের পূর্বে যখন কিছু স্ত্রী-লোকের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যাপার ঘটে তখন তিনি তাদের আইনের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। অর্থাৎ, তাদেরকে ফেরত দেন নাই। কোরেশগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতে সম্মতি দান করে।[৪৯] মুসলিম শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত নব দীক্ষিত মুসলমান স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে, মহানবী তাদের স্বামী থাকলে তাদেরকে তাদের স্ত্রীদিগকে দেওয়া বিবাহের যৌতুকের উপর অধিকার দান করতেন, যাহা সাধারণ কোষাগার বা বায়তুলমাল হতে তাদের নামে জমা হত।[৫০]

(৫৮৯) এক তরফা ফেরত মক্কাবাসীদের পক্ষে ব্যয় বহুল ও অসুবিধাজনক প্রমাণিত হয়; এবং তাদেরই অনুরোধে মহানবী এই শর্তটি

পরিবর্তন বা বাতিল করে দেন।[৫১]

(৫৯০) আরও কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, এলাকা-বহির্ভূত শিবির ও সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে উভয় পক্ষই স্বীকৃতি দান করে।[৫২]

(৫৯১) মহানবীর মক্কায় অবস্থানের তিনদিনের মেয়াদকে বর্ধিত করার অনুরোধ করা হয়, কিন্তু মহানবী পরবর্তী বৎসর মক্কায় গমন করলে কোরেশগণ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।[৫৩]

(৫৯২) চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের জাতীয় পবিত্র গৃহ দর্শন করার অনুমতি আদায়। ঘটনাচক্রে দশ বৎসরের মেয়াদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে উভয়ের এলাকায় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাতায়াতের অধিকার বা ছাড়পত্র দেওয়া হয়। যা উল্লেখিত আছে তদনুসারে মৌলিক চুক্তি-স্বাক্ষরকারী পক্ষের মতো বিভিন্ন গোত্র একই অধিকার ও কর্তব্যসমূহ লাভ করবে।[৫৪]

(৫৯৩) একটি শর্ত, যা মহানবী নিজের সিলমোহর দেওয়ার পূর্বে যোগ দিলেন তা এই যে, "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যসমূহ হবে পারস্পরিক ক্ষেত্রে সমান।"[৫৫]

(৫৯৪) মহানবী ও মুসলমানগণ কর্তৃক মদিনা হিজরতকালে ফেলে যাওয়া ধনসম্পত্তি যা মক্কাবাসীগণ[৫৬] দখল করেছিল, চুক্তিটি সে বিষয়ে নীরব ছিল এবং নীরবে মুসলমানরা শত্রুদের অধিকারের স্থিতাবস্থা মেনে নেয়।

টীকা ঃ

১। কাস্‌তাল্লানী, المواهب اللدنية ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৬।

২। ইবনে তুলুন, ২ নং (৪)।

৩। কাসতাল্লনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৪। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৫৬৯-৭০।

৫। আবিসিনিয়াবাসীকে স্পর্শ করো না ; যতোক্ষণ তারা স্পর্শ না করে। ইবনে হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ আবু দাউদ, ৩৬ঃ ৮।

৬। বিস্তারিত তথ্যের জন্যে তুলনীয়, আমার (গ্রন্থকারের) Diplomatic Musulmane, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫১।

৭। প্রাগুক্ত।

৮। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৭৭ ; তাবারী, পৃঃ ১৪৭৪ ; সারাখ্‌শী, শারহে-আস-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪-৫।

৯। তুলনীয়, Constitution of the city state of Madinah, Islamic Review, woking, August-November, 1941.

১০। দামরাহ্‌, গিফার, আশ্‌যা ইত্যাদির সংগে সন্ধির জন্য তুলনীয় ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ২৬-২৭ ইত্যাদি ; অথবা গ্রন্থকারের corpus No. 14o-3 ঃ দ্রষ্টব্য।

১১। তুলনীয় তাবারীর তফসীর, ৯ঃ ১-২ আয়াত।

১২। ইবনে হিশাম, ইত্যাদি। অথবা গ্রন্থকারের corpus No. 4. তুলনীয়।

১৩। কুরআন, ৫ঃ ৫১, ৫৫-৫৭।

১৪। কুরআন, ৯ঃ ২৩।

১৫। 'আররাওযুল আনাফ,' ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

১৬। সারাখ্‌শী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭ পৃঃ।

১৭। কুরআন, ২ঃ ২৮২।

১৮। সারাখ্‌শী, শারহে-আস-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১।

১৯। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৩।

২০। প্রাগুক্ত ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২।

২১। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৩।

২২। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১-৬০।

২৩। কালকাশান্দী, صبح الأعشى, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ১১।

২৪। সারাখ্‌শী, শরহে-আস-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩ ইত্যাদি।

২৫। ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৫৯ ; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৭২৪-২৫

২৬। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৭৬ ; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৪৭৪ ; সারাখ্শী, শরহে আস-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫ ।

২৭। সারাখ্শী, শরহে আস-সিয়ারুল কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৪ ।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭ ।

৩০। প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড; পৃঃ ৩৩২-৩৩ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩ ; সারাখশীকৃত, মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯, মাওয়ার্দি, الأحكام السلطانية পৃঃ ৮৪ ; আবু উবাইদ, كتاب الأموال পৃঃ ৪৪৫-৪৬।

৩১। কুরআন, ৬ ঃ ১৬৫, ১৭ ঃ ১৫, ৩৫ ঃ ১৮, ৩৯ ঃ ৭ ; তুলনীয় ৫৩ ঃ ৩৮।

৩২। সারাখ্শীকৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড পৃঃ ১২৯।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬, শারহে আস-সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১।

৩৪। Gerland Die persische Feldzuged ; K. Heraklius.

৩৫। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৪৭ ; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৩৪৭, ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ৬৩ ।

৩৬। তাবারী, ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ২৪-২৫ ।

৩৭। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৭-৯৮ ; ইবনে আবদুল বার কৃত ইসতিআব (استيعاب), নং ২৭৮।

৩৮। কারণ নাখলা ইত্যাদির উপর কয়েকটি মুসলিম হামলার দরুণ এই পথ বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল ।

৩৯। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মক্কার দক্ষিণে খুযা'আ, এবং উত্তর ও পূর্বদিকে তো ছিলই ।

৪০। ইবনে সাদ, ১/১, পৃঃ ৪৮।

৪১। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৮; Cactani, anno, 6.

৪২। সারাখ্শীকৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯২ ; শারহে আস-সিয়ারুল কবীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯ ।

৪৩। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৮।

৪৪। প্রাগুক্ত।

৪৫। মূল বিষয়বস্তুর জন্য ইবনে হিশাম পৃঃ ৭৪৭-৪৮, ইবনে ইসহাক (পাণ্ডুলিপি ঃ প্যারিস) ১৭০-ক ফোলিও ; ওয়াকিদী, মাগাযী (পাণ্ডুলিপি ঃ বৃটিশ মিউজিয়াম) ১৪০-ক ফোলিও, ইবনে সা'দ, তাবাকাত, ১/২, পৃঃ ৭০—৭১, তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৫৪৬—৪৭ ; প্রাগুক্ত, তফসীর ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬১ ; আবদ্-আল মুনিম খান, রিসালাত-ই নাবাওইয়াহ্, ৬০ নং, ইবনে হাম্বলের উল্লেখ, বকর-ই-সিরাহ্ (পাণ্ডুলিপি ঃ আয়া সোফিয়া) ; ইবনে কাসীর ; বিদায়া ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৬৮—৬৯, দ্রষ্টব্য।

মূল বিষয়বস্তুর সারাংশ ও নির্দিষ্ট কতিপয় পার্থক্যের জন্য আবু-উবাইদকৃত, আমওয়াল পৃঃ ৪৪১—৪৪ ; বুখারী ঃ ৬৪ ঃ ৩৩ ; ৬৪ ঃ ৩৫ ; (২৯), ৫৩ ঃ ৬-৭ ; ৫৪ ঃ ১ ; আবু ইউসুফকৃত, খারাজ ; পৃঃ ১২৯ ; আলী আল-মুত্তাকী ; কান্‌জ আল-উম্মাল, ৫ম খণ্ড, নং ৫৫৩৪-৩৬—ইবনে আবি শাইবাহ ইবনে তুলুন; ইলম আস্-সায়লিন নং ২৬-এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য। আরও উদ্ধৃতির জন্য ওয়েন সিঙ্ক, মিফতাহ্ কান্‌জ আস্-সুন্নাহ্ এস. ভি. প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৪৬। সারাখ্‌শী شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১ ; ইবনে সা'দ ঃ ১/২, পৃঃ ৭১ ; Lammens La Mecque—136.

৪৭। হালাবী কৃত ইনসান ; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬, দাহ্‌লানকৃত সিরাহ্ ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬ ; কেরামত আলীর সিরাহ্, অধ্যায় হুদাইবিয়া।

৪৮। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৪৮ ; তাবারীর ইতিহাস পৃঃ ১৫৪৭-৪৮ ; ইবনে সা'দ, ১/২, পৃঃ ৭৩।

৪৯। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৫৪।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫৪-৫৫; কুরআন ৬০ ঃ ১০-১১।

৫১। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৫২-৫৩।

৫২। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪৮ থেকে ৫১ তুলনীয়।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯০। তিন দিন পরে মহানবী (সঃ) শহর ছেড়ে দেন এবং তিনি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে শহরটি স্থায়ীভাবে দখলে

রাখার সুযোগ কাজে লাগাননি,—সুযোগ কাজে লাগালে কেউ তাকে উৎখাত করতে পারত না,—কোরেশরাও তাকে হটাতে পারতো না,—বিশেষতঃ তারা নিজেরাই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

৫৪। বুদাইলের প্রতি মহানবী (সঃ)-এর পত্র। ইবনে সা'দ, ২/২, পৃঃ, ২৫ ; আবু উবাইদ, পৃঃ ৫১৫—
[اخذت لمن هاجر منكم مثل ما اخذت لنفسى]
(আমি নিজের জন্যে যে সব অধিকার অর্জন করেছি তোমাদের মধ্যে যারা বাসস্থান পরিবর্তন (হিজরত) করেছে, তাদের জন্যেও তাই অর্জন করেছি।)

৫৫। ইবনে সা'দ, ১/২, পৃঃ ৭৪। দলিলের শেষে মহানবী (সঃ) লিখেছিলেন : "আমাদের জন্যে তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের জন্যে আমাদের প্রতি অধিকার সংক্রান্ত প্রয়োগ-বিধি একরকম হবে।"

৫৬। কুরআন, ৫৯ : ৮ ; বুখারী ৬৪ : ৮৪ (৩), সারাখ্শীকৃত মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫২ ; ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩২১-২২ ও ৩৩৯।

———

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

১। পীড়িত ও আহতদের সেবা ও চিকিৎসা নিরপেক্ষতা ও জাতীয় পর্যায়ে ঃ

(৫৯৫) চিকিৎসা পুরোপুরি মানবীয় সেবা। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিগণের কোনো অনিষ্ট করা হয় না, যদি তারা প্রতিরোধ বা বাধা না দিয়ে থাকে তাদের বন্দী করা হত।[১]

(৫৯৬) বহু আগের আইনবিদ বা ফকিহ শায়বানী (মৃত্যু ১৮৯ হিঃ) মুসলমানগণ কর্তৃক নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এমন কি অমুসলিমদের চিকিৎসা ও সেবার কথা উল্লেখ করেছেন। এমন কি, কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক অমুসলমানদের প্রতি মুসলমানদের চিকিৎসা ও সেবার বিষয়টিও অনুমোদন করা যেতে পারে।[২] "এবং দানশীলতা ও সততার ব্যাপারে সহযোগিতা করো।" (تعاونوا على البر والتقوى)

(৫৯৭) হযরত রসূলে করীমের জীবদ্দশাতেও এ বিষয়ে বেশ দৃষ্টান্ত ছিল। ওহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হাসপাতাল, শুশ্রূষাকারীও আহতদের পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল।[৩] খলীফা হযরত উমরের শাসনকালেও বাহিনীর ভিতর চিকিৎসক থাকতো।[৪]

২। সেনাবিভাগীয় আদালত :

(৫৯৮) মহানবীর জীবদ্দশায় কোনো অভিযানের সংগে বিচারক থাকার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল ব'লে কোনো উল্লেখ নাই, সেনাপতি স্বয়ং বিচারকের কাজও করতেন। খলীফা উমরের সময়ে[৫] প্রথম

সেনাবাহিনীর সংগে বিচারপতি থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা সেনাবাহিনীর সভ্যদের অভিযোগই কেবল ফয়সালা করতেন না, অধিকন্তু জল-স্থলে প্রাপ্ত গণিমতেরও বিলি-ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম ফৌজদারী বিধির কিছু আইন অভিযানকালে কার্যকরী হত না, যতক্ষণ বাহিনী শত্রু এলাকায় থাকত।[৬]

(৫৯৯) যদি কোনো কাজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে করা হত, তা হলে সেই কাজের দরুণ আজ্ঞাবাহীর কোনো অপরাধ হত না; শত্রু সে ক্ষেত্রে তার বিচার করতে পারত না। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো কর্মচারী কিংবা সর্বোচ্চ কর্মচারী যদি অবৈধ বা অন্যায় কাজ করে বসত, তা হলে ভুক্তভোগীকে তাঁর সরকার ক্ষতিপূরণ দিত। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তার সরকার কর্তৃক সেই কর্মচারীর সংশোধনমূলক শাস্তির বিধান আসে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বনু জাযিমার বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে, যখন প্রত্যেকটি জীবনের বিনিময়ে মুসলিম সরকারকে যুদ্ধপণ দিতে হয়েছিল এমন কি, নিহত কুকুরের জন্যও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। বিপুল অর্থও দেওয়া হয়েছিল। যদি অজ্ঞাতে কোনো ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকে সে ক্ষতি পূরণের জন্য।[৭]

(৬০০) মহানবী দাসদের মুক্তির জন্য এতো আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যদি শত্রুর দাসগণ তাদের প্রভুকে ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করতঃ ইসলামী এলাকায় চলে আসে, তা হলে তাদেরকে আযাদ বলে গণ্য করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবীর কালের বেশ কয়েকটি ঘটনাকে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়।[৮]

৩। বিপদকালে নামায আদায়:

(৬০১) ইসলামের ধর্মীয় নীতি এবং মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক ভিত্তির ব্যাখ্যা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উপর লিখিত প্রত্যেকটি প্রাচীন গ্রন্থে করা হয়েছে এবং কুরআনেও এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৯] অর্থাৎ, যুদ্ধকালেও পাঁচবার জামায়াতের

নামায ত্যাগ করা চলবে না। মুসলমান সৈনিকগণকে দৈনিক বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে এবং এবং তারা পার্থিব কোনো লাভের জন্য আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবে না।[১০]

৪। কখন এবং কেন মুসলমানরা সন্ধি করতে সম্মত হবে ঃ

(৬০২) কুরআন হতে দুই-একটি উদ্ধৃতি এ বিষয়টিকে পরিস্ফুট করবে।

ক) 'সুতরাং দ্বিধা করো না এবং যখন তোমরা প্রবল থাকো তখন শান্তির জন্য অধীর হবে না। এবং আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন, এবং তোমাদের কর্মের জন্য পুরস্কার দান করতে তিনি ইতস্ততঃ করবেন না।'[১১]

খ) 'এবং যদি তারা শান্তি চায় আপনিও হে মুহম্মদ! শান্তির প্রতি অনুরাগী হোন। জেনে রাখুন, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।'[১২]

(৬০৩) ইহা লক্ষ্যনীয় যে, বিজয়ী মুসলমানকে শান্তি-প্রস্তাব দিতে হবে, শত্রুর বিনাশ সে কামনা করবে না। মুসলমানের জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর পতাকার বিজয়, কোনো পার্থিব লাভ নয়।

৫। আন্তর্জাতিক ও ভ্রান্তিমূলক আত্ত-হত্যার ফলাফল ঃ

(৬০৪) মহানবীর আমলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মুসলিম আইন ও আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করতে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি ঃ

ক) উল্লেখ আছে যে, মুনাফিক হারিস ইবনে সুওয়ায়েদ ওহুদে ইচ্ছাকৃত ভাবে আল-মুজায্যার ইবনে যিয়াদকে হত্যা করে বসে, যখন মুসলিম বাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিত শত্রু হামলার দরুণ কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। এই হত্যার কারণ সময় অতিবাহিত করা এবং প্রাক-ইসলামী এক প্রাচীন কলহের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। মহানবী বিচারের পর অপরাধীর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন।[১৩]

খ) ওহুদে, উক্ত বিশৃঙ্খলার সময়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভাবে, সতর্কীকরণ সত্ত্বেও, হুযায়েল ইবনে জাবির মুসলমান সৈনিকদের হাতে নিহত হয়ে যান। তথাপি পরিস্থিতি এমন জটিল এবং আয়ত্বের বাইরে

চলে গিয়েছিল যে, এরূপ দুর্বল প্রতিবাদ কদাচ কার্যকর হতে পারতো। মহানবী এ ঘটনা শুনে বায়তুল মাল হতে রক্তের বিনিময়ে অর্থ দেওয়ার আদেশ দেন, তথাপি সেই মৃত ব্যক্তির পুত্র এই অর্থের উপর তার দাবি ত্যাগ করেন এবং বলেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।"[১৪]

গ) খন্দকের যুদ্ধকালে রাত্রিতে দুই মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা হয় এবং পরিচয় উদ্ঘাটিত হবার পূর্বেই কিছু রক্তপাত হয়ে যায়; ফলে কিছু নিহত ও কিছু আহত হয়ে পড়ে। মহানবী তাদেরকে ভুলের দরুণ সুবিধা দেন এবং শাস্তির ব্যবস্থা না করে বিষয়টি মিটিয়ে দেন এবং বলেন, "উভয় পক্ষের মৃত ব্যক্তিরা হবে শহীদ এবং তাহারা বেহেশ্তবাসী হবে ; এবং উভয় পক্ষেরই ব্যক্তিরা আল্লাহর পথে কাজ করেছে এবং কোন পক্ষের জন্যে কোন ক্ষতিপূরণের অধিকার থাকবে না।"[১৫]

৬। পরাজিত শত্রুর প্রাপ্য ঋণ ঃ

(৬০৫) আমরা উপরে উল্লেখ করেছি (একাদশ অধ্যায়, যুদ্ধের ফলাফল), যুদ্ধের ঘোষণা হলেই শত্রুর প্রাপ্য ঋণ ও আমানত নষ্ট হয় না ; পক্ষান্তরে তা পূর্ববৎ ঠিকই থাকে।

(৬০৬) ইহা লক্ষ্যণীয় যে, শত্রুর পরাজয়ের দরুণ তার প্রাপ্য ঋণ হতে সে বঞ্চিত হয় না, যদি সে ঋণ আইনত তার প্রাপ্য হয়। এর পিছনে মহানবীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত হাদীস অনুসারে পরাজিত ইহুদী গোত্রের সম্পর্কে আমরা জানি ; যখন মহানবী তাদের গৃহ হতে বহিষ্কারের আদেশ দেন তখন তাহারা বলল ঃ "কিন্তু আমাদের ঋণ প্রাপ্য আছে, যার পাওনার তারিখ এখনও আসে নাই।" মহানবী প্রস্তাব দিলেন ঃ "কিছু বাদ দিয়ে তাদের আসল শোধ করো।" পুনরায় যখন মহানবী বনু নাযির সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করেন তখন তারা বলল ঃ "অনেক লোকের নিকট হতে আমরা ঋণ পাই, যার দেয়ার তারিখ এখনো আসে নাই।" মহানবী পূর্ববৎ একই আদেশ দিলেন।[১৬]

(৬০৭) পূর্বেকার এ দুই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বাস্তবিক পক্ষে পারস্পরিক আর্থিক দেনা-পাওনা কখনো নষ্ট হয়ে যায় না ; পক্ষান্তরে

প্রাপক ও খাতক উভয়ের মধ্যে ঋণের বাধ্যবাধকতা অক্ষুন্ন থাকে যুদ্ধ এবং পরাজয়, এমন কি শর্তহীন আত্মসমর্পণ হলেও। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণকে কিছু বাদ দিয়া তৎক্ষণাত দেয় ঋণে পরিণত করলেও এমন একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার যা পূর্ণ আর্থিক দাবিকে স্বীকৃতি দান করে।

টীকা ঃ

১। সারাখশী ঃ শরহে আস-সিয়ারুল কবীর, ৫র্থ খণ্ড ঃ পৃঃ ১১২—১১৩।

২। কুরআন ; ৫ ঃ ২।

৩। পূর্বোল্লেখিত ২২শ অধ্যায়ে 'মুসলিম সেনাবাহিনীতে মহিলা' শীর্ষক আলোচনার ৫২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ তুলনীয়।

৪। তাবারীর ইতিহাস ঃ পৃঃ ২২২৩।

৫। প্রাগুক্ত ; পৃঃ ২২২৫-২৬।

৬। সারাখ্শী ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১০৮।

৭। ইবনে হিশাম ; পৃঃ ৮৩৩।

৮। ইবনে হিশাম ; তায়েফ ও খায়বরের যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

৯। কুরআন ; ৪ ঃ ১০১—১০৩

১০। পূর্বোক্ত, ৩৭৮ নম্বর আনুচ্ছেদ ঃ মহানবীর বাণী ; "কেবল সে একাই বেহেশ্‌ত যাবে যে আল্লাহর আদেশের আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করে।"

১১। কুরআন ; ৪৭ ঃ ৩৫।

১২। কুরআন ; ৮ ঃ ৬১।

১৩। তুলনীয় ; ইবনে হিশাম ; পৃঃ ৫৭৯। ইবনে হাবিব মুহাব্বার : পৃঃ ৪৬৭।

১৪। তুলনীয়, ইবনে হিশাম ; পৃঃ ৬০৭।

১৫। বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী ঃ আল্‌-যাখিরা আল-বুরহানিয়া শায়বানীর মতে ঃ পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল ; অধ্যায় সিয়ার ; পৃঃ ২৩।

১৬। সারাখ্শী ঃ شرح السير الكبير ; ৩য় খণ্ড. পৃঃ ১৮০ ও ২২৯।

চতুর্থ খণ্ড

নিরপেক্ষতা

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

(৬০৮) যুদ্ধকালীন দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে কোনো রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা দুই স্বাধীন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক রাষ্ট্রের অবস্থানের মতোই প্রাচীন ব্যাপার। তথাপি এ সম্বন্ধে আইনের ধারণা আধুনিক কালের পূর্বে এমনভাবে গড়ে উঠে নাই, যার ফলে আইনের পুস্তকে এটা বিশেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা যায়। মুসলমান লেখকগণ কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তির আলোচনাকালে উহা উল্লেখ করেছেন—ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেছে কিনা; তার পরিপ্রেক্ষিতে। অধিকন্তু, তথ্যাবলী অত্যন্ত স্বল্প; এবং আমি যতদূর জানি, এই-ই প্রথম প্রচেষ্টা[১] যখন বিক্ষিপ্ত উপকরণ হতে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

টীকা ঃ

১। গ্রন্থকারের Z. D. M. G. ১৯৩৫-এর প্রবন্ধ Die Neutralitaet Im Islamischen Voelkerrecht,' তুলনীয়।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরপেক্ষতার ব্যবহারিক পরিভাষা

(৬০৯) আধুনিক আরবগণ নিরপেক্ষতার জন্য হিয়াদাহ্ (حياد) শব্দ ব্যবহার করেন। প্রাক-ইসলামী এবং প্রাচীন কালের মুসলমান আরবগণ ইতিযাল (اعتزال) শব্দ ব্যবহার করতেন। যদিও এ শব্দটি বিশেষ মুসলমান দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার পোষকগণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তথাপি এর আইনগত অর্থের উদ্ভব মনে হয় মুতাযিলাদের নিরপেক্ষতা নীতি হতে—যা তারা সুন্নীও খারিজিদের প্রতি প্রদর্শন করত।[১]

(৬১০) দীর্ঘ আলোচনার পর রোমের অধ্যাপক নালিনো (Nallino) একইভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

১) ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় মুতাযিলা নামটি প্রথমে 'গোঁড়া ধর্মানুসরণ হতে বিচ্যুতি' বুঝাত না এবং তাই গোঁড়াদের নিকট ইহা নিন্দনীয় ছিল না (সুন্নীরা অবশ্য একে 'ধর্মদ্রোহিতার ঘোষণা' হিসাবে ঘৃণ্য বা অপরাধ হিসাবে গণ্য করত)। ঐ নামটি নিরপেক্ষতার অর্থে প্রাচীন-কালের মুতাযিলারা গ্রহণ করেছিল—'পাপী লোকের অবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে যারা গোঁড়া সম্প্রদায় কিংবা খারিজী—যারা কারো সংগে যোগদান করে নাই সে তথাপি মুসলমানই থাকবে ; না পাপ করার দরুণ সে বিধর্মী হয়ে যাবে।'[২]

২) যেহেতু উপরোক্ত প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করেছিল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধের ফলে, স্বাভাবিক-

ভাবে মুতাযিলী শব্দটি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পরবর্তীকালীন গোঁড়া মুতাযিলাগণ আসলে প্রাচীন রাজনৈতিক বা নিরপেক্ষ মুতাযিলাদের অনুসারী বা উত্তরাধিকারী ছিল তত্ত্ব ও কিয়াসের ক্ষেত্রে।

(৬১১) মামুন ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে মুতাযিলাগণ দর্শন ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন প্রভাবশালী হয়েছিল যে আরবী জ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগে ও শব্দটির সাবেক আইনগত ও দর্শনগত অর্থ অনতিবিলম্বে অপ্রচলিত হয়ে যায়।

(৬১২) প্রাক-ইসলামী আরবে নিরপেক্ষতা অবিদিত ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য কিছু উদ্ধৃতি আশাকরি অসংগত হবে না। এগুলি সেইসংগে প্রাক-ইসলামী আরব রীতির ঐতিহাসিক পটভূমিও যোগাবে যা মুসলিম আইনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে (এই পুস্তকের ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

(৬১৩) ১) সম্রাট ডেসিয়াস (Decius মৃঃ ২৫১ খ্রীঃ) ও সিরিয়ার গাস্সানীয় যুবরাজের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও মিত্রতার চুক্তি।

(৬১৪) ইয়েমেন হতে সিরিয়ায় গাস্সানীয়দের হিজরত করার জুমাইটগণ সিরিয়ায় অবস্থান করেছিল এবং বাইযানটাইন সম্রাটের পক্ষ হতে প্রত্যেক নবাগত ব্যক্তির নিকট হতে তার সাধ্য মতো কর আদায় করত। প্রথম দিকে আশ্রয় প্রার্থী গাস্সানীয়রা এই কর দিতে স্বীকার করত, কিন্তু পরে তারা তা দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটে; যার ফলে জুমাইটগণ ধ্বংস হয়ে যায়। সম্রাট আশঙ্কা করেছিলেন যে, গাস্সানীয়রা পারস্যবাসীদের দিকে ঢলে পড়বে। সুতরাং তিনি সর্দার সা'আলাবার নিকট এই প্রস্তাবটি পেশ করেন:

'তোমরা শক্তিশালী ও সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং তোমরা এই গোত্রটিকে যারা আরবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল,—বিনাশ করেছো।- আমি তাদের পরিবর্তে তোমাদেরকে অবস্থান করাব এবং তোমাদের সংগে এই মর্মে সন্ধি করব যে, যদি কোনো আরব তোমাদিগকে হামলা করে, আমি তোমাদিগকে ৪০,০০০ রোমান

সৈন্য দ্বারা সাহায্য করব, এবং যদি আরবরা আমাদেরকে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা ২০,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে; এবং তোমরা পারস্যবাসিগণের সংগে যেন সহযোগিতা করো না।' সা'আলাবা এতে সম্মত হওয়ায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।[৩]

(৬১৫) সম্রাট সাআলাবাকে শাসক বানালেন এবং তাঁকে মুকুট দান করলেন। সম্রাটের নাম ছিল ডেসিয়াস।[৪]

(৬১৬) ২) ৪০ বৎসর ব্যাপী বিখ্যাত বেসাসের যুদ্ধে বনু বকর ও তাগলিব গোত্রের নিরপেক্ষতার উল্লেখ দেখা যায়। আল-কালবী বলেন ঃ

"যখন তাগলিব গোত্রের সর্দার কুলায়েব বকর গোত্রের জনৈক যুবকের হস্তে নিহত হয় তখন বকর গোত্রের নিকট একটি দল পাঠানো হয় অপরাধীর কিংবা সর্দারের অথবা গোত্রের যে কোনো আমীরের (অভিজাতের) দেশ হতে বহিষ্কারের দাবি করে; অন্যথায় যুদ্ধের হুমকি দেওয়া হয়। যেহেতু খুনী পলায়ন করেছিল তাই শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সত্বর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় যাতে রাবেয়া গোত্রের অধিকাংশ শাখা তাগলিব গোত্রের পক্ষে ও বকর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু বকর গোত্রের অনেকগুলি শাখা নিরপেক্ষ থেকে যায় এবং তাদের আত্মীয়-পরিজনের সংগে ওরা আদৌ যোগ দেয় নাই। ঐরূপ শাখাগুলির নাম ছিল ইয়াশকুর, ইজল, বনু হানিফা এবং বনু কায়েস ইবনে সা'আলাবা। বিশেষতঃ শেষোক্ত শাখার সর্দার আল-হারিস ইবনে আ'ব্বাদ, যিনি বিখ্যাত বীরপুরুষ ও কবি। আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ ও চাপ সত্ত্বেও স্বীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। এই ছিল মুখ্য কারণ, যার জন্য অন্যান্য শাখাও যুদ্ধ হতে বিরত ছিল এবং বলেছিল ঃ "ওহে শায়বানের অধিবাসিগণ! তোমরা তোমাদের ভাইদের (তাগলিব) উপর অত্যাচার করেছ এবং তোমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজকে (অর্থাৎ কুলায়েবকে) হত্যা করেছো। আমরা কখনো তোমাদিগকে সাহায্য করবো না।

দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময় বকরের সর্দারদের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করে, যে সব গোত্র ছিল নিরপেক্ষ তাদের মধ্যে ও অনেককেই সে যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করাতে সমর্থ হয়েছিল। কেবল আল-হারিস ইবনে আব্বাদ দূরে ছিল। তথাপি যখন তার পুত্র বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিহত হল, তখন সেও নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে। বলা হয় যে, সে ঐ উপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেছিল ঃ

'আমি বকর হইতে দূরে রহিলাম যেন
তাহারা সদ্ব্যবহার করে
তথাপি তাগলিব গোত্র চায় না যে
আমি নিরপেক্ষ থাকি।'

পক্ষান্তরে তাগলিব গোত্রের অনেক লোকও নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবস্থার চাপে তারা অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়, ফলে বকর ও তাগলিবের সকল শাখাই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়।[৫]

(৬১৭) ৩) যখন খুযা'আ গোত্র মা'রিব বাঁধটি ভেঙে যাওয়ার আশংকায় ইয়েমেন হতে উত্তরে হিজরত করে তখন তাদের সর্দার আম্‌র মক্কায় তার পুত্রকে পাঠায় মক্কাবাসীদের নিকট অনুরোধ জানাতে যে—

'তোমাদের দেশে কিছুকাল অবস্থান করতে আমাদিগকে অনুমতি দাও, ততোদিন পর্যন্ত; যতোদিন আমাদের লোকেরা, যারা ইরাক ও সিরিয়ায় উপনিবেশ সন্ধানে গিয়েছে, তারা ফিরে না আসে।'

(৬১৮) মক্কার জুরহুম গোত্র সে প্রস্তাবে সম্মত হলো না। ফলে এক যুদ্ধ বেঁধে গেল। অনেক জুরহুমী সর্দার নিরপেক্ষ রইল। এমন কি কিয়ৎকালের জন্য সপরিবারে তারা মক্কা ত্যাগ করল। খুজা'আ গোত্র জয়ী হল। জুরহুম ও খুযাআ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধে ইসমাইলী গোত্রগুলি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। অতঃপর তারা বিজয়ী খুজা'আ গোত্রের নিকট গিয়ে মক্কায় বাস করবার অনুমতি চাইল, তারা অনুমতি পেলো। এ কথা শুনে মুদাদ খুজা'আ গোত্রের নিকট দূত পাঠাল এবং যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার কারণে তারাও একই অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু খুজা'আ এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল।[৬]

(৬১৯) ৪) মহানবীর পূর্বপুরুষ কুশাই তাঁহার আত্মীয় কুদা'আ গোত্রের সাহায্যে মক্কার প্রধান সর্দার হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে

তিনি তাঁর কয়েকজন পুত্রের ভিতর তাঁর কার্যাবলীর ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেওয়ায় তারা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এবং প্রত্যেক পক্ষ বিদেশী মিত্রের সাহায্য লয়। সমস্ত স্থায়ী গোত্র কোনো না কোনো পক্ষে যোগদান করে। কেবল দুটি গোত্র নিরপেক্ষ থাকে এবং কোনো পক্ষেই যোগ দেয় নাই।[১]

(৬২০) হাদীসে ও এই বিষয়ে অনেক কৌতূহলপূর্ণ বিষয় আছে। নিম্নলিখিত কতিপয় উদ্ধৃতি বুখারী হতে গৃহীত হয়েছে।

ক) শোনা যায়, মহানবী বলেছিলেনঃ অতিসত্বর মুসলিম সমাজে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এবং ধার্মিক-বিশ্বাসীর তখন কাজ হবে সে অশান্তির মধ্যে ঘরে বসে থাকা, (অর্থাৎ নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত থাকা) এবং কোনো দলের সংগে যোগ না দেওয়া। মুহাদ্দিস বলেন, এই হাদীস অনুসারে আলী ও মুআবিয়ার মধ্যে যুদ্ধে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিরপেক্ষ ছিলেন।

খ) মহানবী আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন, দুনিয়ার শেষ যামানায় ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে মুসলমান ও রোমানদের (পাশ্চাত্যবাসী) মধ্যে। রোমানরা একদল মুসলমানের নিকট প্রস্তাব দেবে "এসো, আমরা যুদ্ধ করি ঐ সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে ; যারা আমাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকে বন্দী করেছে।" মুসলমান দল উত্তরে বলিবে ঃ "না, আমরা আমাদের ভাইদের ত্যাগ করতে পারি না।" এই যুদ্ধ পাশ্চাত্য শক্তির (রোমানদের) অবসান ঘটাবে।

গ) ইবনে ইসহাক বলেন ঃ বাইযানটাইন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুতার বিরুদ্ধে মহানবী যখন অভিযান প্রেরণ করেন, অনেক বেতনভোগী আরব গোত্র তখন গ্রীক পতাকা তলে সমবেত হয়. তবু হাদাস গোত্রের বনু গাস্সান শাখা নিরপেক্ষ ছিল, অথচ ঐ গোত্রের অন্যান্য শাখা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।[২]

ঘ) হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সাময়িক বিরতিকালে মক্কার বাস্তুহারাগণকে (এমন কি এবং যদি ও তারা মুসলমান ছিল) যখন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করার কথা তখন এ খবর জানতে পেরে আবু বুশাইর

যিনি মক্কা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন মক্কা বা মদীনা কোথাও না গিয়ে আল-ইস-এ আশ্রয় গিয়েছিলেন। আবু বুশাইর ও তার সঙ্গীদের এই নিস্পৃহ থাকার মনোভাবকেও ই'তিযাল বলা হয়।[১০]

টীকা:

১। লিসানুল আরব (ع ز ل)।

২। Rivista degli Studi Orientali, Roma, 1916 PP. 447. et. Seq.

৩। ইবনে হাবিব: كتاب المحبر fol. 131a, MS. British Museum; PP. 371-72 ed. Hyderabad.

৪। প্রাগুক্ত।

৫। كتاب بكر و تغلب জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের; পাণ্ডুলিপি: বৃটিশ মিউজিয়াম।

৬। كتاب الاغاني ১৩শ খণ্ড, পৃ: ১১০।

৭। ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৪-৮৫।

৮। সুহায়লারী: الروض الانف ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩।

৯। ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৯২।

১০। তুলনীয়, মু'সাব, নসব কুরাইশ: পৃ: ৪২০।

তৃতীয় অধ্যায়

নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা

(৬২১) এ যাবত আমরা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিষয় আলোচনা করেছি। ঐগুলির বিশেষ গুরুত্বের জন্য এই অধ্যায়ে কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ সংগ্রহ করা যেতে পারে:

ক) তোমরা কি মুনাফিকদের লক্ষ্য করো নাই? যারা মুসলমান বা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কিছু অবিশ্বাসী ভাইদের বলে: যদি তোমরা বিতাড়িত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে বাইরে যাব এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে কারও আদেশ পালন করব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সাহায্য করব! এবং আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

বস্তুত: যদি তারা বিতাড়িত হয়, তারা কখনও তাদের সংগে যাবে না এবং বাস্তবিকপক্ষে যদি তারা সাহায্যও করত তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত এবং তখন বিজয় কখনো হতো না।[১]

(৬২২) এই আয়াতগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, মদীনার অধিবাসীবৃন্দের ভিতর হ'তে মুনাফিকগণ তাদের বন্ধুদের সাহায্য করতো না। ইহুদীদের বনু নাযির গোত্র, (তুলনীয়, তাবারীর তাফসীর; অষ্টবিংশ খণ্ড, পৃ: ২৯), কিন্তু মুসমানদের সংগে তারা নিরপেক্ষ থাকবে।

(৬২৩) নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি আরও বেশী কৌতুহলজনক যাতে মসলমানদেরকে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী কিছু গোত্র হতে সতর্ক

থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের সংগে তাদের শত্রুদিগকে সাহায্য করে নাই ; তারা নিরপেক্ষতা ভংগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশ দিয়া থাকে।

খ) যে সকল পৌত্তলিক তোমাদের সংগে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এবং যারা তোমাদের উপর আদৌ অধিকারের হস্তক্ষেপ করে নাই, কিংবা তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করে নাই। এদের সংগে চুক্তি মুতাবিক কাজ করো। লক্ষ্য রাখো, আল্লাহ্ কর্তব্য পরায়ণদের ভালোবাসেন।[২]

গ আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না—দয়া ও সুবিচার করতে ঐ সব লোকদের প্রতি, যারা ধর্মের জন্য তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে নাই। অথবা তোমাদেরকে গৃহ হতে বিতাড়িত করে নাই। শোন, আল্লাহ্ সুবিচারকদের ভালোবাসেন। আল্লাহ্ কেবল ওদের সম্বন্ধে বলেন, যারা ধর্মের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং গৃহ হতে বহিস্কার করেছে এবং বহিস্কৃত করতে সাহায্য করেছে, যাতে তোমরা তাদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করো। যারা তাদের সংগে বন্ধুত্ব করে তারা দুস্কৃতিকারী।[৩]

(৬.৪) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত' সম্ভবতঃ নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতটি, যাতে নিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে :

ঘ) মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুই দলে কেন বিভক্ত হচ্ছো—ঐ মুনাফিকগণ বেঈমান ; যাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে বেঈমান করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ করেছেন তুমি তাকে পথ দেখাবে? আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেছেন, হে মুহম্মদ, তুমি তাকে পথ দেখাতে পারবে না। তারা কামনা করে যে, তোমরা অবিশ্বাসী হবে, যাতে তোমরা তাদের শামিল হয়ে যাও। সুতরাং তাদের ভিতর হতে বন্ধু বাছাই করো না, যতোক্ষণ তারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ না করে।[৪] যদি তারা শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে তাদের পাবে হত্যা করবে এবং তাদের ভিতর হতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করো না, ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য হবে তারা, যারা

আশ্রয় লয় ঐ মানুষদের নিকট যাদের সংগে তোমাদের চুক্তি আছে অথবা তোমাদের নিকট যারা আসে; তোমাদের সংগে যুদ্ধ করবে না বলে কিংবা তাদের লোকদের সংগে যুদ্ধ করবে না বলে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর শক্তিশালী করতেন, ফলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। সুতরাং তোমাদের ব্যাপারে যদি তারা নিরপেক্ষ থাকে এবং তোমাদের সংগে যুদ্ধ না করে শান্তির প্রস্তাব করে. আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে বলেন না। তোমরা অন্যান্যদের পাবে, যারা তোমাদের নিকট হ'তে ও তাদের লোকের নিকট নিরাপত্তা আশা করে। তারা বার বার দুস্কৃতি করে ও তাতে নিমজ্জিত হয়। যদি তারা নিরপেক্ষ না থাকে এবং তোমাদের সংগে শান্তি স্থাপন না করে, তাহলে যেখানে দেখ তাদের ধরো ও হত্যা করো। তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে পরিস্কার বিধান দিয়েছি।[৫]

টীকা ঃ

১। কুরআন, ৫৯ ঃ ১১-১২।

২। কুরআন, ৯ ঃ ৪, তুলনীয় ৮ ঃ ৫৮-৬০।

৩। কুরআন, ৬০ ঃ ৮-৯।

৪। অর্থাৎ মুসলিম এলাকায় হিজরত করে।

৫। কুরআন, ৪ ঃ ৮৮-৯১।

চতুর্থ অধ্যায়

মহানবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় নিরপেক্ষতার চুক্তিসমূহ

(৬২৫) কুরআনের বিধানের পরেই প্রাচীন যুগের কার্যকলাপের গুরুত্ব বলা যেতে পারে। যা কিছু অদ্ভুত ঘটনা এবং কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে ঃ

১) ঘটনাবলী

(৬২৬) ক) ইহুদী বনু নাযির গোত্রের সংগে বনু গাতফান গোত্রের মিত্রতা ছিল এবং পার্শ্ববর্তী বনু কুরায়যার পক্ষে বনু নাযির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিল। এসব শক্তিশালী মিত্রের সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে বনু নাযির চতুর্থ হিজরীতে মুসলমান ও তাদের মিত্রদের পূর্ব চুক্তিবদ্ধ রক্তপণ দেওয়ার জন্য মহানবীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের দুর্গে তারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বনু কুরায়যা যা হোক, নিরপেক্ষ ছিল এবং বনু নাযিরকে কোন সাহায্য করে নাই।[১]

(৬২৭) খ) মদীনা ছাড়তে বাধ্য হয়ে বনু নাযির খায়বারে হিজরত করতঃ বসবাস স্থাপন করে। মক্কাবাসী ও অন্যান্যদের সংগে তাদের চক্রান্তের দরুন[২] মহানবী গোড়াতেই বিপদের মূলোৎপাটনের জন্য সচেষ্ট হন এবং খায়বারের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। অন্য পথে তিনি বনু নাযিরদের মিত্র গাতফানের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন—তাদেরকে মুসলিম ও ইহুদীদের সংঘাতের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ ক'রে। গাতফান গোত্র প্রত্যুত্তরে বলে, "এরূপ একটি বিপদের সময় তারা তাদের বন্ধুদের ত্যাগ করতে পারবে না।"

তাদের ঘাঁটির বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কূটনৈতিক অভিযান, পরিচালিত হলো এবং তাদের গৃহাভ্যন্তরে থাকতে এবং খায়বারের বিরুদ্ধে মহানবীর ইচ্ছামতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেওয়ায় বাধ্য করল।[৩]

(৬২৮) গ) মহানবীর ইনতেকালের পর আরবের কিছু অংশে ধর্মদ্রোহিতাজনিত অশান্তির মধ্যে কায়েস নামক জনৈক ইয়েমেনী সর্দার অন্য এক সর্দার যুল-কুলার নিকট এক বার্তা প্রেরণ করে এই মর্মে ঃ

'আবনা (ইয়েমেনে বসবাসকারী পারস্যবাসী) তোমাদের দেশে অনধিকার প্রবেশকারী এবং তারা বিদেশ হতে আগত। যদি তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তোমাদের উপরও প্রভুত্ব করবে। অতএব তাদের সর্দারদের হত্যা করা এবং আমাদের দেশ হতে অন্যান্যদের বিতাড়িত করা আমি ন্যায়সংগত মনে করি।"

যা হোক, যুল-কুলা ও তার অনুসারিগণ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার সংগে সহযোগিতাও করে নাই, এবং আবনাকেও সাহায্য করে নাই; বরং তারা নিরপেক্ষ রইল এবং বলল ঃ এসবের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ; তোমরা যা ইচ্ছা করো।[৪]

(৬২৯) ঘ) মদীনায় আলজারুদ ইসলাম কবুল করেছিল। মহানবীর মৃত্যুর পর তার গোত্র আবদুল কায়েসও বিদ্রোহের ইচ্ছা পোষণ করেছিল, সে তার লোকজনকে সতর্ক করে দেয় এবং তার ফলে এই গোত্রটি ইসলামের প্রতি অনুগত থেকে যায় ; ফলে বাহ্‌রাইনের মুসলমানদের ও রাবেয়ার বাকী গোত্রগুলির মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তাতে তারা অংশগ্রহণ করে নাই।[৫] তাদের এই নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২) সন্ধি সমূহ

(৬৩০) যে সমস্ত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে; অথবা রাষ্ট্রীয় দলিল বা নথিপত্র—যাতে নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়ে থাকে, সেগুলি (ইসলামের প্রারম্ভকালের) প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। ঐগুলির মধ্যে কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

ক) যখন মহানবী মদীনায় হিজরত করেন ও সেখানে একটি নগর-রাষ্ট্র গঠন করেন তখন তিনি বিশেষ ক'রে মক্কা হতে সিরিয়ার পথে এবং

মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী অমুসলিম আরব গোত্রদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করে মুসলিম শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবার প্রয়াস পান। নিম্নলিখিত চুক্তিটি বনু দামরা গোত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সম্পাদিত হয়েছিল ঃ

'তিনি (মহানবী) বনু দামরাকে হামলা করবেন না কিংবা তারাও তাঁকে হামলা করবে না, কিংবা তারা শত্রু সৈন্যদল বৃদ্ধি করবে না অথবা কোনরূপেই শত্রুদের সাহায্য করবে না।'[৬]

খ) অনতিকাল পরে একই গোত্রের অন্যান্য পরিবারগুলি একত্রিত হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

'আল্লাহ্ রাহ্মানুর রাহিমের নামে। ইহা আল্লাহর রসূল মুহম্মদের লিপি বা প্রতিশ্রুতি বনু দামরার জন্য, যাতে তাদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে ; তারা তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করতে পারে, যদি কেউ তাদের উপর হামলা চালায়, একমাত্র ব্যতিক্রম হবে যদি তারা ধর্মের নামে যুদ্ধ করে। এই আশ্বাস কার্যকরী থাকবে যতদিন সমুদ্র সলিল শুক্তিকে সিক্ত করতে থাকবে। অনুরূপভাবে যখন মহানবী তাদের সাহায্য চাইবেন তারা তাঁকে সাহায্য করবে; এবং তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তাদের সাহায্য করা তাদের আনুগত্য ও সততার উপর নির্ভর করবে।'[৭]

গ) অন্য এক গোত্র, যারা লোহিত সাগরের উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করতে। তারা হচ্ছে বনু গিফার। ঐ সময়ে এরাও একত্রিত হয় এবং তার সন্ধি ছিল এই মর্মে ঃ

'তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, যদি কেউ আক্রমণ করে, এবং যদি মহানবী তাদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তারা তাঁকে সাহায্য দান করবে এবং তাঁকে সাহায্য করা তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে, কেবল ব্যতিক্রম হবে ধর্মের যুদ্ধের বেলায়। এই চুক্তি কার্যকরী থাকবে যতো দিন সাগর সলিল শুক্তিকে সিক্ত করবে।'[৮]

ঘ) যখন মদীনার নগর-রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তখন আরব নগরীর পূর্ব উপকণ্ঠে অনেকগুলি ইহুদী লোকালয় ছিল। তারাও নগর-রাষ্ট্রের সংগে যোগদান করেছিল এবং অন্যান্য জিনিসের সংগে যে সব বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল সেগুলি হল ঃ

'যদি তারা (ইহুদীরা) শান্তির প্রস্তাবে যোগদান করতে এবং এর প্রতি অনুগত থাকতে আহূত হয়, তারা যোগদান করবে এবং অনুগত থাকবে। অনুরূপভাবে যদি তারা চায় মুসলমানরাও তার জন্য বাধ্য থাকবে। ধর্মের জন্য যুদ্ধ হবে এই চুক্তির ব্যতিক্রম।'[৯]

ঙ) সম্ভবতঃ পঞ্চম হিজরীতে বনু আব্‌দ ইবনে 'আদী গোত্রের সংগে মহানবী মিত্রতা ও নিরপেক্ষতার চুক্তি করেছিলেন যার সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ

'মহানবী বনু আবদ ইবনে আদীর একটি প্রতিনিধিদল গ্রহণ করে-ছিলেন। তারা বলল ঃ হে মুহম্মদ! আমরা মক্কার চতুষ্পার্শ্বস্থ পবিত্র ভূমির অধিবাসী এবং এই ভূমির অধিবাসীবৃন্দ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। আমরা আপনার সংগে যুদ্ধ করতে চাই না। পক্ষান্তরে, কেবল মক্কার কোরেশ ব্যতিত আমরা আপনার যে কোনো অভিযানে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা কোরেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।'[১০]

চ) হুদায়বিয়ার বিখ্যাত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার কথার উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ সেখানে একটি বাচনভংগী ব্যবহার করা হয়েছে, যা অভিধান লেখক বা শব্দকোষ সংকলকের মতানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। সে শব্দটি হচ্ছে 'ইসলাল'। এর অর্থ তরবারী কোষমুক্ত করা এবং সেই সংগে নিরপেক্ষতাভঙ্গ এবং চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষের শত্রুকে সাহায্য দান। 'ইসলাল' শব্দটি হুদায়বিয়া চুক্তিতে শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রমাণিত হয়, অন্য দুটি চুক্তি[১১] দ্বারা, যা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সম্পাদিত হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি একটি 'টেকনিক্যাল' ব্যবহারিক শব্দ।

(৬৩১) হুদায়বিয়া চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারা নিম্নরূপ ঃ

'...এবং তারা উভয়েই দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বীকৃত এবং এই সময়ের মধ্যে জনগণ শান্তি উপভোগ করবে এবং পারস্পরিক সংঘাত হতে বিরত থাকবে ... এবং আমাদের মধ্যে বক্ষ বন্ধ থাকবে (অর্থাৎ আমরা শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য) এবং নিরপেক্ষতা ভংগ করে কোনো গোপন সাহায্য করা ও বিশ্বাস ভংগ করে কোনো কাজ করা চলবে না।'[১২]

(৬৩২) অন্যান্য চুক্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

ছ) 'আল্লাহ্ রাহমানুর রহিমের নামে। শত্রু এলাকা তাবরিস্তান ও জিলজিলান সম্বন্ধে ইহা খুরাসানের সেনাপতি ফারুর খানের পক্ষে সুওয়ায়িদ ইবনে মুকাররিনের প্রতিশ্রুতি।'

'তোমরা আল্লাহর হিফাযত সম্বন্ধে নিশ্চিত, তিনি মহিমান্বিত, যদি তুমি তোমার দেশের ও পার্শ্ববর্তী দেশের দস্যু-তস্করের লোভ-লালসার বিরোধিতা করতে পারো এবং যদি তুমি আমাদের বিরোধী কোনো বিদ্রোহীকে আশ্রয় না দাও। এবং তুমি তোমার দেশের সীমান্তে মুসলিম সেনাপতিকে তোমার দেশের মুদ্রায় ৫ লক্ষ দ্রাকমা দান করবে।'

'যদি তুমি এটা করো, আমাদের পক্ষে তোমাদের আক্রমণ করা, তোমার দেশে বিচরণ করা বা প্রবেশ করা ন্যায়সংগত হবে না। যা হোক, অনুমতি নিয়ে আমরা তোমাদের দেশে নিরাপদে পর্যটন করতে পারবো এবং একই আইন প্রযোজ্য হবে তোমাদের পর্যটন সম্পর্কেও।'

'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেবে না, আমাদের কোনো শত্রুকে গোপন সাহায্য দেবে না এবং বিশ্বাসঘাতকের মতো কোনো কাজ তোমরা করবে না। নতুবা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি হবে না।'[১৩]

জ। এ চুক্তি নুওয়ায়েম ইবনে মুকাররিন রায় প্রদেশের সর্দারকে মন্যুর করেছিলেন ঃ

'যদি তোমরা বিশ্বস্ততার সংগে কাজ করো, আমাদের পথ প্রদর্শন করো, অবিশ্বাসের কাজ না করো এবং চুক্তির খেলাফে আমাদের শত্রুকে গোপনে সাহায্য না করো।'[১৪]

ঝ) নিম্নলিখিত শর্তটি নুবিয়ার শাসকের সংগে সম্পাদিত চুক্তি হতে নেয়া হয়েছে, যে চুক্তি তৃতীয় খলীফা উসমানের খিলাফতের সময়ে মিসরের মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল ঃ

'হে নুবিয়াবাসিগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহম্মদের তরফ হতে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করব না, যুদ্ধের প্রস্তুতিও নেব না, কিংবা

তোমাদেরকে আক্রমণও করব না, যে পর্যন্ত তোমরা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির খেলাফে কাজ না করো ... কিন্তু যদি কোন শত্রু তোমাদের উপর হামলা করে তাকে বিতাড়িত করতে বা বাধা দিতে মুসলমানরা বাধ্য থাকবে না যদি ঘটনা উলওয়া ও আসওয়ান এলাকার মধ্যে ঘটে।'[১৫]

ঞ) মিসরের শাসনকর্তা কায়েস ইবনে সাদ খলীফা আলীকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়েছিলেন তৎকালীন গৃহযুদ্ধের সময়ে :

'আল্লাহ্ রাহ্মানুর রাহিমের নামে—

আমীরুল মুমিনিনকে---

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এখানকার লোক নিরপেক্ষ থাকতে চায়। তারা আমাকে অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নির্যাতন না করতে অনুরোধ করেছে।'[১৬]

ট) আলী উত্তর দিলেন :

'যে লোকদের কথা তোমার পত্রে উল্লেখ করেছ, তাদের নিকট যাও। যদি অন্য মুসলমানের মতো তারা কথা শোনে তো ভালো, অন্যথায় তাদের শাস্তি দাও।'

শাসনকর্তা জওয়াব দিলেন :

'আমি বিস্ময় বোধ করছি, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কিরূপে ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন, যারা আপনার নিকট হতে দূরে থাকছে এবং তদ্বারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে! আপনি যদি তাদের সংগে যুদ্ধ করেন তাহলে তারা আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুকে সাহায্য করবে। সুতরাং, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার কথা শুনুন, ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।'[১৭]

ঠ) বনু নাজিয়ার বিদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে লিখিত আলীর খোলা চিঠির কিয়দংশ :

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ মুতাবিক চলতে দাওয়াত দিচ্ছি এবং সেই সঙ্গে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী

সংকাজ করতেও আমন্ত্রণ জানাই। এতদ্ব্যতীত তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার আপনজনের কাছে ফিরে আসে এবং দূরে থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে নৈরাজ্যবাদী ও দস্যুর ফিৎনার সময়ে (অর্থাৎ, বনু নাজিয়া গোত্রের সর্দার খির্রিত), যে আল্লাহ্ ও রসূল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছে এবং দেশ ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে সে বা তারা সকলেই তার বা তাদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস পাবে। কিন্তু যারা তার অনুসরণ করবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আমাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব।[১৮]

ড) ২৮ হিজরীতে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস হামলা করেছিল। একটি সন্ধি চুক্তি হয়েছিল নিম্নলিখিত শর্তে:

'মুসলমানরা সাইপ্রাসের অধিবাসিগণের উপর আক্রমণ করবে না, কিন্তু সেই সংগে তারা ওদের রক্ষা করবে না, যদি অন্য কোন শক্তি তাদের আক্রমণ করে।'[১৯]

ঢ) যখন সিসিলির শাসক ফিম্মি তার বাইযানটাইন প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে টিউনিসের আগ্লাবী রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তিনি সিসিলি আক্রমণ করেন (২৪৪ হিজরীতে)। কিন্তু মুসলিম সেনাপতি ফিম্মি ও তার লোকজনকে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে নির্দেশ দেন এবং বাইযানটাইনদের একা পরাস্ত করেন।[২০]

ণ) আলী ও মুযাবিয়ার ভিতর যুদ্ধে আল-ওলিদ বিন উকবা নিরপেক্ষ থেকে মক্কা চলে যান এবং যুদ্ধের অবসান হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষই সমর্থন করেন নি।[২১]

(৬৩৩) এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনটিতেই নিরপেক্ষতা হতে উদ্ভূত অধিকার ও কর্তব্যের বিবরণ পাওয়া যায় না। এর জন্য ব্যবহারিক দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। পরের অধ্যায়ে সেই বিষয়ই সংগৃহীত হয়েছে।

———

টীকা ঃ

১। ইবনে সাদ, ১/২, পৃঃ ৪১।

২। প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭-৬৬; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৫৫৬; ১৭৭৫-৭৬; মসূদী কৃত, তাম্বিহ, পৃঃ ২৫০।

৩। ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৫৭-৫৮; তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৫৭৫।

৪। তাবারীর ইতিহাস ঃ পৃঃ ১৯৯০।

৫। প্রাগুক্ত ; পৃঃ ১৯৫৮।

৬। ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ৩; আলী আল-কারীকৃত 'সীরাহ্' (পাণ্ডুলিপি ঃ ইস্তাম্বুল; অধ্যায়; যুদ্ধ বিগ্রহ)।

৭। ইবনে সাদ, ২/১ পৃঃ ২৭; সুহায়লারী, الروض الانف ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮-৫৯।

৮। ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ২৬-২৭।

৯। পূরা গঠণতন্ত্রের জন্য ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪১-৪৪ দ্রষ্টব্য। আবু উবাইদ কৃত, আমওয়াল ; ইবনে কসির কৃত ; বিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২৬ ইত্যাদি।

১০। ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ৪৮।

১১। তুলনীয়: لسان العرب c.u. سلل

১২। পূরা পাঠ্য বিষয়ের জন্য পুস্তকের ২৫ তম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ২৬৫৯।

১৪। প্রাগুক্ত: পৃঃ ২৬৫৫। তুলনীয়, জুরজানের সন্ধি, পৃঃ ২৬৫৮।

১৫। মাকরিযি কৃত, খিতাত, ১, ২০০ (বুলাক সংস্করণ)।

১৬। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ৩২৭৪।

১৭। প্রাগুক্ত।

১৮। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ৩৪৩৫।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮২৬।

২০। ইয়াকুত, معجم البلدان

২১। ইবনে সাদ, ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৫ الوليد بن عقبة

—

পঞ্চম অধ্যায়

ফকিহ্‌গণের মতে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন-কানুন

(৬৩৪) পূর্বের অধ্যায়গুলি হতে একথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা এবং বাস্তব রাজনীতিতে তার প্রয়োগ পূর্বেকার মুসলমানদের অবিদিত ছিল না। যেহেতু মুসলমান ফকিহগণ এই বিষয়টিকে পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেন না, কিন্তু এ বিষয়ে সমস্ত আইন-কানুন কিছু শান্তি-সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে এবং কিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, সেই হেতু এখানে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত প্রাসংগিক বিষয়-সমূহ সংগ্রহ করা সহজ নয়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যেমন নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন উন্নত হয়েছে তেমন প্রাচীনকালে হয়নি, যদিও নাৎসী জার্মানীর প্রচণ্ড হামলা এই সব আইনকে তছনছ করে দিয়েছে।[১] তথাপি শায়বানীর প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারী সারাখ্‌শীর রচনায় যতটুকু আমি পেয়েছি এখানে তার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করছি। এই গুলি দ্রুত পঠনের ফলে সংগৃহীত হয়েছে এবং তাই তাঁর রচনায় কিংবা অন্য ফকিহ্‌গণের রচনায় এইগুলি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না—এ ধারণা ভুল।

(৬৩৫) এটা উল্লেখ্য যে, এই সব বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পূর্ণ আইনবিধি প্রণয়ন করার আশা করা যায় না, যথা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্য প্রসঙ্গ।

(৬৩৬) ক) যদি কোনো রাষ্ট্র মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে এবং তৃতীয় রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কিছু লোক বন্দী

হয়ে দাসে পরিণত হয়ে যায়, এবং পরে মুসলমানরা ঐ রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করে এবং তাদের মিত্র শক্তির বন্দীগুলিকে পুনরুদ্ধার করে, তাহলে তারা মুসলমানদের দাস বলে গণ্য হবে। কারণ তৃতীয় রাষ্ট্র তাদের বন্দী করতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের এলাকার উপর আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করে নি। ...... যদি তৃতীয় রাষ্ট্র ওদেরকে অধিকার করে নেয় তবে তারা এর ন্যায্য অধিকারভুক্ত হবে।[২]

(৬৩৭) অর্থাৎ, এটা নিরপেক্ষতার ব্যতিক্রম হবে না যদি তৃতীয় রাষ্ট্রের অর্জিত সম্পদ যা বন্ধু রাষ্ট্রের সম্পদ ছিল, তা মুসলমানদের হাতে ন্যায়সংগতভাবে আসে।

(৬৩৮) খ) যদি কোন মুসলিম নাগরিক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করে, যা তৃতীয় রাষ্ট্র দ্বারা ধৃত চতুর্থ রাষ্ট্রের নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছে, মুসলিম নাগরিক তা আইনতঃ ক্রয় করতে পারে। (যদিও তার রাষ্ট্র ঐ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল।) কারণ মালিকানা বর্তায় বিজয়ী রাষ্ট্রের উপর এবং বিদেশী শক্তিরা পরস্পরের মধ্যে লুণ্ঠন চালায় এবং জান ও মালের মালিকানা প্রাপ্ত হয়। অতএব মুসলমান অবস্থানকারীর পক্ষে সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য ক্রয় করা তেমনি আইনসংগত: সে যে দেশে অবস্থান করছে সে দেশের সম্পদ ক্রয় করা যেমন আইন সংগত।[৩]

(৬৩৯) অনুরূপভাবে মুসলিম নাগরিক তৃতীয় রাষ্ট্র হতে তার আবাসস্থল দেশ বা রাষ্ট্র দ্বারা ধৃত বা লুণ্ঠিত সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে। কারণ সেই সম্পত্তি হস্তগত করার দরুন মালিকানা ঐ রাষ্ট্রের উপরই বর্তায় ...... যদি মুসলমানরা কোন অমুসলিম দেশের সংগে মিতার চুক্তি করে, যা তৃতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল, পূর্বের রাষ্ট্রে অবস্থানকারী মুসলিম নাগরিক শেষোক্ত রাষ্ট্রের নিকট হতে আইনতঃ সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।[৪]

(৬৪০) গ) মুসলিম নাগরিকগণ যদি বিদেশে অবস্থান করে এবং সেই দেশ তৃতীয় কোনো শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে তারা তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না (যদি সে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে), ব্যতিক্রম হবে শুধু সেই ক্ষেত্রে যখন

তারা স্বয়ং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে তারা তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করতে পারে (তবে তাদের নিজেদের মুসলিমর রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভংগ করে নয়'......এর দৃষ্টান্ত মিলে মহানবী ভ্রাতুষ্পুত্র জাফরের নিকট হতে। তিনি আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন যখন সেই দেশ পার্শ্ববর্তী রাজা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল জাফর নাজ্জাশীর (Negus) পক্ষে অস্ত্রধারণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন কারণ তিনি আশংকা করেন নূতন শাসক হয়তো তাঁকে আগের মতো আশ্রয় দেবেন না।[৫]

(৬৪১) ঘ) যদি বিদেশী কোনো নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে আসে এবং মুসলমানদের সংগে যুদ্ধরত তৃতীয় রাষ্ট্রে যেতে চায় মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সংগে যোগদান করার জন্য, তাহলে এর অনুমতি তাকে দেওয়া যাবে না। কারণ পাসপোর্ট বা অনুমতি তাদেরকে বাস করার স্বাধীনতা এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের স্বাধীনতা দান করে। এতদ্ব্যতীত মুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের পক্ষে অনিষ্টকর সব কিছু প্রত্যাখ্যান করলে তা আইনসম্মত হবে ...... নিঃসন্দেহে যদি তাদের দু-একজন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তৃতীয় রাষ্ট্রে গমন করতে চায়, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে না। কিন্তু যখন তারা বিরাট শক্তির অধিকারী হবে তখন ব্যাপারটা পৃথক বা স্বতন্ত্র হবে।[৬]

(৬৪২) ঙ) উদার নিরপেক্ষতার একটি দৃষ্টান্ত; যাতে মুসলিম এলাকার ভিতর দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সশস্ত্র সেনাবাহিনী অতিক্রম করতে পারে তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে :

'যদি তারা শক্তিশালী হয় এবং অনুমতিক্রমে মুসলিম এলাকার ভিতর দিয়ে অন্য দেশে যায় তাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং মুসলিম এলাকায় থাকাকালে কোনো শত্রু কর্তৃক তারা যদি আক্রান্ত হতো, মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে রক্ষা করতে বাধ্য হতো না। ব্যাপার অনুরূপ হবে যখন মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাগণ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে তাদের রক্ষা করা।'[৭]

(৬৪৩) চ) নিরপেক্ষ মালপত্র বোঝাই শত্রুর জাহাজ এবং শত্রুর মালপত্র বোঝাই নিরপেক্ষ জাহাজ সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থকারগণ সাধারণ একটি নীতি নির্ধারণ করেন, তা হলো এই যে, মালিকের নিরাপত্তার ফলে মালপত্র নিরাপদ থাকে (حرمة المال باعتبار حرمة المالك)।[৮]

(৬৪৪) ছ) আমি সংক্ষেপে আমার নিবন্ধ 'Some New Developments in the British Conception of Neutrality as against Muslim Countries' যা ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে Islamic Review, working-এ প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু ইংরেজ দৃষ্টিভংগীর বিপরীত পক্ষে ছিল কিন্তু মুসলমান দেশ, উদার নিরপেক্ষতার প্রতি ঝোঁক যা সে অধিবেশনে নির্ধারিত কঠোর অপক্ষপাতিত্বের বিপরীত ছিল, উল্লেখ যোগ্য বলা যেতে পারে, যেহেতু চুক্তিগুলো যা নিরপেক্ষতা ও যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবের সময়ে রাষ্ট্র সংঘের অনুমতিক্রমে পক্ষপাতিত্বের নীতি সমর্থন করেছিল এবং এইরূপে মহাশক্তি বা রাষ্ট্র দ্বারা ক্ষুদ্র শক্তিসমূহের সংশোধন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল।

(৬৪৫) এখানেই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিকে আমার বিনীত অধ্যয়ণ ও গবেষণার সমাপ্তি হলো। যদিও এই বিষয়ে আমি কয়েক বৎসর ব্যয় করেছি, তথাপি আমি অন্যান্যদের অপেক্ষা আমার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন আছি ; বর্তমান ও জানাশোনা তথ্য শেষ করার পূর্বে আমি জানি—আরও অনেক অধ্যয়ণের প্রয়োজন। অধ্যয়ণকালে পূর্বে অজ্ঞাত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু হায়, আমাদের প্রাচ্য দেশে এইগুলো দেখা কদাচ সম্ভব,, বিশেষতঃ যখন সেগুলি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণ হয়। দ্বাদশ বা ততোধিক বৎসর পরিশ্রম ও সাধনার পরেও এই পুস্তক প্রকাশ করতে আমি সংকোচ বোধ করছিলাম কিন্তু অবশেষে এক সান্ত্বনার বাণী মনে জাগ্রত হলো—

کار دنیا کسی تمام نکرد
فاسعی منا والا تمام من الله

'দুনিয়ার কাজ কেউই শেষ করতে পারে না।
চেষ্টা আমার ও সাফল্য বা পরিপূর্ণতা আল্লাহর।

টীকা ঃ

১। সারাখ্শী কৃত شرح السير الكبير চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৪-৩৫।
২। সারাখ্শী, المبسوط দশম খণ্ড, পৃঃ ৯৭।
৩। প্রাগুক্ত।
৪। প্রাগুক্ত।
৫। شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২১-২২।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৭। Idem, I, 142

পরিশিষ্ট (ক)

সেনাপতিগণের প্রতি নির্দেশাবলী

১. উদাহরণ: মহানবী (সঃ)

(ক) সাধারণ:

অনুবাদ:

(৬৪৬) যখনই মহানবী (সঃ) কোন বাহিনীর উপর সেনাপতি নিযুক্ত করতেন তিনি তাঁকে নিজের সম্পর্কে ও তাঁর সঙ্গী-সহচর মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে, আল্লাহকে ভয় করার জন্য উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন:

'আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ কর। নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর, প্রবঞ্চনা করো না, বিশ্বাস ভঙ্গ কর না, অঙ্গচ্ছেদ করো না, নাবালকদের হত্যা করো না।

যদি তুমি কাফেরদের মধ্যে কোন শত্রুর মুকাবিলা করো, তাহলে তাদেরকে তিনটি বিকল্প পন্থা দাও। যে কোনটি তারা গ্রহণ করে, তাতে সম্মত হও এবং তাদের বিরোধিতা হতে বিরত থাক।

অতএব তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও, অর্থাৎ ইসলাম কবুল করতে আমন্ত্রণ জানাও। যদি তারা কবুল করে, সম্মত হও এবং তাদের বিরোধিতা করো না। অতঃপর তাদেরকে তাদের এলাকা হতে হিজরতকারীদের[১] এলাকায় (অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রে) হিজরত করতে বল এবং তাদের জানিয়ে দাও যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরই মত (মুসলমানদের মত) তারাও সমান অধিকার ও দায়িত্বের

অধিকারী হবে। যদি তারা হিজরত করতে না চায়, তাহলে জানিয়ে দাও, তারা বেদুঈন মুসলমান বলে গণ্য হবে, এবং অন্যান্য মুসলমানদের মত আল্লাহর আইনের প্রতি তারাও বাধ্য থাকবে। কেবল ব্যতিক্রম হবে এই যে, তারা গনিমতের কোন অংশ পাবে না, যদি তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সংগে যুদ্ধ না করে।'

যা হোক, যদি তারা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে বলো। যদি তারা রাজি হয়, তাতে সম্মত হও এবং তাদের বিরোধিতা করো না।

'যদি তারা দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ করো।'

যদি তুমি দুর্গে অবস্থানকারী লোকদের অবরোধ করো এবং তারা আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ্ ও রসূলের নামে প্রতিশ্রুতির ভরসায় যে, তারা নিরাপত্তা পাবে, তা হলে তুমি অন্যথা কর না ; বরং তোমার ও তোমার সাথীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দাও। কারণ আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি ভংগ করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সহচরদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করা অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ।

যদি তোমরা দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ কর এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির নামে তারা আত্মসমর্পন করতে চায়, সেক্ষেত্রে সে ভাবে আত্মসমর্পন করতে না দিয়ে তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপর আত্মসমর্পন করতে দাও। কারণ তোমরা নিশ্চিত হতে পারো না যে, তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে কাজ করেছ কিনা।[২]

(খ) আবদুর রহমান বিন আওফকে লিখিত :

(৬৪৭) অতঃপর মহানবী (সঃ) বিলালকে তাঁর হাতে পতাকা দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। তিনি তা-ই করলেন। অতঃপর মহানবী আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর অনুগ্রহ বা রহমের জন্য প্রার্থনা করলেন। বললেন : ওহে আওফের পুত্র ! এটা নাও। যুদ্ধ হবে আল্লাহরই পথে এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। বিশ্বাস ভঙ্গ করো না, অথবা

প্রতারণা করো না, অথবা কারও অঙ্গচ্ছেদ করো না, অথবা কোন নাবালক কিংবা স্ত্রী লোককে হত্যা করো না। এটাই আল্লাহর চুক্তি ও রসূলের আচরণ তোমাদের হিদায়তের জন্য।*

(৬৪৮) অন্যান্য সময়ে মহানবীর উপদেশাবলীর জন্যে- তুলনীয়ঃ তিরমিযী, ১৪ঃ১৪, ১৯ঃ২ ও ৪৮; ইবনে মাজা, ২৪ঃ৩৮; আদ-দারিমী, ১৭ঃ৮; মালিক, ২১ঃ১১; ইবনে হামবাল, ১ঃ৩০০; ৩, ৪৪০, ৪৪৮; ৪, ২৮০; ৫, ২৭৬, ৩৫২, ৩৫৮; যায়েদ ইবনে আলী, নং ৮২০।

২. উদাহরণঃ আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)

(গ) উসামার প্রতি, ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়ার সময়ঃ

অনুবাদঃ

(৬৪৯) অতঃপর আবুবকর গেলেন এবং তাদের সংগে (শিবিরে) সাক্ষাৎ করলেন, রওয়ানা হতে তাদের আদেশ করলেন এবং পদব্রজে তাদের সংগে গেলেন আর সেনাপতি উসামা ছিলেন তখন উষ্ট্র-পৃষ্ঠে এবং আবুবকরের উটের রশি ধরে হাঁটছিলেন আবদুর রহমান বিন আওফ। উসামা তাঁকে বললেনঃ "হে আল্লাহর রসূলের উত্তরাধিকারী! হয় আপনি আরোহণ করুন, নয়তো আমি অবতরণ করবো"। তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, তুমিও অবতরণ করবে না, আমিও আরোহণ করব না। কি ক্ষতি হবে যদি আমি হাঁটিতে থাকি? কারণ আল্লাহর পথে মুজাহিদের তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে ৭০০ নেক-আমলের সওয়াব দান করেন, ৭০০ দরজা তার উ'চু হয় এবং ৭০০ পাপ স্খলন করেন।" কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর বললেনঃ যদি আমাকে সাহায্য করার জন্যে তুমি উমরকে ছাড়তে পারো, তা হলে তা করো। এবং তিনি তাই করলেন। অতঃপর আবুবকর বললেনঃ

হে লোকেরা! তোমরা শোন। আমি তোমাদিগকে দশটি আদেশ দিচ্ছি। সেগুলো মনে রেখোঃ অর্থ অপহরণ করো না বা তহবিল

তস্করূপ করোও না, প্রতারণা করো না, শিশুকে, কিংবা ব স্ত্রীলোককে হত্যা করো না, খেজুর গাছ কাটবে না অথবা অথবা কোন ফলের গাছ কাটবে না এবং খাদ্যের উদ্দেশ ছাগল গরু বা উট যবেহ্ করো না। হতে পারে, খানকায় নির্জনতা অবলম্বনকারী লোকদের সাক্ষাৎ পেতে পার। হতে পারে, তোমরা এমন সব লোকজনের সাক্ষাৎ পেতে পার যারা তোমাদের জন্যে বিবিধ খাদ্য পূর্ণ পাত্র আনতে পারে। যদি তোমরা একটির পর একটি ভক্ষণ করতে থাকো, তাহলে আল্লাহর নাম নেবে। এবং তোমরা এমন লোকের সাক্ষাৎ পাবে যাদের মাথার চুল দেখে মনে হবে শয়তান তাদের মাথার উপর বাসা বেঁধেছে আর তার চার পাশে তারা পাগড়ী পরেছে। সুতরাং ঐগুলি তরবারী দ্বারা বিদ্ধ করো।

"আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বর্শা ও মহামারী দ্বারা সাহায্য করুণ।"[৪]

অন্য এক বিবরণী অনুযায়ী ঃ

(৬৫০) অতঃপর তিনি সৈন্য দলের ভিতর দণ্ডায়মান হয়ে বললেন ঃ

'আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ্কে ভয় করার জন্যে আদেশ লঙ্ঘন করো না, প্রবঞ্চনা করো না, ভীরুতা পরিহার করো, গীর্জা ধ্বংস করো না, তালগাছ নষ্ট কর না, ফসল দগ্ধ কর না, প্রাণীর রক্তপাত কর না, ফলের গাছ কাটবে না, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বালককে, বা শিশুকে বা স্ত্রী লোককে হত্যা করিও না।[৫]

সেনাপতি ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান

অনুবাদ ঃ

(৬৫১) যখন আবুবকর (রাঃ) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হতে আদেশ দিলেন, তখন তিনি সংগে যেতে যেতে তাকে নানা উপদেশ দিলেন। ইয়াযিদ উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন ও আবুবকর পদব্রজে হাঁটছিলেন। ইয়াযিদ বললেনঃ হে আল্লাহর রসুলের উত্তরাধিকারী। হয় আপনি উঠুন, নয়তো আমি নেমে যাই।

তিনি উত্তরে বললেন ঃ

"তুমিও নামবে না, আমিও উঠব না। আমি এই হাঁটাহাঁটিকে আল্লাহর পথে গণ্য করছি।"

"হে ইয়াযিদ! তুমি এমন একটি দেশে যাবে যেখনাকার অধিবাসিরা তোমাদিগকে নানাবিধ খাদ্য প্রদান করবে, সুতরাং আহারের পূর্বে ও পরে আল্লাহর নাম নেবে। তোমরা এমন সব লোকের সাক্ষাৎ পাবে যারা খানকায় বা মাঠে নির্জনে বসবাস করছে। তাদেরকে নিজ'নবাসে থাকাত দাও। আবার এমন লোক দেখবে— যাদের মাথায় শয়তান বাসা বেঁধেছে—যাদেরকে 'শামামিশা' বলা হয়—অতএব তাদের শিরশ্ছেদ করো। কিন্তু কোন বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধাকে কিংবা নাবালক কিংবা অসুস্থ, কিংবা সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করো না। কোন লোকালয়কে ধ্বংস করো না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন গাছকে দগ্ধীভূত বা জলমগ্ন করো না। বিশ্বাস ঘাতকতা করো না, অঙ্গহানি করো না, কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না, এবং প্রতারনা করো না। আল্লাহ্ অবশ্যই ওদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর ও রসূলের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে কারণ আল্লাহ্ শক্তিশালী।

আমি তোমাকে আল্লাহর হেফাযতে সমর্প'ন করেছি এবং বিদায় দিচ্ছি।"

অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তণ করেন।*

৩. উদাহরণ ঃ খলীফা উমর (রাঃ)

অনুবাদ ঃ

(৬৫২) যখনই উমর কোথাও সৈন্য বাহিনী পাঠাতেন তিনি সেনাপতিগণকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দে'শ দিতেন এবং অতঃপর পতাকা দেওয়ার সময় বলতেন ঃ

"আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের আশায় ধাবিত হও। সদাচার ও সহনশীলতায় অটল হও। আল্লাহর পথে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তথাপি সীমা লঙ্ঘন করো না, কারণ সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না।

যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। তোমার শক্তি থাকলে ...
করো না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করো না। বৃদ্ধ বা নাবালককে হত্যা করো না, বরং দুই বাহিনীর ভিতর সংঘর্ষের সময়ে, বিজয়ের উত্তেজনার মুহূর্তে এবং পরিকল্পিত আক্রমণের সময়ে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। গনিমতের বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা করো না। পার্থিব লাভের চিন্তা হতে জিহাদকে পবিত্র করো। আল্লাহর সঙ্গে যে চুক্তি তোমার হয়েছে তার জন্য আনন্দ করো এবং তাই মহান সাফল্য।'' [৭]

৪. আব্বাসীয় খলীফাগণ কর্তৃক লিখিত

(৬৫৩) কুদামা ইবনে জাফর (মৃত্যু : ৩১০ হিজরী) হতে অবগত স্থল ও নৌবাহিনীর সেনাপতিদের নিকট উপদেশাবলী আমি ইস্তাম্বুলে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অতুলনীয় কপি হতে উদ্ধৃত করছি। তা অনুবাদের চেষ্টা করি নি, কারণ, যদিও এইগুলি সুন্দর ভাষায় লিখিত আছে ইহাতে সারবস্তুর তুলনায় কথার আধিক্য বেশী এবং বাহিনীর বাইরের আচার-ব্যবহারের তুলনায় বাহিনীর আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ বেশী আছে।

(ক) স্থলবাহিনীর সেনাপতির নিকটে :

অমুক এলাকায় যুদ্ধ ও সংঘর্ষ কালে অমুকের পুত্র অমুককে নিযুক্তির সময়ে আমীরুল মুমিনীন কর্তৃক নিম্নোক্ত উপদেশাবলী দেওয়া হয়েছিল -

'তিনি তাঁকে বাইর ও ভিতরের সকল কাজে আল্লাহর ভয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর আদেশ পালন করার জন্য কাজ করতে এবং পবিত্র কর্ম ও সন্তোষজনক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর সংগে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে সদাচারী হতে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে, তাঁর উপর অর্পিত আমানতের যোগ্য হতে এবং তাঁর প্রতিটি কর্মে ও পদক্ষেপে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারী নাই একথা বিশ্বাস করতে তাকে আদেশ দিয়েছেন।'

'আমীরুল মুমিনীন যে কর্তব্য তাঁকে সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়েছেন তা এই আশায় যে, তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান আছে, যার ফলে তিনি অন্যায় ও দুষ্কৃতিকারিগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে পারবেন। এবং দেশবাসীর উন্নতি বিধান করতে পারবেন।

তিনি তাঁকে অপ্রিয় কার্যকলাপ হতে, নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ হতে এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক যে সব আদেশ লঙ্ঘনকে এবং বস্তুসমূহকে পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সে সব হতে বিরত থাকা, তাঁর সেনাবাহিনী ও লোক-লস্করকে কোন প্রজাপীড়নের চেষ্টা না করা, কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না করা এবং তাদেরকে সর্বদা ন্যায় পরায়ণ হতে, আনুগত্যের পথে আগুয়ান হতে এবং দেশের ভিতর আল্লাহর শত্রুকে আঘাত হানতে এবং তাদের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসদ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে আদেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনী ও অনুসারিগণের সংগে সর্বাপেক্ষা শিষ্টাচারের সংগে ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন, আর তাদেরকে বাহিরে প্রেরণকালে তাদের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখতে, তাদের প্রাণী ও অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা দেখার জন্যে ঘনঘন তাদেরকে কুচকাওয়াজে সমবেত করতে এবং এই সব জিনিস সব চাইতে সুন্দরভাবে রাখবার জন্যে বাধ্য করতে আদেশ দিয়েছেন। কারণ, এই ভাবেই ভদ্র ব্যক্তিগণ যাতে মনোযোগী থাকতে পারে তার ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ করেছেন এবং দুষ্কৃতিকারীরা যাতে অনিষ্টকর কার্যকলাপ হতে দূরে থাকতে পারে।

তিনি তাঁকে আমীরুল মুমিনীনের বন্ধুবান্ধবের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের মান-মর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের সংগে ব্যবহার করতে, তাঁদের সম্মান ও পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ, এতে তাঁদের উদ্দেশ্য শক্তি-শালী হয় এবং তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি বর্ধিত হয়।

তিনি তাঁকে কোন অভিযোগের কারণে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন, যদি সে সন্দেহভাজন না হয়, অথবা দুশ্চরিত্র বলে পরিচিত না হয়; সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্তিতে কাকেও যেন শাস্তি না দেওয়া হয়; যতক্ষণ

স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন না পাওয়া যায়; এবং অন্যায়কারী ও দুষ্কৃতিকারী-দের অপরাধের জন্য ভদ্র ব্যক্তিগণকে দায়ী করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি তাঁকে আশ্রয় দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঐ সব ব্যক্তিগণকে, যারা তাঁর নিকট শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আসে। এবং তাদের সংগে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে নিষেধ করেছেন এবং ছলনা-প্রতারণা করার কুখ্যাতি যেন অর্জিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ, এই অভ্যাস কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলার সৃষ্টি করবে।

তিনি তাঁকে সীমান্ত, প্রবেশপথ, পারিপার্শ্বিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে ত্রুটি হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ঐ সকল ব্যক্তিগণকে উক্ত বস্তুসমূহের ভার অর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাঁদের এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে।

তিনি তাঁকে নিজের কাজ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের কাজ ঘনঘন পর্যবেক্ষণ করতে এবং এমন সতর্ক থাকতে বলেন যাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ না থাকে এবং সকল অবহেলা ও বিস্ময়কর কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হতে পারে।

তিনি তাঁকে আমীরুল মুমিনীনের বিনানুমতিতে কাউকে কোন গুরুতর শাস্তি না দিতে এবং অঙ্গচ্ছেদনের সিদ্ধান্ত না নিতে নির্দেশ দিয়েছেন; উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরী না করতে নির্দেশ দান করেছেন।

তিনি তাঁকে কোন প্রজার গৃহে তার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁর বাহিনীকে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন এবং শস্যক্ষেত্রের উপর চলাফেরা না করতে এবং পশু-প্রাণীগুলির তার উপর বিচরণ করতে না দিতে, কিংবা তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য ক্ষেত-খামারে রাস্তায় পরিণত না করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মূল্যদান না করে বা মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে জন্তু-জানোয়ারের জন্যে খড় ইত্যাদি যেন গ্রহণ না করেন।

তিনি তাঁকে বন্দিগণের যত্ন নিতে, পরিদর্শনের জন্যে তাদেরকে সমবেত করতে, কোন্ অপরাধে তাদের জেল হয়েছে তার অনুসন্ধান করতে

নগর-অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে এবং কিছু বিশ্বস্ত লোকের উপস্থিতিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাদের নিরপরাধ পাওয়া যায় কিংবা যার অপরাধের দরুণ তার বন্দী থাকা অনুচিত, তাকে আযাদ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তির অন্যায় ও দুষ্কৃতি হতে মানুষকে রক্ষা করা উচিত মনে হয়, তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারাগারে রাখাই উচিত। তথাপি যার সম্বন্ধে অসুবিধা আছে, তার বিষয়টি আমীরুল মুমিনীনের নিকট পেশ করা উচিত এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

তিনি তাঁকে যে সকল বিষয়ে কোন পূর্ব নির্দেশ দেওয়া হয় নি, এবং তাঁর (খলীফার) নিকট হতে অভিমত চাওয়া হয়েছে সেই সকল বিষয়ে খলীফার নির্দেশ এলে তদনুযায়ী কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে ঐ সকল নির্দেশাবলী নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে পাঠ করে শোনাতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিতে বলেন যে খলীফা তাদের মঙ্গল কামনা করেন। তাদের উপকার করতে, ইনসাফ করতে, অবিচারকে বন্ধ করতে, তাদের শত্রুর সংগে যুদ্ধ করতে এবং স্বয়ং খোঁজ খবর নিয়ে তাদের রক্ষা করতে চান।

তোমার জন্যে এইগুলো খলীফার আদেশ ও নির্দেশ, সুতরাং এইগুলো বুঝ, তাঁর প্রদর্শিত পথে চলো, এমনভাবে ব্যবহার করো খলীফা তোমার নিকট হতে প্রত্যাশা করেন। তোমার উপর অর্পিত বিশ্বাস অনুযায়ী তুমি পূর্ণ সদিচ্ছার সংগে কাজ করবে, যাতে পারস্পরিক আচরণ সুমধুর থাকে। আমীরুল মুমিনীন তোমাকে সৎকার্য করার শক্তিদান করতে, সৎপথে পরিচালিত করতে এবং যুদ্ধ ও শাসন-সংক্রান্ত যা কিছু তোমাকে সমর্পণ করা হয়েছে সেই সব বিষয়ে অনুগ্রহপূর্বক সাহায্য করতে আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করছেন।

৫. সমুদ্র সীমান্তের সেনাদক্ষের নিকট উপদেশাবলী

অমুক সীমান্তে নৌবাহিনী নিযুক্তিকালে অমুকের নিকট আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশাবলী:

তিনি তাঁকে আল্লাহর ভয় ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তাঁর (আল্লাহর) শাস্তি এড়াতে এবং তাঁর (আল্লাহর) সন্তোষ অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সকল কর্মে ন্যায়কে পছন্দ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ ন্যায় আত্মরক্ষা ও সাহায্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আশ্রয়স্থল ও রক্ষাকবচ।

তিনি তাঁকে তাঁর নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর মধ্যে বক্রতা বা কুটিলতার সংশোধন হয় এবং আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তাঁর অন্তর হতে অসৎ ইচ্ছা এবং শয়তানী পদস্খলনের মূলোৎপাটন করতে, চরিত্রকে নির্মল ও নিষ্কলুষ করতে এবং স্বভাবকে মার্জিত করতে, তাঁর বাহিনীর নিকট ও অন্যান্য বন্ধুদের নিকট সদাচরণের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষক স্বরূপ হতে এবং তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে অনুগতগণের প্রতি কোমল হতে এবং অবাধ্যদের প্রতি কঠিন হতে এবং পরিস্থিতি মুতাবিক আদল ও ইনসাফের সংগে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে বাহিনীর পক্ষে সহজলভ্য করতে এবং অভাবগ্রস্তদের ফরিয়াদ সহজে পেশ করতে পারে এরূপ ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে পুলিশের মধ্যে এমন একজনকে নিযুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন যার বুদ্ধি ও সততার উপর তাঁর আস্থা আছে এবং সন্দেহভাজন ও দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি সে দৃঢ় ও কঠোর হতে পারবে বলে তার প্রত্যয় রয়েছে।

তিনি তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বদা কুচকাওয়াজ করাবার নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে ভালোভাবে চিনবার উদ্দেশ্যে এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে আর তাদের নৌকার সংগে অহরহ থাকবার জন্যে; তিনি তাঁর প্রহরা ঘাঁটির পরিদর্শন করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তথাকার দায়িত্বে যারা নিযুক্ত আছে তারা যেন সুরক্ষিত থাকে;

তিনি তাদের বেতন দেবেন এবং তাদের প্রাপ্যের ব্যাপারে কোন বাধা দেবেন না।

তিনি তাঁকে তাঁর কার্যরত নৌকাগুলোর অবস্থা পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এগুলো ভালো অবস্থায় থাকে এবং ওদের সাজসরঞ্জাম নতুন অবস্থায় থাকে। তিনি তাদের নির্মাণকারীদের পরিদর্শন করবেন এবং দেখবেন যে তারা বন্দরে কিভাবে আছে। তিনি নৌকাগুলোকে বা নৌবহরকে শীতকালে-বা ঝড়ো হাওয়ার সময়ে উন্মুক্ত সাগর হতে উপকূলে স্থানান্তরিত করবেন, কারণ উপরোক্ত সময়ে যাতায়াত ব্যাহত হয়ে থাকে।

তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, শত্রুদের সংবাদ জানার জন্যে যে সব ব্যক্তিকে পাঠানো হয় তাদেরকে যেন সত্যবাদী, বিবেচক, হিতাকাঙ্খী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের ভিতর হতে বেছে লওয়া হয় এবং সমুদ্র ও বন্দরসমূহের এবং এর গোপন তথ্যাবলী ও গুপ্তস্থানসমূহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তারা সত্য সংবাদ পরিবেশন করে। অধিকন্তু যদি তারা শত্রুর নৌ-বাহিনীর হামলার প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তারা যেন জানাশোনা জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে এবং সে আশ্রয় যেন নিশ্চিত হয়।

তিনি তাঁকে নৌকার নাবিক, দাঁড়বাহী ও অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যাপথা নিক্ষেপকারী হিসেবে কাকেও শক্তসমর্থ, কর্মঠ, দক্ষ ব্যতিরেকে নিযুক্ত না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং যারা নৌকাচালক হবে তারা আল্লাহর সন্তোষকামী, শত্রুর ও বিপদাপদের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ সদিচ্ছার অধিকারী, অতন্ত্র কুশলী যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু হবে।

তিনি তাকে নৌকার নির্মাণের জন্য যে সব কাঠ, লোহা, ন্যাপথা ইত্যাদি প্রয়োজন হয় তা তদারক করতে নির্দেশ করেছেন, যাতে সেগুলো ভালো অবস্থায় থাকে। নৌকার নির্মাণ, মেরামত প্রভৃতি উন্নতমানের হওয়া উচিত। দাঁড়, মাস্তুল ও পাল সুন্দর হতে

হবে ; নাবিকগণকে হতে হবে সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ; কোন অযোগ্য লোককে যেন এই সব কাজে প্রবেশ করতে না দেয়া হয়।

তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন সতর্ক হতে—যেন শত্রুপক্ষ ইসলামী এলাকায় প্রবেশ লাভ করতে বা অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে না পারে কিংবা কোন ব্যবসায়ী শত্রুর নিকটে কোন মালপত্র পাঠিয়ে না দিতে পারে, অথবা তাদের দেশের সংগে কোন গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে। যদি কোন সময়ে যে কোনো শ্রেণীর মানুষ এমন কাজ করতে প্রয়াস পায়, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে, যাতে অন্যেরা তা হতে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে।

তিনি তাঁকে বন্দরে সমস্ত নৌকা বা রণতরীগুলোকে সমবেত করতে এবং সেগুলোকে ঐ লোক দ্বারা পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যার সদিচ্ছায় ও দুঃসাহসী চরিত্রে তাঁর আস্থা আছে, ফলে কোন নৌকা তাঁর অজ্ঞাতে বন্দর ছেড়ে যাবে না এবং তাঁর বিনানুমতিতে বন্দরে প্রবেশ করবে না।

তিনি তাকে ঘন ঘন অস্ত্রপাতি গণনা করতে ও পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে সেগুলি সযত্নে সুরক্ষিত থাকে যতদিন পর্যন্ত সে গুলির প্রয়োজন না পড়ে। তিনি খাদ্যপথ্য, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পরিদর্শন করবেন যাতে সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় বা ব্যবহারের অনুপযোগী না হয়।

তিনি তাকে শত্রুর গুপ্তচর ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। তিনি প্রত্যেকটি শহরকে ওর সংগে সুপরিচিত ব্যক্তির দায়িত্বে যেন ন্যস্ত করেন এবং তিনি যেন দ্বাররক্ষী ও প্রহরীদের আদেশ দেন যেন তারা পরিচিত ব্যক্তি এবং তার প্রবেশ পথ, তার মুখমণ্ডল, তার উদ্দেশ্য, তার গন্তব্যস্থল না জানা পর্যন্ত অন্য কাকেও প্রবেশ করতে না দেয়।

এইগুলো হলো আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশাবলী যা তোমার নিকটে তোমার দিশারী স্বরূপ। এই গুলি বুঝ, এবং এতে লিপিবদ্ধ নির্দেশ

মুতাবিক কাজ করো। তিনি তোমার জন্য শক্তি ও সৎকার্যের তওফিক কামনা করে দোয়া করছেন।'

(অমুকের পুত্র অমুক কর্তৃক লিখিত)।

কুদামা : কিতাবুল খারাজ

টীকা :

১। এর তাৎপর্য ও মহানবী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ঔপনিবেশিক নীতির বিশদ বিবরনের জন্য লেখকের প্রবন্ধ "হিজরাত" 'সিয়াসাত' পত্রিকায় দেখুন (জুলাই, ১৯৪০, হায়দ্রাবাদ)।

২। সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯-৪০, মাকরিযির মতে ইমতা' (امتاع), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫-৪৬। এই নির্দেশগুলি ৮ম হিজরীতে মুতা অভিযানের সময় প্রথমে দেওয়া হইয়াছিল।

৩। ইবনে হিশামের সিরাত পৃঃ ৯৯২।

৪। তাবারীর ইতিহাস, পৃঃ ১৮৪৯-৫০।

৫। কানযুল-উম্মাল, আলী আল-মুত্তাকী রচিত, ২য় খণ্ড, নং ৬২৬১।

৬। Ibid, No 6259, বুখারীর মতে : তুলনীয় De goeje, Memoire sur La conquete de la Syrie, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৪-১০৬।

৭। ইবনে কুতায়বা عيون الاخبار ১ম খণ্ড, অধ্যায়—যুদ্ধ বিগ্রহ : পৃঃ ১০৭-৮ই তুলনীয়, আবু মনসুর সালাবী, (১৮০৮ নং পাণ্ডুলিপি, আসাদ ইফেন্দ : ইস্তাম্বুল)।

পরিশিষ্ট (খ)

আইনের জটিলতা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা[১]

(৬৫৪) আইনের একটি শাখা আছে যাকে স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক আইন বা আইনের সংঘাত বলা হয়। এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফলে। সাধারণভাবে এর প্রধান বিষয়বস্তু হলো জাতীয়তা, ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং বৈদেশিক ব্যক্তিদের উপর ক্ষমতার সীমা।

(৬৫৫) সর্বসাধারণের জন্যে ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে কোন ধরাবাঁধা পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না; বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যই অনেক বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে। সেই কারণে প্রাচীন মুসলমান ফকিহ্গণ পৃথকভাবে আলোচনা না করে একই অধ্যায়ে উভয়টিই আলোচনা করেছেন। যা হোক, আমরা প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

(৬৫৬) মুসলিম আইনের সংঘাত আমি বলিনি এই জন্য যে, শিয়া-সুন্নী মুসলিম আইনের সংঘাত মুসলিম আইনের অংশ বিশেষ।

মুসলিম আইনের সংঘাত সম্বন্ধে ধারণা আমার মতে অধিকতর ব্যাপক। আমি কেবল (১) জাতীয়তা, ও (২) বিদেশী নাগরিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবো না বরং (৩) (ক) মুসলিম ও অমুসলিম আইন, (খ) বিভিন্ন অমুসলিম আইন, (গ) বিভিন্ন মুসলিম আইনের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয় এবং (ঘ) ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে আইনের সংঘর্ষে এবং (৪) (ক) অন্য মুসলিম রাষ্ট্রে এবং (খ) একটি অমুসলিম রাষ্ট্রে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদার বিষয় আলোচনা করবো।

(৬৫৭) আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করবো। আর আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো সাবেক গোঁড়া মতবাদের মধ্যে এবং মুসলিম আইন মুতাবিক সমর্থিত নয় এমন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বাস্তব কার্যকলাপ আলোচনা করবো না।

১। জাতীয়তা

(৬৫৮) আমরা যাকে এখন জাতীয়তা বলি তার উৎপত্তি হয়েছিল। রক্তের সম্পর্ক থেকে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে অন্যান্য বিষয়সমূহ বা উপকরণসমূহ রাজনৈতিক সংঘটনের মূলে কাজ করেছে। এবং বস্তুতঃপক্ষে আমরা ভৌগোলিক, ভাষাগত, জাতিগত, গোত্রীয় ও অন্যান্য ধারণা পেয়ে থাকি যা বিভিন্ন দেশে ও কালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

(৬৫৯) ইসলামের জন্মভূমি আরবেও জাহেলিয়াতের আমলে এই-রূপ অবশ্যই হয়েছে। নিয়তির পরিহাস, গোত্রীয় আরব ভূমির সর্বাপেক্ষা গর্বিত ও অহংকারী কোরেশ বংশের এক ব্যক্তি রসূল হিসাবে বা ইসলামের বাণীবাহক হিসাবে সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলেন :

"হে মানবমণ্ডলী! দেখ, আমরা তোমাদেরকে এক জোড়া নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি—যাতে তোমরা পরস্পরকে পৃথক করে চিনতে পারো। দেখ, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত—আল্লাহর দৃষ্টিতে, যে তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। দেখ, আল্লাহ্—বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।"[২]

(৬৬০) জাতীয়তা সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারায় এ ছিল এক নতুন পরিবর্তন এবং এ ছিল মুসলিম জাতীয়তার এক বাস্তব সনদ। মহানবীর আমলে এ নীতি কার্যকরী ছিল এবং আমাদের কাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে

এ নীতি কার্যকরী ছিল। এবং যেখানেই অর্ধচন্দ্র পতাকা উড্ডীন হয়েছে সেখানেই মানুষের সাম্য ও ধার্মিকদের প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়েছে।

(৬৬১) ইসলামে ধর্ম ও জাতীয়তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে অনেকে অনেক সময় প্রতারিত হয়ে থাকেন। আর মুসলমান ধর্ম বলতে যা বুঝে তারা তা বুঝেন না। সম্ভবতঃ সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা হবে এই যে, ইসলামী জাতীয়তা জাতিগত বৈষম্য, ভৌগোলিক, ভাষাগত ও অন্যান্য প্রচলিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং একই জীবনাদর্শ বা জীবন-বোধের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামী জাতীয়তা গড়ে উঠে। কারণ ধর্ম বলতে আমরা যদি বুঝি সৃষ্টির সংগে মানুষের সম্পর্ক, তাহলে ইসলাম নিছক ধর্ম নয়, ধর্ম অপেক্ষা তা অনেক বেশী। ইসলাম তার অনুসারিগণের আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক ও সামাজিক ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রের কার্যকলাপ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি জীবন-বিধান দান করেছে। এদিক থেকে ইসলাম প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ, যে ব্রাহ্মণ্যবাদের মতে মুক্তি কেবল ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত ব্যক্তিদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। প্রচলিত খ্রীস্ট ধর্মের বিরুদ্ধেও ইসলাম প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল, যে খ্রীস্ট ধর্মের মতে মানুষ আদিকাল থেকে পাপী এবং তার পাপের জন্যে সে ব্যক্তিগতভাবে দায়ীও ছিল না, বরং তার স্বীকৃতি ও পাপ মোচনের জন্যে অন্য একজনকে কুরবানী করতে হয়েছে ; সেণ্ট পল কর্তৃক স্বয়ং যীশু খ্রীস্টের আইন-কানুন রদ করার বিরুদ্ধে ইসলাম একটি প্রতিবাদ[৩] ; এবং অখ্রীস্টানদেরকে প্রতিশ্রুতি দান ও তাদের সংগে চুক্তি সম্পাদন[৪] পালনীয় নয়-এ কথারও প্রতিবাদ ইসলাম। প্রচলিত সাজিবাদ, মায্‌দাকবাদ, বিধর্মী মতবাদ ইত্যাদি যে সব মতবাদ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করেছিল সে সবের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ইসলাম।

(৬৬২) কেউ নিজের বংশগত জাতীয়তার পরিবর্তন করতে পারে না। একজনের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পরিবর্তনও বস্তুতঃ কঠিন। যদি আদম ও হাওয়ার সন্তানদের পুনর্বার একত্রীকরণ করার ইচ্ছা পোষণ করা হতো, এবং তাদের ঘটনাক্রমে এক কেন্দ্রীকরণের মনোভাবকে দূরীভূত

করা হতো, তাহলে ইসলামী মতে 'জাতীয়তাবাদকে' কোন মারাত্মক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত না করে অভিরুচির উপর বা স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠা করা হতো। ইসলাম দ্বারা সমর্থিত বা নির্বাচিত সেই ইচ্ছা হলো বিশ্বাস বা দৃষ্টিকোণ। জাতীয়তার অন্যান্য ভিত্তি সম্বন্ধে ইসলাম ঘোষণা করেছিল ঃ

"এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সম্বন্ধে শোন! এ সবের মধ্যে আছে নিদর্শনাবলী (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের) জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে।"

ইসলামের দৃষ্টিতে এর বেশী কিছু গুলির নেই।[৫]

(৬৬৩) পূর্বোক্ত আয়াতে বংশগত ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখানে ভাষাগত বা বর্ণগত বৈষম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক মানুষের ইচ্ছা বা বিশ্বাসকে জোর দিয়ে ইসলাম মৌল বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা প্রকৃত মানুষের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং সকল মানুষ যা গ্রহণ করতে পারে ঃ

"শোন! হে বিশ্বাসিগণ [হে মুহাম্মদ (সঃ) তোমার উপর যা নাযিল করা হয়েছে, অর্থাৎ হে মুসলমানেরা] এবং যারা ইহুদী, খ্রীস্টান ও সেবিয়ান-যারাই আল্লাহকে, শেষ বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে-নিশ্চয়ই তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট এবং তাদের কোন ভয়ও নাই এবং কোন দুঃখও নাই।"[৬]

(৬৬৪) মুসলিম ইতিহাসের অজ্ঞতার অভিযোগে আমার পাঠক ও শ্রোতাগণ আমাকে অভিযুক্ত করতে পারেন যদি আমি উল্লেখ না করি যে মুসলমানদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হতে নানা দল-উপদলের উদ্ভব হতে দেখা গিয়েছে। শিয়া-সুন্নী বিরোধ থেকে তার উৎপত্তি শুরু হয়েছে। গোঁড়া সুন্নীদের মধ্যে এ কথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে, মুসলিম ও অমুসলিম এলাকার মধ্যে পার্থক্য হলো প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব এবং শাসনের পার্থক্য। একথা সত্য ইসলামী এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশ সম্বন্ধেও।[৭]

(৬৬৫) এ সবই আমার মতে ক্ষুদ্র, অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ এবং একে মারাত্মক বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতা বলা যায় না।

(৬৬৬) আমি ইসলামী এলাকা বা মুসলমানদের উপর আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ প্রভাবের কথাও অস্বীকার করি না। এই সব দেশেও জন্ম ও বসবাসের ভিত্তিতে জাতীয়তার আইন পাস হচ্ছে তথাপি ইসলামী ধারণা ও আদর্শ অনুসারে জাতীয়তার ভিত্তি হলো একই বিশ্বাস, একই বংশ, বর্ণ, ভাষা বা দেশ নয়।

(৬৬৭) তাই আমরা দেখি খ্রীস্টানদের ইংলণ্ডে বিদেশী খ্রীস্টান কিন্তু মুসলিম নাগরিক এবং মুসলমানদের আফগানিস্তানে বিদেশী আফগান কিন্তু ভারতীয় নাগরিক।

(৬৬৮) ইসলামী রাষ্ট্রের আহলে যিম্মাদের অর্থাৎ যারা শাসকদের ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং অন্যান্য অধিবাসীদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ
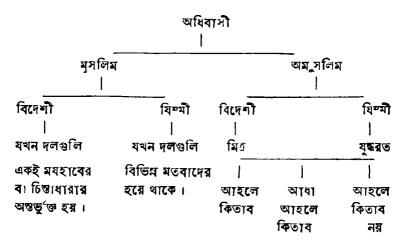
(৬৬৯) মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য বিদ্যমান এবং মুসলিম আইন কোন শ্রেণী বা বর্ণের পার্থক্য মুসলমানদের মধ্যে স্বীকার করে না। সমস্ত মুসলমান এক উম্মতভুক্ত, তারা যেখানেই থাকুক এবং এক আইনের অন্তর্ভুক্ত, এ কথা আবু ইউসুফ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। তথাপি কুরআন[৮] অনুসারে মুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে বাধ্য নয় যদি তারা অমুসলমানদের দেশে থাকে এবং মুসলিম আদালতও বিদেশের মুসল-

মানদের কার্যকলাপ ও দুঃখ দুর্দশা বা নির্যাতনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাদের রক্ষা করা নৈতিক দায়িত্ব মাত্র।*

(৬৭০) ইসলামী রাষ্ট্রে অনৈক মুসলমানের ঔরসজাত শিশু মুসলমান বলে গণ্য হবে এবং কোন শিশুর পিতা-মাতার মধ্যে একজন মুসলিম নাগরিক এবং অন্যজন যদি বিদেশী হয়, তা হলে সেই শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৬৭১) ইসলাম সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে। কেবল আরবে অর্থাৎ ইসলামের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে অমুসলমানকে চিরকাল বাস করতে দেওয়া হয় না। আবু ইউসুফ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (খারাজ, পৃঃ ৭৩) বিধর্মী বা কাফের, মুশরিক, অগ্নিপূজক প্রস্তরপূজক, খৃস্টান, ইহুদী, সকলেই মুসলিম রাষ্ট্রের যিম্মী হয়ে বাস করতে পারে।

(৬৭২) অমুসলমান নাগরিক ও অমুসলমান বিদেশীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। অমুসলিম বিদেশী মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করতে হলে অগ্রিম অনুমতির প্রয়োজন। এই অনুমতি যে কোন মুসলমান নাগরিক, এমনকি ক্রীতদাস কিংবা স্ত্রীলোকও দিতে পারে। সেই অমুসলিম বিদেশী সাধারণ অমুসলমান নাগরিকদের মতোই অধিকার ও কর্তব্যসমূহের অংশীদার হবে।

অমুসলমান বিদেশীকে আমান বা বাস করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতার ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের যে অধিকার আছে, তা সাময়িকভাবে বাতিল করার অধিকার আছে মুসলিম প্রশাসন কর্তৃপক্ষের।

(৬৭৩) খিলাফতের শুরুতে একজন বিদেশী অমুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রে বড় জোর এক বৎসর বাস করতে পারতো। তারও অধিককাল অতিবাহিত করতে হলে তাকে সাধারণ অমুসলমান নাগরিকের মতো একই কর বা খাজনা দিতে হতো এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে হতো। অনেক পরে ১৫৩৫ সালে তুরস্ক-ফ্রান্সের মধ্যে বিদেশীদের অবস্থান সংক্রান্ত সময়সীমা একটি চুক্তির বলে দশ বৎসরের জন্যে বর্ধিত করা হয়েছিল।

২। অমুসলমান, নাগরিক ও বিদেশীর মর্যাদা

(৬৭৪) ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকদের যিম্মী[১০] নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান ফকিহ্‌দের মতে মুসলিম কওম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে যিম্মীরা রাষ্ট্রের অনুগত হলে এবং জিযিয়া দিলে রাষ্ট্রে বাস করার অধিকার, বিবেকের বা স্বাধীন চিন্তার অধিকার, জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তার অধিকার লাভ করে।

(৬৭৫) যিম্মী তার সমস্ত অধিকার হারায় যখন সে—

১. বিদ্রোহী হয়।
২. যখন সে জিযিয়া দান করার দায়িত্ব অস্বীকার করে।
৩. যখন সে সরকারের অবাধ্য হয়।
৪. স্বাধীন মুসলমান মহিলার সংগে ব্যভিচার করে।
৫. রাষ্ট্রের শত্রুর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে, কিংবা সেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করে।
৬. আল্লাহ্‌, রসুল ও ওহীর অবমাননা করে।
৭. একজন মুসলমানকে যখন সে ধর্মান্তরিত করে।
৮. দস্যুতার মধ্যে যখন সে লিপ্ত হয়ে পড়ে।
৯. ইসলামের নীতির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে কোন কাজ করে।
১০. সুদ ইত্যাদি হারাম কাজে যখন সে লিপ্ত হয়।

(৬৭৬) এই সব বিষয়ে সমস্ত মযহাবের ফকিহ্‌দের মধ্যে মতৈক্য নাই। তবে যে ফকিহ্‌গণ উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন, তাঁরা কেবল ছিলেন থিওরীদাতা বা অভিজ্ঞতাহীন আইনদাতাদের অপেক্ষা উদারপন্থী।

(৬৭৭) একজন মুসলিম নাগরিক অন্তরীণ বা বহিষ্কৃত (শাস্তি হিসাবে) হতে পারে কিন্তু চিরদিনের মতো দেশ থেকে বিতাড়িত হতে পারে না। একজন অমুসলমান নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এবং তার হীন কার্যকলাপের জন্যে মসলমানের দেশ থেকে বিতাড়িতও হতে পারে।

(৬৭৮) কুরআন, হাদীস ও চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে খৃস্টান, ইহুদী ইত্যাদি নাগরিকেরা তাদের আইন ও আদালতে নিজেদের বিচার প্রার্থী হতো। তারা স্বেচ্ছায় মুসলিম আইন ও আদালতের আশ্রয় নিতে পারত।[১১] মহানবী (সঃ) হত্যা ও ব্যভিচারের ব্যাপারেও তাদের আইন ও আদালতের শাসনই পছন্দ করতেন।

(৬৭৯) অমুসলিম নাগরিক ও বিদেশীদের মর্যাদা সম্বন্ধে বিভিন্ন ফকিহ্দের মধ্যে মতভেদও আছে। আমি সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না।

(৬৮০) মুসলিম ফকিহ্দের মধ্যে ধর্মের ও দেশের পার্থক্যের দরুণ বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটতে পারে। একজন মুসলমান পুরুষ একজন ইহুদী বা খৃস্টান স্ত্রীলোককে আইনতঃ বিবাহ করতে পারে, কিন্তু তারা পরস্পরের সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে মৃত স্ত্রীর সম্পত্তি তার স্বামী ও তার আত্মীয়ের পরিবর্তে তার পিতামাতা আত্মীয়ের অধিকারভুক্ত হবে। তবে উইল করা বা দান করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত আইন প্রযোজ্য নয়।

(৬৮১) যাকাত মুসলমানদের থেকে আদায় করা হলেও তার অংশ, খলীফা উমরের মতে খৃস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলমান জাতিরাও লাভ করবে। অথচ অমুসলমান প্রশাসন কর্তৃক অমুসলমান থেকে আদায় করা খাজনা অমুসলমানরাই কেবল ভোগ করবে।

(৬৮২) হানাফী মযহাবের অভিমত অনুসারে একজন অমুসলমানকে হত্যার জন্যে একজন মুসলমান ঘাতককে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই দেওয়া হবে। এ বিষয়ে হানাফী মত হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশেরই অনুসরণ করে, যদিও অন্যান্য ফকিহ্গণ এতটা সমর্থন করেন না।[১২]

(৬৮৩) হযরত উমরের খিলাফতকালে তিনি জনৈক শাসনকর্তাকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর খৃস্টান সেক্রেটারীকে পদচ্যুত করার জন্যে। শোনা যায়, তার রাষ্ট্র ভাষায় জ্ঞান ছিল অল্প।[১৩] এমন কি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অমুসলিমকে অপসারণই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে

থাকলেও তিনি ন্যায়সংগত কাজ করেছেন বলা যায়। তখন ইসলাম বিস্তারের কাজ এক যুগও অতিক্রম করেনি এবং বিশেষ শক্তিশালী শাসনকর্তার সচিবের গুরুত্বপূর্ণ পদের কথাও অনস্বীকার্য। ঐ একই খলীফা আবার রাজস্ব ও অর্থ বিভাগে অনেক অমুসলিমকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং এমন কি জনৈক গ্রীক ব্যক্তিকে সিরিয়া থেকে এনে মদীনার অর্থ বিভাগের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেছিলেন, যে কথা বালাযুরী প্রণীত 'আনসাব আল-আশরাফ' পুস্তকটিতে উল্লেখিত পাওয়া যায়। এই বিভাগে আরবীর পরিবর্তে গ্রীক ও ফার্সী ভাষায় দফতরের কাজ চালাবার অনুমতিও দিয়েছিলেন। ঐ খলীফাই একটি মসজিদ ভেঙে ফেলেছিলেন এই কারণে যে, একজন ইহুদীর নিকট থেকে জবরদস্তি জমি কেড়ে নিয়ে তার উপর সেই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এবং সেই জমি তার মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। সেখানে সেই ইহুদীর গৃহ আমাদের কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[১৪]

(৬৮৪) মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমরা নির্দ্বিধায় এসে খলীফার নিকটে দরখাস্ত বা অভিযোগ পেশ করতে পারতো। তাদের অভিযোগ দূরীকরণের জন্য আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নযীর ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

(৬৮৫) ইসলাম কোন ধর্মের বিশ্বাসের উপর বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করেনি। ইসলামের ক্ষেত্রে একথা কল্পনা বহির্ভূত, যে কথা ইয়েমেনের রাজকীয় ফরমানের নির্দেশ মতো ঘোষণা করা হয়েছিল যে, নাজরানের খৃস্টানদের মধ্যে কোনো ইহুদী মেয়েকে ইহুদীর নিকট বিবাহ না দিয়ে কেবল খৃস্টানকে বিবাহ দিতে হবে [১৫]

৩। আইনের পরস্পর বিরোধিতা---

(ক) মুসলিম ও অমুসলিম আইনের মধ্যে ঃ

(৬৮৬) দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি মুসলমান ও অপর পক্ষ অমুসলমান হয় এবং ইসলামী এলাকায় কোনো ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে মুসলিম আদালতে মুসলিম আইন সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দেওয়ানী মামলায়

বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। ফৌজদারী মামলায় অমুসলমানরা কিছু সুবিধা ভোগ করে। প্রথমতঃ মদ্যপান এবং নিষিদ্ধ আত্মীয়ের সংগে বিবাহ ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে অমুসলমানদের দায়ী করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান কর্তৃক অমুসলমান নিহত হলে কিছু ফকিহ্-এর মতে মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না, কেবল তাকে রক্তপাতের বিনিময়ে রক্তপণ (blood money) দিতে হবে। হানাফী মযহাব মতে এ ব্যাপারে মুসলমান ও অমুসলমানে পার্থক্য করা চলে না—মহানবীর এক বাণীর আলোকে।[১৬] তবে হানাফীরাও একজন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় না, যদি সে বিদেশী কোন অমুসলমানকে হত্যা করে। আবু হানিফার ছাত্র শায়বানী একমাত্র ব্যতিক্রম, যার মতানুসারে, অনুমতিক্রমে কোন অমুসলমান বিদেশী বাস করলে; তার অধিকার অমুসলিম নাগরিকের মতই হবে।

(৬৮৭) যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো মুসলমান অমুসলিম রাষ্ট্রে অনুমতিক্রমে অমুসলমান কর্তৃক নিহত, লুণ্ঠিত ও নানাভাবে নির্যাতিত হয়, এবং পরে অপরাধী ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। কারণ যে দেশে পাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে দেশের উপর ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।[১৭] অনুরূপ নির্দেশ মহানবীর নিকট থেকেও পাওয়া গেছে।[১৮]

(খ) অমুসলিম আইনের মধ্যে সংঘর্ষ ঃ

(৬৮৮) যদি ইহুদী ও খৃীস্টানের মধ্যে সংঘর্ষ বা বিরোধ ঘটে এবং কোন্ আদালতে তার নিষ্পত্তি হবে তা স্থির না হয়, তাহলে মুসলিম আইন প্রযোজ্য হবে, এ কথাই বলেছেন প্রখ্যাত ফকিহ্ খলিল।[১৯]

(গ) দুই মুসলিম আইনের মধ্যে ঃ

(৬৮৯) শিয়া ও সুন্নী আইনের পার্থক্য অথবা হানাফী ও শাফেয়ী মযহাবের পার্থক্য পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে, মহানবীর কালে ও সবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আব্বাসীয় আমলে প্রধান কাযী আবু ইউসুফ হানাফী মযহাবের অনুসারীকে কাযী নিযুক্ত করতেন।

আবার ইয়াকুতের সূত্রে জানা গেছে, হানাফী মযহাবভুক্ত রাষ্ট্র খায়েদী শিয়াদের কাযী নিযুক্ত করা হতো আর তাঁরা হানাফী আইন অনুসারে বিচার-ফায়সালা করতেন।

(৬৯০) দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন লোক মারা গেলে যদি ভ্রাতুষ্পুত্র ও দৌহিত্র রেখে যায়, তাহলে ভ্রাতুষ্পুত্রই হানাফী মযহাব অনুসারে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে; কিন্তু শিয়া আইনে হবে ঠিক এর বিপরীত। মিসরে সালাহউদ্দিনের রাজত্বকালে চার মযহাবের কাযী ছিলেন—শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী। তথাপি সমস্যা দেখা দিত যখন অভিযোগকারীরা ভিন্ন ভিন্ন মযহাবভুক্ত হতো। পরবর্তীকালে মৃত ব্যক্তির মাযহাব অনুসারে কিংবা প্রতিবাদীর মযহাব অনুসারে বিচার হতো। এই আইনই বলবৎ ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনামলে এবং মিসরে ও টিউনিসেও তাই হয়ে থাকে।

(৬৯১) ভারতে ও অন্যান্য মুসলিম দেশে শাসকগণ মাঝে মাঝে সুন্নী মযহাব ছেড়ে শিয়া মযহাব কবুল করেছেন। তাতে বিচার বিভাগের দিক থেকে কি ফলাফল হয়েছে তার সুষ্ঠু ধারণা করা সম্ভব হয়নি।

(ঘ) ধর্মান্তর গ্রহণঃ

(৬৯২) কোনো ব্যক্তি মুসলমান হলে তার পার্শী স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। চার জনের অধিক স্ত্রী থাকলে অধিক স্ত্রিগণ তালাক হয়ে যাবে এবং বিনা মোহর-এ কোনো স্ত্রী বিবাহিত হয়ে থাকলে সে মোহর পাবে।[২০]

(৬৯৩) কেবল স্বামী ইসলাম কবুল করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে যদি সে বিধর্মী হয়, অবশ্য আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী বা খৃস্টান হলে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবে না। মুঘল ভারতে হিন্দুরাও ঐ শ্রেণীভুক্ত হতো। এমন কি পূজা-অর্চনার জন্যে গৃহের অভ্যন্তরে মন্দিরও নির্মাণ করে দিতেন মুসলমান স্বামীরা।

(৬৯৪) স্ত্রী আহলে কিতাব না হলে তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হওয়ার জন্যে তাকিদ দেওয়া হবে। যদি সে তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে তালাক দিতে হবে।

(৬৯৫) স্ত্রী মুসলমান হলে স্বামীকে মুসলমান তিন মাসের মধ্যে হতে হবে। ঐ সময়ের ভিতরে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্থগিত থাকবে। যদি স্বামী তা না করে তো বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

(৬৯৬) একজন মুসলমানের ইহুদী স্ত্রী খৃস্টান হলে বিবাহ ছিন্ন হবে না, কারণ উভয় ধর্মই ইসলামের নিকট গ্রহণীয়।

৪। বিদেশে মুসলিম নাগরিক

(ক) অন্য মুসলিম রাষ্ট্র :

(৬৯৭) দুই সপ্তাহের জন্য অবস্থান করলে একজন মুসলমান স্থানীয় নাগরিক হয়ে যায় এবং নামাযের কসর ইত্যাদির সুবিধা সে পায় না।

(৬৯৮) প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে যুবায়ের দেখেছিলেন কায়রোতে সুলতান সালাহউদ্দীন মাখরেবীদের মধ্য হতে মিসরে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে ইনসাফ করার জন্যে মনিটার নিযুক্ত করেছিলেন।

(৬৯৯) সউদী আরবে জাতীয়তার আইন পাস করা হয়েছে—যার ফলে মুসলিম হাজী ও বিদেশ হতে আগমনকারী ব্যক্তিরা বসবাসের জন্যে নাগরিকত্ব লাভ করে।

(খ) অমুসলিম দেশে মুসলিম :

(৭০০) প্রাচীন কালে মুসলমানরা অন্যান্য দেশে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। যেমন মহানবীর আমলে আবিসিনিয়ায়, চীনে, তুর্কীস্তানে, মালাবারে (ভারতে) ও অন্যান্য দেশে।

(৭০১) মসূদী বলেন,[২১] কাস্পিয়ান সাগর এলাকায় স্থানীয় অমুসলমান শাসক তাঁর দেহরক্ষী[৭২] হিসাবে মুসলমানদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তাঁর দেশে বিবিধ নাগরিকদের জন্যে সাতটি

আদালত ও সাতটি বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন এবং অনেক মোকদ্দমা মুসলিম আইন অনুসারে ফায়সালা হতো।[২৩]

উপসংহার ঃ

(৭০২) দেখা গেল, আইনের সংঘর্ষ বা জটিলতা মুসলমান ফকীহ্‌দের মতে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় এবং ধৈর্যশীল গবেষকদের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি কাজ।

(৭০৩) ইবনে কাইয়েম্যের মতো একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের লেখা 'আহ্‌কাম আহ্‌ল আয্‌-যিম্মা' নামে এক পাণ্ডুলিপি হায়দ্রাবাদে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর প্রথম খণ্ডে ৬০০ পৃষ্ঠা আছে।

———

টীকা ঃ

১। Proceedings of the first All-India Law Conference, Hyderabad, Decean, 1945 দ্রষ্টব্য।

২। কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩।

৩। New Testament, রোমানদের নিকট পল-এর পত্র, X 4. ম্যাথুর রাণীর বিরুদ্ধে, V, 18.

৪। কুরআন, ১৭ ঃ ৩৪ এর সংগে তুলনীয়।

৫। কুরআন, ৩০ ঃ ২২।

৬। কুরআন, ২ ঃ ৬২, ৫ ঃ ৬৯।

৭। দাবুসী, আল-আসরার (ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি)।

৮। কুরআন ৮ ঃ ৭২।

৯। কুরআন ৪ ঃ ৭৫

১০। Antonie Fattal, রচিত Le Statut legal dcs non-Musulmans en pays d' Islam, Beyrouth, 1958.

১১। তুলনীয়, বুখারী, ইবনে হিশাম ইত্যাদি এবং Bible, Leviticus, XX, 10 etc.

১২। আবু ইউসুফ, شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২

১৩। বালাযুরী, আনসার (ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯২–৩।

১৪। (তুলনীয়), Cardahi, Droit International Prive.

১৫। তুলনীয় Desvergers, L. Arabic.

১৬। সারাখ্শী, شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২।

১৭। উপরোক্ত, মাবসুত, খণ্ড, ১০ ; পৃঃ ৯৫ ঃ ৭।

১৮। প্রাগুক্ত, شرح السير الكبير ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৮।

১৯। প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।

২০। Hindus of Malabar, West coast of south India.

২১। লেখকের "Exterritorial Capitulations in Favour of Muslims in Classical Times", The Islamic Review, vol. 37, January, 1950, pp. 32—36.

২২। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোরও এই রীতি ছিল ; মরক্কোর স্পেন এলাকা ত্যাগ করার পূর্বে।

২৩। তুলনীয় মুরুয-আল-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০-১২, ইউরোপ হতে প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট (গ)

গ্রন্থপঞ্জী

১। আরবী, উর্দু, ফারসী এবং তুর্কী গ্রন্থাবলী

[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিষয়বস্তুর জন্যে ব্যাপক ধরনের দলিল আবশ্যক। যেমন—কুরআনের তফসীর সম্পর্কিত সকল গ্রন্থ, হাদীস অথবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী ও কর্মসম্পর্কিত সকল রচনা, ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, আইন, কৌশল ও কূটনীতি এবং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর রচিত দলিলাদি।

আমরা আরবী পাণ্ডুলিপিগুলির উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি এবং তারপরই প্রাচ্য দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং দলিলগুলি অক্ষরের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে]।

ক) আরবী পাণ্ডুলিপি

احكام اهل الذمـة لشمس الدين ابن القيم (المتوفى ٧٥١) الجزء الأول عند الدكتور محمد غوث (فى كتب خانـه سعيديـه) فى حيدراباد و لم نجد لها اثرا غير هذه النسخـة الوحدة المكتوبـة سنة ٨٦٩ فى ٢٨٦ ورق (طبع دمشق) .

احكام السلاطين و الملوك لمحمود بن احمـد بن محمد المجاور بمكة (بخط المولف)' خطيـة عارف حكمة بك فى المدينة رقم (١٣) تاريخ .

الأدلة الرسمية فى التعابى الحربية لمحمد بن المنكلى (تاليف سنة ٧٠٧ خطية ايا صوفيا رقم) (٢٨٣٩) .

الاسرار فى الفروع لابى زيد الدبوسى (المتوفى سنة ٤٣٠)' خطيات عارف حكمت بك فى المدينـة و ولى الدين و داماد زاده و سليم اغا فى استانبول .

الاصل للامام محمد بن الحسن الشيبانی (المتوفی سنة ١٨٩)، خطيات ايا صوفيا و عاطف افندی فی استانبول و كتب خانه آصفيه فی حيدراباد.

اصول الفقه (الحنبلی) لموفق الدين بن قدامة خطية قونية (ميكر و فلم عندی).

الاعلام عن الحروب الواقعة فی صدر الاسلام ليوسف بن ابراهيم الاندلسی، خطية المكتوبة الملكية بمصر.

كتاب الاموال لابن زنجويه (مخطوطه بردور فی تركيا، و قطعة منها فی دمشق).

البحر المحيط و هو انتخاب كتب الامام محمد الشيبانی، خطية ولی الدين فی استانبول رقم (١٣٠).

تاريخ الاسلام الكبير لشمس الدين الذهبی (المتوفی سنة ٧٥٣)، خطية المكتبة الملكية بمصر و ايا صوفيا فی استانبول و ثلاث مجلدات عندی (تحت الطبع فی مصر).

تاويلات القران للامام الماتريدی (المتوفی ٣٣٣)، خطية لاله لی فی استانبول.

تخريج الدلالات السمعية علی ما كان فی عهد رسول الله من الحرف و الصنايع و المعاملات الشرعيه لابی الحسن الخزاعی المولفة سنة ٧٨٧، خطية شهيد علی باشا فی استانبول رقم (١٨٥٣) و خطية ناقصة فی الزيتونية بتونس (طبع بتونس).

تقييد العلم للخطيب البغدادی المتوفی ٤٦٣ خطية برلين (طبع مصر).

الخراج و صنيعة الكتابة لقدامة بن جعفر (المتوفی ٣١٠ او ٣٣٧)، خطية ناقصة فی كو لرولو فی استانبول و نقل انتخاب هذه الخطية فی باريس و ورقه واحد فی بودليان باو كسفورد و هی منسوبة الی قلاقة هناك سهوا (طبع فی لايدن قسم منه).

الذخيرة البرهانية لبرهان الدين المرغينانی، خطية يكی جامع فی استانبول.

كتاب الردة للواقدى (المتوفى سنة ٣٠٧) ، خطية بانكى بور فى لهند و نقلها عندى .

الرسالة الوجيزة المخيرة فى ان التجارة الى ارض الحرب و بعث المال اليها نص مزيل ابركه بمحمد بن احمد بن محمد بن يوسف الرهونى المتوفى ١٢٣٠ ه (خطية ربالط)

سيرة ابن اسحاق " خطية ناقصة فى القرويين بفاس " وقسم اخر فى الظاهرية بدمشق، ترجمتها الفارسية فى باريس و المختلف البريطانى بلندن

شرح مختصر الطحاوى للجصاص، ٣ مجلدات ، خطية قونية (ميكر و فلم عندى) .

شعب الايمان عبد الجليل خطية بشير آغا فى استانبول والكتانية فى فاس واحمد كويا فى جامع بمليبار فى الهند و مكتبة الجامع الكبير فى صنعاء .

غياث الامم لامام الحرمين الجوينى (المتوفى ٤٧٨) خطيتان فى بانكىبور، والنقل المبنى عليهما جميعا عندى وقطع منه فى الازهر بالقاهرة .

الفتاوى التاتار خانية فى سبع مجلدات كبار، خطية عندى وايضا فى آيا صوفيا و غيرها فى استانبول .

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانه/اشرح كتاب الخراج لابى يوسف الفقه عبد العزيز بن محمد الرحبى خطية ... لى (رقم ١١٦٩) . فى استانبول (بخط المولف المورخة سنة ٦٣ و نسخة اخرى فى مكتبه وهبى (افندى) (رقم ١٠٣٣) .

المبسوط راجع الاصل للامام محمد الشيبانى .

المحيط برض الدين السرخسى (المتوفى ٦٨) ، خطية ولى الدين فى استانبول .

المحيط برهان الدين المرغينانى (المتوفى ٥٩٣) ، خطية يكى جامع فى استانبول .

مسائل الحيطان والطرق لمحمد بن على الدامغانى (المتوفى ٣٧٨)، خطية برلين .

المنمق لابن حبيب البغدادى المتوفى ٢٣٥، خطية ناصر حسين بلكهنو فى الهند ونقلها عندى و طبع فى دائرة المعارف بحيدراباد .

كتاب فى الجهاد والمغازى لموءلف مجهول خطية المكتبة الملكية بمصرفصل التاريخ رقم (٣٠٧٥) .

খ) প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদি
আরবী ভাষার গ্রন্থাবলী

الأحكام السلطانيه لابى يعلى الفراء الحنبلى (المتوفى ٤٥٨ طبع مصر .

الاحكام السلطانية للماوردى الشافعى (ف ٤٥٠) .

اختلاف علماء الامصار، كتاب الجهاد والجزية للطبرى (ف ٣١٠)، لايدن ١٩٣٣ .

اصول الفقه للسرخسى، طبع مصر فى مجلدين .

اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لشمس الدين محمد بن على بن محمد بن طولون (ف ٩٥٣) . وفى آخره ضميمة اسمها مجموعة كتب النبى لابى جعفر الديبلى السندهى المتوفى قرن الثالث للهجرة رواية عن عمرو بن حزم رضى الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه و سلم على اليمن - طبع دمشق .

اعلام الموقعين لابن القيم (ف ٧٥١) .

الاسلام و اصول الحكم لعلى عبد الرازق (بحث فى الخلافة والحكومة فى الاسلام ، و الطبعة الثانية ١٣٤٤ھ و ترجم الى الفرنساوية ايضا) .

آقدم دستور مسجل فى العالم ' وسيقة سياسية مهمة للعهد النبوى 'تاليفى' طبع حيدرآباد .

امتاع الاسماع (فى السيرة النبوية) للمقريزى ، لم يطبع فى مصر الا المجلد الاول .

انساب الاشراف للبلاذری (ف ۲۷۹)، خطیة استانبول و الرباط و المطبوع منه جزء فی ألمانیا و جزأن فی القدس فی الجامعة العبریه و جزء فی مصر .

التاج للجاحظ (ف ۲۵۵) و له نسخة علی الرق فی الکتابة بفاس فلم یبق شک فی انه للجاحظ . و له ترجمه فرنساویة .

التبر المسبوک فی نصیحة الملوک للغزالی (ف ۵۰۵) .

تحفة المجاهدین فی بعض اخبار البرتکالیین لزین الدین المعبری (ف ۹۸۷) طبع فی لشبونه مع ترجمة برتکالیة و لها ترجمة هندیة وانکلیسیة .

التعریف بالمصطلح الشرف لابن فضل الله العمری (ف ۷۴۹) .

تفاسیر القرآن خاصة للطبری (ف ۳۱۰) ومحمد عبده .

تواریخ الاسلام خاصة للطبری ، و ابن الاثیر (ف ۶۳۰)، المسعودی (ف ۳۴۵) ، و الیعقوبی (ف ۲۸۴) ، و ابن کثیر (ف ۷۷۴) ، و البلاذری (ف ۲۷۹) ، و ابن سعد (ف ۲۳۰) .

الحجة الله البالغة لولی الله دهلوی (ف ۱۱۱۴) .

حدیث النبی صلی الله علیه وسلم خاصة الصحاح الستة و السنن الکبری للبیهقی و کنز العمال لعلی المتقی الهندی و الجامع الصغیر و الجامع الکبیر للامام محمد الشیبانی (ف ۱۸۹) .

حقائق الاخبار عن دول البحار لاسماعیل سرهنک باشاء ۳ مجلدات طبع مصر .

الخراج لابی یوسف (ف ۱۸۲) و له ترجمة ترکیة و فرنساویة و طلیانیة و خلاصة المانیة و ترجمة هندیة تحت الطبع فی الجامعة العثمانیة .

الخراج لقدامة بن جعفر (ف ۳۱۰) طبع جزء من الخطیة الناقصة فی استانبول فترجم الی اللغة الهندیة فی الجامعة العثمانیة .

الخراج لیحی بن آدم القریشی (ف ۲۰۳) طبعة ثانیة مصر اکمل من طبع اوربا .

الخلافه و الامامة العظمى لرشيد رضا ، لبع مصر ١٣٤١ ه .
الخلافة و سلطة الامة لعبد الغنى سنى بك طبع مصر ١٣٤٢ه .
الذخائر و التحف للقاضى الرشيد بن الزبير (ف ٣٦٣ تقريباً)
طبع الكويت ١٩٠٩ (١٣٧٩ ه) .
الرد على سير الاوزاعى ف ١٥٧) للامام ابى يوسف (ف ١٨٢)
نشره مجلس احياء المعارف النعمانية فى حيدرآباد .
الرسالة القبرصية خطاب لسجواس ملك قبرص لا بن تيمية
(ف ٧٢٨) .
رسل الملوك و من يصلح للرسالة و السفارة لابى على الحسين
بن محمد المعروف بابن الفراء (من القرن الرابع او الخامس) طبع
مصر ١٣٦٦ ه .
سراج الملوك للطرطوشى (ف ٥٢٠ او ٥٢٥) .
السياسة الشرعية لابن تيمية (ف ٧٢٨) .
السياسة الشرعية او نظام الدولة الاسلامية فى الشئون الدستورية
و الخارجية و المالية لعبد الوهاب خلاف لطبع قاهرة ١٣٥٠ ه .
السير الحثيث فى تاريخ تدوين الحديث لمحمد زبير الصديقى
(فى تقرير مؤتمر دائرالمعارف العثمانية بحيدرآباد ١٣٥٨ ه) .
سيرة النبى صلى الله عليه و سلم خاصة لابن هشام (ف ٢١٨) و
السهيلى و الحلبى و الديار بكرى و القسطلانى و الزرقانى و الشامى
و ابن سيدالناس و كرامت على و موسى بن عقبه (ف ١٤١) .
المطبوع فى برلين جزء من مغازيه ايضاً امتاع المقريزى .
ابواب السير والجهاد فى كتب الفقه والفتاوى خاصة المجموع
للامام زيد بن الامام العابدين (ف ١٢٠)، والموطا للامام مالك (ف١٧٩)،
والمبسوط للسرخسى (ف ٤٨٣)، والام للامام الشافعى (ف ٢٠٤ ،
والمدونة لسحنون (ف ٢٣٩)، والمختصر للقدورى (ف ٤٢٨)،
والهداية للمرغينانى (ف ٥٩٣)، و شرحه فتح القدير لابن الهمام
(ف ٨٦١)، والبداية المجتهد لابن رشد (ف ٥٢٠)، و فتاوى قاضى خان
(ف ٥٩٢)، و الفتاوى الهندية العالمغيرية ولها ترجمة هندية

وبدائع الصنائع للكاسانى (ف ٥٨٧)، وكذلك فى دعائم الاسلام فى الفقه الفاطمى الاسماعيل للقاضى النعمان بن محمد (ف ٣٦٣)، كتاب الجهاد منه طبع مصر ٣٧٠ ه

شرح السير الكبير للامام محمد الشيبانى الفه السرخسى (ف ٤٨٣) مطبوع فى حيدرآباد فى ٤ مجلدات وله ترجمة تركيه لعينتابى مطبوع فى استانبول قبل طبع الاصل العربى بماية سنة تقريباً.

الشرح الدولى فى الاسلام لنجيب الارمنازى طبع دمشق ١٣٤٩ ه.

صبح الاعشى للقلقشندى (ف ٨٢١).

الطرق الحكمية لابن القيم (ف ٨٥١).

كتاب الطهارة لابن مسكويه (ف ٤٢١).

العقد الفريد لابن عبد ربه (ف ٣٢٨).

العلاقات الدولية فى الحروب الاسلامية لعلى قراعة، القاهرة ١٣٧٤ ه

عيون الاخبار لابن قتيبة (ف ٢٧٠ او ٢٧٦) فى ٤ مجلدات راجع ابواب السلطان وابواب الحرب.

الفخرى لابن الطقطقى (الفه فى سنة ٧٠١).

فكرة الاسلام فى العلاقات الدولية لمحمد عبد العزيز نصر (فى مجلة كلية الادب، الاسكندرية، ج ٨، ١٩٥٩).

المحبر لابن حبيب البغدادى (ف ٢٤٥)، طبع حيدارآباد ١٣٦١ ه.

المختصر (فى الفقه الحنفى) للطحاوى، نشره جمعية احياء المعارف النعمانية بحيدرآباد.

المستطرف من كل فن المستطرف للابشيهى، مجلدان.

نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الاداريه والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلميه التى كانت على عهد تاسيس المدنية الاسلامية فى المدينة المنورة العلية لعبد الحى الكتانى طبع برباط فى مراكش فى مجلدين وهو شرح تخريج الدلالات للخزاعى المذكور فى المصادر الخطية.

الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة (مع خرائط و فوتو غرافات) لمحمد حميد الله نشرة لجنة الترجمة والتاليف والنشر بمصر سنه ١٣٦٠ ه، طبعه ثانية ١٣٧٦ ه.

উর্দু ভাষার গ্রন্থাবলী

اجنبی اقوام کو مراعات خصوصی - محمد حمید اللہ (مجلہ عثمانیہ، حیدرآباد، دکن ج ۱۶، ع ۲، سنہ ۱۳۰۲ فصلی) .

اسلام کے معاشی نظر - محمد یوسف الدین - ۲ جلد - حیدرآباد، دکن ۱۹۵۰

اسلامی معاشیات - مناظر احسن گیلانی - حیدرآباد - دکن ۱۹۳۷

تاریخ القرآن - اسلم جیراجپوری .

تاریخ القرآن - مفتی عبد اللطیف .

تاریخ القرآن - عبد الصمد صارم .

تاریخ صحف سماوی - نواب علی .

تحقیق الجهاد - چراغ علی . حیدرآباد دکن ۱۹۱۳ .

تدوین حدیث - مناظر احسن گیلانی - مقالہ اولی، مجلہ تحقیقات علمیہ، جامعہ عثمانیہ - مقالہ ثانیہ ایضا - مقالہ ثالثہ مجموعہ مقالات حیدرآباد اکادمی .

جدید القانون بین الممالک کا آغاز مولفہ ارنیست نیس (فرانسیسی) اردو ترجمہ جامعہ عثمانیہ .

الجہاد فی الاسلام - ابو الاعلی مودودی - دار المصنفین - اعظم گرہ، ۱۹۳۸ .

خطبات مدراس - سید سلیمان ندوی (باب تدوین حدیث) .

رسول اکرم کی سیاسی زندگی - محمد حمید اللہ - لاہور - سنہ ۱۳۶۹ ھ .

عہد نبوی کے میدان جنگ - محمد حمید اللہ - طبع ثالث - حیدرآباد، دکن ۱۹۳۵ .

عہد نبوی کا نظام حکمرانی - محمد حمید اللہ - طبع ثانی - حیدرآباد، دکن .

قانون بین الممالک کی تازہ ترقیاں اور جدید تحقیقاتیں - محمد حمید اللہ (مجلہ طیلسانیین حیدرآباد، دکن - ۱۳۵۰ فصلی) .

قانون بین الممالک کے اصول اور نظریں - طبع ثانی - حیدرآباد، دکن ۱۳۶۴ ھ .

قانون بین الممالک کا اغاز و ارتقاء - محمد حمید الله (مجلد تاریخ و سیاست ' کراچی ' اپریل ۱۹۵۱) .

ফারসী ভাষার গ্রন্থাবলী

ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء از شاه ولی الله دهلوی (ف ۱۱۱۴)' (ترجمه اردو هم دارد) .

তুর্কী ভাষার গ্রন্থাবলী

تاریخ حقوق بین الدول ' مولفی ابراهیم حقی ' استانبول ۱۳۰۳ھ (فصل اول - ۳ : اسلامیت) .

تورکیه جمهوریتی و سیاست ملیه و اقتصادیه ' مولفی دوکتور لطفی ، استانبول - ۱۳۴۰ .

২। ইউরোপীয় ভাষার গ্রন্থাবলী

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ঠিক প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির তালিকার মতই এক্ষেত্রেও কেবল নির্বাচিত গ্রন্থ ও রচনাদির একটি তালিকা দেয়া হলো]

ABEL, ARMAND, *La convention de Nadjran et le developpement du droit des gens dans l' Islam classique,* Greoninghe, Courtrai, 1945.

ABDUR RAHIM, *Principles of Muhammadan Jurisprudence,* Calcutta, 1911, see particularly, Ch. xii. (Also Urdu and Italian translations.)

AMARI, M., *I Diplomi arabi del r. Archivio fiorentino,* Florence, 1863, Appendix, 1867.

—— *Storia dei Musalmani di Sicilia,* Florence, 1854.

ANONYMOUS, Ueber die oberste Herschergewalt nach dem muslimischen Staatsrecht,' *Abhandlung d.I.Cl.d.k. Byr.,* Akademie der Wissenschaften, Vol. IV, Abh. 3.

ARMANAZI, NEGIB, *L' Islam et le droit international,* Paris, 1929. (Also Arabic edition with ameliorations.)

ARME, T.J., *La Suede et l' Orient,* Uppsala, 1914.

ARNOLD, T.W., *The Caliphate,* Oxford, 1924.

Barbeyrac, Jean, *Histoire des traites avant Charlemagne,* Amsterdam, 1739.

BECKER, C.H., 'Studien zur Omajjadengeschichte,' *Zeitschrift fur Assyriologie,* Vol. XV, 1900, PP. 1-36.

—— "Deutschland und, der heilige krieg" *Internationale Monatschrift*, 1915, Sp. 631-62, 1033-42.

BELIN, 'Fetwa d'el-Nakkache relatif a la condition des dhimmis', *Journal Asiatique,* 1861.

—— "Du regime des fiefs militaires dans l'Islamism" ibid., 6th series, Vol. XV. PP.219ff.

BERCHEM, Van, *La propriete territoriale et l'impot foncier chez les premiers Califes Geneve,* **1886.**

BERGSTRAESSER, *Grundznege des islamischen Rechts,* Berline und Leipzig, 1915.

BLUNTSCHLI, *Das Voelkerrecht der civilisierten Staaten,* 3rd ed., 1878.

BOECK, DE, "De la Nationalite dans les pays musulmans" *Delloz periodique,* 1908, PP. 121 et seq.

BON, GUSTAVE LE, *La Civilisation des Arabes,* Paris, 1884. (Also Urdu trs.)

BORDWELL, *Law of War between Belligerents* Chicago, 1908, see pp. 12-4.

BOUSQUET, "Le mystere de la formation et des origines du Fiqh". *Revue Algerienne, Tunisienne et Marocaine de la legislation et de jurisprudence.* Vol. LXIII, 1947, Alger, pp. 66-88.

CAETANI, L., *Annali del l' Islam* (Up to the year 40 H only). 8 vol. Milano, 1905 et seq.

CARDAHI, CH., "La Conception et la pratique du droit international prive dans l'Islam.' Etude juridique et historique. *Recuil des cours de l' Academic du droit international de la Haye,* 1937 ii, article 5, 36 pages.

CHAFIK-CHEHATA, *Essai d'une theorie general de l'obligation en droit musulman,* le Caire, 1936.

CHAYGAN, M., *Essai sur l' histoire du droit public musulman,* Paris, 1934.

CHIRAGH ALI *A Critical Exposition of the popular Jehad,* 1885.

CIBIOHOWSKI, *Das antike voelkerrecht,* Breslau, 1907.
DRAPER, *History of Civilization in Europe.*
DRAZ,
'ABDALLAH, "Le droit international puplic de I' Islam'." *Revue Egyptienne de droit international* Vol. V, 1949, pp.17 ff.
DESVERGERS, N., *Arabic,* Paris, 1847.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, s.v. *Caliphate* etc.
ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM (Also German and French translations).
ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS, s.v. *War, etc.*
ERDMANN, *Die Entstehung des Kreuzzugsgedaaken,* Stuttgart, 1935.
FAGNAN, E., *Le Djihad ou guerre sainte selon l' Ecole malekite,* Alger, 1908.
—— *Le Livre de l'impot foncier, trad. d'Abou*-Yousof, Paris, 1921.
—— *Les Status gouvernementaux* ou regles de droit public et administratif, trad. de Mawerdi, Alger, Jourdan, 1915.
FAHMY, ALY MOHAMED, *Muslim Sea Power,* 1950.
FALLATI, Keime des volkerrechts bei wilden und halbwilden Staemmen" in *Z.f.d.ges.,* Staatswiss, 1850, VI. 151ff.
FATTAL, A., *Le statut legal des non-musulmans en pays d' Islam,* Beyrouth, 1958.
GARDET, LOUIS, *La cite musulmane,* Paris, 1954.
GUDEFROY-DEMOMBYNES, *Le Monde musulman et byzant in jusqu'aux Croisdes,* Paris, 1931.
GIBBON, *Decline and Fall of the Roman Empire,* ed. of Oxford University Press cited.
GOADBY, F., *International and Interreligious Private Law in Palestine,* Jerusalem, 1926.

GOEJE, M. J. DE, *Memoire sur la conquete de la Syrie,* 2nd ed. Leiden, 1900.

GOLDZ IHER, I., *Muhammedanische Studien,* 2 vols., Halle, 1889.---*La Loi et le dogme dans I' Islam,* Paris. Also Eng. trans. of Vol. I (Muslim *Studies*) by C.R. Barber and S.M. stern. London, 1967.

GROWE, *Epochen der voelkerrechts geschichte* (ans den Fauhen).

HAMIDULLAH, M., "Die Neutralitat im islamischen Voelkerrecht" *Zeitschrift der deutschen morgen laendischen, Gesellschaft,* 1935, Berlin.

——— *La Diplomatie musulmane a l' lepoque du Prophete et des Khalifes Orthodoxes,* 2 vols., Paris, 1935.

——— "The Quranic Conception of State," *Quranic World,* Hyderabad, April 1936. (Also Urdu Trs.)

——— *Nouvelle etude des sources du droit musulman,* contributed to the Istanbul 1951 session of the Int. Congress of Orientalists.

—— "Early History of the Compilation of the Hadith'," *The Islamic Review,* Woking, February 1949.

—— "The International Law in Islam", ibid, May 1951.

—— *Exterritorial Capitulations in Favour* of *Muslims in Ancient Times,* in : Miscellany No.I. of Islamic Research Association, Bombay, 1949.

——— "Military Intelligence in the time of the Prophet", *The Islamic Literature,* Lahore, July 1950.

—— *Le Coran,* Paris, 1959.

—— *Le Prophete de l' Islam, sa vie et son oeuvre,* 2 vols., Paris, 1959.

—— 'Some New Developments in the British Conception of Neutrality as against Muslim Countries," *The Islamic Review,* Working, August 1951.

—— "Influence of Roman Law on Muslim Law," *Hyderabad Academy Journal,* Vol. II. 1943 Hyderabad-Deccan.

—— "Constitutional Precedents and Practice of the Orthodox Islam," *Select Constitutions of the World,* Vol. I, Karachi, 1948, pp. 9-21.

—— "Islamic Precedents on Division of Power between Centre and the Component Parts," ibid., pp. 22-6.

—— "Place of Islam in the History of Modern International Law" (Extension lecture of the Univ. of Madras), in *Journal of Hyderabad Academy*, Vol. 11, 1940.

—— "The City-State of Mecca," *Islamic Culture,* Hyderabad, July 1938. (Also Urdu trs.)

—— The First Written-Constitution of the World. *The Islamic Review,* Woking, 1941. (Also Urdu and Arabic trs.)

—— 'Diplomatic Relations of Islam with Iran in the Time of the Prophet," *Proceedings of the second Session of Idarah Ma'arif Islamiyah,* Lahore. (Also in Urdu.)

—— "Budgeting and Taxation in the Time of the Holy Prophet," *Journal of Pakistan Hist. Soc.,* Karachi, 1955. Also *The Islamic Review,* Woking, Nov. 1956.

—— "Islamic Notion of Conflict of Laws," *Proceedings of All-India Law Conference,* 1944, Hyderabad.

—— "Administration of justice in Early Islam," *Islamic Culture*, Hyderabad, April 1937. (Also enlarged Urdu version.)

—— "Les Camps de bataille an temps du Prophete," extension lecture of the University of paris, with maps and illustrations, *Revue des Etudes Islamique*, Paris, 1939. (Also enlarged Urdu version.)

—— "The Battlefields of the Prophet Muhammad;" *The Islamic Review*, Woking, September 1952 onwards.

—— "Nouvelle etude des sources du droit Islamique", *Proceedings of Istanbul* (1951). *Session of the Int. Congress of Orientalists.*

——"Embassy of Queen Bertha of Rome to Caliph at-Muktafi Billah," *Journal of the Pak. Hist. soc.* 1953, pp. 272-300.

— "The Friendly Relations of Islam and How They Deteriorated", ibid., 1953. pp. 41--5.

HANEBERG, "Das muslimische Kriegsrecht", *Abhandl. d. philoso-philolog. Cl. d. Bayrisch.* Akad, d. Wissenschaften, 1869.

HARTMANN, M.', "Die islamisch-frankischen staatsvertrage (Kapitulation)", *Zeitsch f. Politik,* Vol. 11, 1918, pp. 1-64.

HATSCHEK, *Der Musta'min,* ein Beitrag zum internationalen Privat und Volkerrecht des islamischen Gesetzes, Berlin, 1919.

HEFFENING, W., *Das islamische Fremdenderecht,* Hannover, 1925.

—— "Die Entstehung d. Kapitulationen in den islamischen Staaten"', *Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkwirtschft im deutbchen Reiche, Verlag Dunker und Humbolt,* Munhchen, 1927", pp.99-107.

HEYD, Histoire du commerce du Levant.
HITTI, P.K., *History of the Arabs.*
—— Translation of Baladhuri's *Futuh-ul-Buldan.*
HOLTZENDORFF, *Handbuch des Volkerrechts,* see first of the four vols.
HOUDAS, O., "La guerre sainte islamique", *Revue des Sciences Politiques,* Paris, 1915.
HUART, C., "Le Droit de guerre," *Revue du Monde Musulman* Paris, 1907.
—— "Le Khalifat et la guerre sainte," *Revue de l' Histoire des Religions,* 1915.
—— *L' Histoire des Arabes,* Paris, 1929.
INOSTRANCEV, C., "Note sur les rapports de Rome et du califat abbaside au commencement du Xe siecle," RSO, Rome, Vol. IV, 1911-2. pp. 81-6.
JACOB, G., *Der nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter,* Leipzig, 1887.
JEHAY, F. VAN DEN STEEN DE, *De la Situation legale des sujets Ottomans non-Musulmans,* Bruxelles, 1906.
JURJI, EDWARD J., "The Islamic Theory of war", *The Muslem World,* 1940, XXX, 332-42.
JUYNBOLL, TH.W., *Handbuch des islamischen Gesetzes,* Leiden, 1910.
KHADDURI, MAJID, *The Law of War and Peace in Islam,* Luzac, London, 1941 ; 2nd ed., Baltimore, 1955.
—— *The Islamic Law of Nations, Shaybani's Siyar,* Baltimore, 1966.
—— "International Law," being a chapter in : *Law in the Middle East,* I. 349-52, Washington, 1955.
—— "Islam and the Modern Law of Nations", *American Journal of International Law,* Vol. L (1956), pp. 358-72.

—— "The Islamic System : Its Competition and Co-existence with Western Systems" *Proceedings of American Society of International Law,* 1959, P. 49-52.

—— 'Islamic Theory of International Relations and Its Contemporary Relevance." *Islam and International Relations,* ed. J.H. Proctor, New York, 1965, pp. 24-39

KREMER, VON, *Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen,* Wien, 1875. (Also English trs.)

KRUSE, HANS, *Islamische voelkerrechtslehre,* Goettingen, 1953.

—— "The Notion of Siyar", *Journal of Pakistan Historical Society,* Karachi, 1954, ll, 16-25.

LANE-POOLE, "The First Mohammedan Treaties with Christians", *Proceedings of the Royal Irish Academy,* Vol. XXIV, 1904.

LIPPMANN, K., *Die Konsularjuridiktion in Orient*, Leipzig, 1898.

MACDONALD, D.B., *Development of Moslem Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory,* New York, 1903.

MAJID, S. A., "Muslim International Law," *Law Quarterly Review*, London, 1912, pp. 89, et seq.

MARTENS, F., *Das Konsularwesen u. die konsularjuridiktion im Orient,* trs. by Skerst, Berlin, 1874.

MAS LATERIE, DE, *Traites de paix et de commerce ..concernant les relations des Chretiens avec les Arabes de l' Afrique septentrionale, avec une introduction historique,* paris, 1866 ; Supplement, 1872.

MEZ, A., *Die Renaissance des Islams,* Heidelberg, 1922. (Also Engl. trs.)

MILLIOT, "La conception de l' Etat et de l' ordre legal dans l' Islam, *Recueil des Cours,* La Haye, No. 75 (1949/ II), pp. 591ff.

MORAND, "Le droit musulman et le conflit des lois, *Acta academicae universalis jurisprudentiae* I., 321ff.

MOUDAOU' AR, Djemil Nakhm, *Chronique du temps de Haroun el Reshid et sur son ambassade & Charlemagne*, Le Caire, 1905.

MULLER, A., *Der Islam in Morgen-und Abendland*, 2 Vols., Berlin, 1885-7.

NALLINO, *Raccolta di Scritti*, Vol. IV, pp. 85 ff. Rome, 1942, denying influence of Roman law on Muslim law.

NEGIB ARMANAZI, *Vide* Armanazi.

NYS, E., *Etudes de droit international public et de droit Politique*, see pp. 46-74.

—— *Le droit de la guerre et les precurseurs de Grotius*, Bruxelles, 1882.

—— *The Papacy Considered in Relation to International Law*, English translation by Rev. P.A. Lyons, London, 1879.

—— *Les Commencement de la Diplomatic*, Bruxelles, 1884.

—— *Les Origines du droit international*, Bruxelles, 1894. see particularly pp. 209 *et seq.* (Urdu trs. Published by Osmania University.)

—— "Le Droit des gens dans les rapports des Arabes et des Byzantins", *Revue du droit International et legislation Comparee*. Bruxeles, XXVI, 1894.

OSTROROG, L., *The Angora Reform*, London,

—— Trad. francaise de Mawerdi (*Traite de droit public musulman*, Paris, 1901).

PARADISI, *Diritto internazionale nel Medio evo*, Vol. I, Milan, 1940.

PERIER, J., *Vie d'al-Hadidjaj ibn Yousof*, Paris, 1904.

POUQUEVILLE, *Memoire historique et diplomatique sur le commerce et les establissemente francais au Levant de* 500 *su* 17 *e siecle,* Institut, Paris, X, 1833.

PRITSCH, "Die islamische staatsides,' *Z. f. verg.,* Rechtwiss, 1939, LIII, 33ff.

PUETTER, K.Th., *Beitraege zur Voelkerrechts Geschichte und Wissenschaft,* Leipzig, 1843.

QUATREMERE, *Les Asiles chez Arabe* (*mem. de l' Inst. royal de France, Acad. d. Inscrip. et belles lettres.* t. 15, pt. 2, Paris, 1845, pp.307ff.)

RABBATH, EDMOND, 'Pour une theorie du droit international musulman", *Revue Egyptienne de droit international,* 1950.

RABBATH, P.A., "Les rapports entre la France et les Arabes avant Haroun el-Rashid ; *Revue Catholique Orientale,* Beyrouth, 1911, Vol. XIV.

RAD, GERHARD VON, *Der heilige Krieg im alten Israel,* 3rd ed., 1959.

RASSMUSSEN, "Essai hist. et geogr. sur le commerce et les relations des Arabes et des Persans avec la Russie et la Scandinavie dans le Moyen age", *Journal Asiatique,* Paris, first series, Vol. V.

RECHID, A., "L' Islam et le droit des gens'. *Recuil des cours de l' Acad. de droit international de la Haye,* 1937/ii, article 4, 30 pages.

——— 'La Condition des etrangers en Turquie', ibid., 1933/iv.

——— 'Les droits minoritaires en Turquie dans le passe et le present", *Revue generale du droit international public,* 1935.

REDSLOB, R., *Histoire des grands principes due droit des gens.* Paris, 1923 (cited by Rechid).

REINAUD, *Invasion des Sarasin en France,* Paris, 1836.

RELAND, H— (died 1718--), *Institutions du droit musulman relatives a la guerre* tr. du latin par soluet, 1838.

REVUE DU MONDE MUSULMAN, Paris, 1925: *Etudes sur la notion islamique de souverainte* (by Barthold, etc.) ; also 'bibiographie',

RITTER, H., Die Abschaffung des Kalifats," *Archiv fur Politik and Geschichte,* n.s., Vol. II, 1924, pp.343-68.

ROSENMULLER, *Analecta arab.,* tr. of the ch. *Kitab as-Siyar* of Quduriy.

SABA, *L'Islam et la Nationalite,* Paris, 1933.

SACHAU, E., 'Der Kalife Abu Bakr, *Sitzungsberichte der Akademic der Wissenschaften,* 1903, pp. 16-37. Berlin.

—— "Ueber den zweiten Chalifen Omar", ibid., 1902, pp 292-323.

—— *Muhammedanisches Recht nach Schafiitisc-cher Lehre,* Stuttgart-Berlin, 1897.

SALEM, J., "De la competence des tribunaux ottomans a l'egarrd des etangers ;" *Journal de Droit ·international,* 1893.

SANHOURI, A., *Le califat, son evolution vers une Societe des Nations Orientales,* Paris, 1926.

SANTILLANA,D., 'Il Concetto di califfato e di sovrainte nel diritto musulmano, *Oriente Moderno.* Roma, 1924, pp. 339-50.

—— *Istituzioni di diritto musulmano malichita,* Roma, 1926.

—— Article in English on "Muslim Jurisprudence," *Legacy of Islam,* Oxford.

SCHAUBE, A., *Handelsgeschichte d. komanischen Volker d. Mittlemeeregebietes bis zum Ende der Kreuzzuge*, Munchen, 1906.

SCHMIDT. F.F., "Die Occupatio im islamischen Recht," *Der Islam,* Vol. 1, 1910, 53 Pages.

SCHULTNESS,F., *Die Machtmittel des Islams,* Zurich, 1920.

SCHWALLY, F., 'Der heilige krieg des Islam in religeons-geschicht licher and staatsrechtlicher Bedeulung, *International Monatschrift,* 1916, Sp. 678-714.

SNOUCK-HURGRONJE, 'Le Droit musulman' *Revue d' Histoire des Religions,* Vol. XXXVII. Also reproduced in his *Verspreide Geschriften,* Vol. II article 17, pp. 283-326.

—— 'Le Khalifat du Sultan de Constantinople ; *Questions 'Dipl. et Coloniales,* Paris, 15 July 1901; also in: *Versp. Geschr.,* III, 207-16.

——— 'The Caliphate, *Foreign Affairs,* III/1, 15 Sept. 1924; also in ; *Versp. Geschr.,* VI, 435-52.

SOLVET, CH., *Institutions du droit mahometan sur la guerre avec les Infideles,* trad. de l'arabe (de Quduriy), Paris, 1829.

STADTMUELLER, *Geschichte des Voelkerrechts,* Vol. 1., Hannover, 1951.

STRUPPE, C.H., *Urkunden zur Geschichte des Volkerrechts,* Gotha, 1912, 2 vols. (cited in *Handbuch dur islamliteratur* by Pfanmuller).

STUWE, *Die Handelszuge der Araber unter den Abbasiden durch Afrika, Asien und Osteuropa,* Berlin, 1836.

SUBHAN, 'Jehad and Islam', *The Islamic Literature,* Lahore, December, 1951, pp. 5f.

TAFEL U. THOMAS. *Urkunden zur alteren Handels u. Staatsgeschichte d. Republik Venedig,* 3 vols., Wein, 1856-7.

TAUBE, BARON MICHEL DE, *Etudes sur le developpement historique de droit international dans l' Europe Orientale ;* ch. 2 : Le monde de l' Islam et son influence sur I' Europe orientale, in *Recueil des Cours du droit international,* Vol. XI, 1926 (i), The Hague.

TOYNBEE, *Survey of International Affairs,* volume for 1925, Part I, Islamic Countries. (Also the whole series from 1920 onwards.)

——— *Turkey,* London, 1926 (Particularly for Caliphate).

TSCHUDI, R., *Das chalifat, philosophie und Geschichte series,* Nr. X, Tubingen, 1926.

TYAN, E., *Histoire de l' Organisation judiciaire en pays d' Islam,* 2 Vols., Paris, 1938, etc.

WALKER, *History of the Law of Nations,* Vol. 1, Cambridge, see Sec. 45-66.

WELLHAUSEN, J., *Ein Gemeinwesen ohne Obrigkeit,* Gottingen, 1900.

—— 'Gemeindeordnung von Medina,' *Skizzen und Vorarbeiten,* Vol. IV.

——— *Das arabische Reich und sein Sturtz,* Berlin, 1902.

WENSINCK, A.J., *Muhammeden de Joden te Medina,* Leiden, 1908.

WITTEK, P., 'Islam u. Kalifat,' *Archiv* f. *Sozialw.u. Sozialpolitik,* 1925, Vol. LIII, pp. 370-426.

WRIGHT, Quicy, 'Asian Experience and International Law,' *International Studies,* quarterly journal of the Indian School of International Studies 1959, I. 71-87.

—— "The Influence of the New Nations of Asia and Africa upon International Law," *Foreign Affairs Reports* (Indian Council of World Affairs), 1958, VII, 33-9.

YUSUFUDDIN, M., *Treatment Meted out by the Islamic State to its Non-Muslim Populace,* Hyderabad--Deccan, 1948.

ZAFRULLAH KHAN, "Islam and International Relations", *The Islamic Review,* woking, XLIV/7, July 1956, pp. 7-11.

৩। অমুসলিম দেশসমূহের আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস

(ক) অ্যাসিরিয় এবং ব্যাবিলনীয়

GOODSPEED, *History of Babylonians und Assyrians,* 1905, P. 197.
MASPERO, *Struggle of the Nations,* pp. 639 *et seq.*
OLMSTEAD, *History of Assyria* 1923 Ch. viii.
—— *A political Science Review.* 1918, pp. 63-77.
—— 23 *A Hist. Review,* 1917-8, pp. 755-62.
—— *Records of the Past* (new series), pp. 134-77.

(খ) মিডিয়ান এবং পারসিক

CHRISTENSEN, A., *L' Iran sous les Sassanides,* Copenhagen, 1936. (Also Urdu trs.)
HERODOTUS, iii, 16 ; VII, 238 ; i, 155 ; vi, 42.
LAURENT, *Etudes sur l'humanite* , 1865-80, p.477.
TAGHI NASR, *Essai Sur l'histoire du droit persan a l'epoque des Sassanides,* Paris, 1932.

(গ) ফিনিজীয় এবং কার্থেজীয়

BIBLE, CH. Judges, i., 7. Samuel, ix, 2 ; 2 Kings, viii, 12.
GROTE, *History of Greece.* Part 2, Ch. 18.
LAURENT, *Etudes sur l' humanite,* I, 500, 541.
MONTESQUIEU, *Esprit des lois,* book xxi, Ch. 2.
POLYBIUS, I. 72 (trans. by Schukburg, 1889).

(ঘ) মিসরীয়

BIBLE, CH. *Exod.* 1/ii, 14.
—— *Records of the past* (First Series), 27-32.
BREASTED, *History of Egypt,* 1905, pp. 437-8.
—— *Ancient Records of Egypt,* 1906-7, sec. 370-91 ; 588.
BRUGSCH, *Egypt under the pharaohs,* 1881, pp. 71-6, 402.

BUDGE, *History of Egypt,* 1902, pp. 48 et seq.
CYBICHOWSKI, *Das antike Volkerrecht,* 1907, pp. 10 *et seq.*
MASPERO, *Struggle of the Nations.* pp. 401 *et seq* ; 228.
—— *Life in Ancient Egypt and Assyria,* 1892, p. 189.
PETRIE, *History of Egypt,* pp. 64 *et seq.*

(ঙ) গ্রীক এবং রোমান

OPPENHEIM, *International Law,* 4th ed., Vol. 1.
PHILLIPSON, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome,* 2 vols. see also its excellent bibliography.

(চ) ইহুদীয়

BIBLE, CH. EXOD. xxxiv, 10-6 ; Deut. vii, 1-3, 22-26, xx. 10-20 ; 2 Samuel, viii, 2 : xii, 31.
LETOURNEAU, *La guerre dans les diverse races humaines,* 1895, Ch. 13.
—— *Legacy of Israel,* Oxford University Press.
SCHWALLY, *Israelitische und Judische Kriegsaltertumer,* 1919.
VOLZ, *Biblische Altertumer.*

(ছ) চীন দেশীয়

MARTIN, *The Lore of Cathay,* 1901, Ch. 22-23.
MULLER. H., 'Uber die Natur des Volkerrechts und seine Quellen in China; *Zeitschrift fur Volkerrecht und Bundessataatsrecht,* Breslau, III, 1909. pp. 188-205.

SIU-TCHOUAN-PAO, *Le droit des gens de la Chine antique,* Paris, 1926.

STEFAN LIPOWZOW, Li-fan-Yuan's treatise on Tibetan law, translated into Russian through Manchurian: *Ulozhenie Kitaiskoj palaty Wenjechnich snoschneij perewels Mantschschurskago,* St. Petersburg, 1828, 2 vols.

'Volkerrecht, *Journal of the Royal Asiatic Society,* London, 1891, pp. 7-13 : 'Chinese International Law'.
Zeitschrift fur. Breslau ; 1908, pp. 192-205.

(জ) প্রাচীন ভারতীয়

BANDHYOPADHYAYA, *International Law in Ancient India.*
BURNELL & HOPKINS, *The Ordinances of Manu,* 1891.
KAUTILYA, *Arthasastra,* English translation.
NAG, K., *Les theories diplomatiques de l' Inde ancienne et l' Arthcastra,* Paris, 1923.
NARENDAR NATH LAW, *Inter-State Relations in Ancient India,* Part. 1, Calcutta Oriental Series, 1920.
RAWLINSON, H.G., *Intercourse between India and Western World,* Cambridge, 1926.
SINGH, S.D., *Ancient Indian Warfare with Special Reference to the Vedic Period,* 1965.
VISWANATHA, *International Law in Ancient India,* 1925.

(ঝ) পূর্ব ভারতীয়

ARRIAN, Ind.c.II.
DIODOR, II, 36-40.
STRABO, XV, 484, ed. Cassaub.

(ঞ) বিশ্বজনীন

HOLTZENDORFF, *Handbuch des Volkerrechts,* 1889 *et-seq.,* 4 vols.
OPPENHEIM, *International Law,* Vol. 1, see also its bibliography.
WALKER, *A History of the Law of Nations,* Cambridge, 1889. (Vol. I only has appeared.)

সুফিয়ান (আবু) ; ২৭২,হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ; ১৩৩,

IFP—81-82—P1393—2250—1.1.1982

ভ্রম সংশোধন

নানা কারণে পুস্তকটির মুদ্রণে যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে যায়। নিম্নে প্রমাদগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হলো। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—প্রকাশক

৮ম পৃষ্ঠায় ১ম লাইনে ১৯ নম্বর হবে।
১৪ „ ১ম „ ২৫ „ „
৪৪ „ সপ্তম পরিচ্ছেদে 'সাধারণ আইনে আন্তর্জাতিক আইনের স্থান' হেডিং পড়তে হবে।
৪৬ „ ১৭ লাইনে ৮০ নম্বর „
৫৪ „ ১ম „ ৯১ নম্বর হবে এবং নবম পরিচ্ছেদে 'মণ্ডেসকুই-এর মন্তব্য কিছুটা অশালীন বটে'-এর উপরে 'প্রাক ইসলামী যুগের আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস' হেডিং পড়তে হবে।
৬১ পৃষ্ঠায় ২১ লাইনে ইলাক স্থলে ইলাফ পড়তে হবে।

৮১	„	১ম	লাইনে	১৩০	নম্বর	হবে।
৮৬	„	২৭	„	১৩৯	„	„
১২৮	„	৭	„	২১২	„	„
১৩৩	„	৩	„	২২২	„	„
১৩৪	„	২৩	„	২২৮	„	„
১৯৫	„	২৩	„	৩২৬	„	„

১৯৬	„	৩২৬	এর	স্থলে	৩২৭	„	„
১৯৯	„	৩২৭	„	„	৩২৮	„	„
„	„	৩২৮	„	„	৩২৯	„	„
২০০	„	৩২৯	„	„	৩৩০	„	„

২০০	পৃষ্ঠায়	৩৩০	নম্বর	এর	স্থলে	৩৩১	নম্বর	হবে।
,,	,,	৩৩১	,,	,,	,,	৩৩২	,,	,,
২০১	,,	৩৩২	,,	,,	,,	৩৩৩	,,	,,
,,	,,	৩৩৩	,,	,,	,,	৩৩৪	,,	,,
,,	,,	৩৩৪	,,	,,	,,	৩৩৫	,,	,,
২০২	,,	৩৩৫	,,	,,	,,	৩৩৬	,,	,,
,,	,,	৩৩৬	,,	,,	,,	৩৩৭	,,	,,
২০৫	,,	৩৩৭	,,	,,	,,	৩৩৮	,,	,,
২০৬	,,	৩৩৮	,,	,,	,,	৩৩৯	,,	,,
,,	,,	৩৩৯	,,	,,	,,	৩৪০	,,	,,
,,	,,	৩৪০	,,	,,	,,	৩৪১	,,	,,
২০৭	,,	৩৪১	,,	,,	,,	৩৪২	,,	,,
,,	,,	৩৪২	,,	,,	,,	৩৪৩	,,	,,
,,	,,	৩৪৩	,,	,,	,,	৩৪৪	,,	,,
,,	,,	৩৪৪	,,	,,	,,	৩৪৫	,,	,,
২০৮	,,	৩৪৫	,,	,,	,,	৩৪৬	,,	,,
,,	,,	৩৪৬	,,	,,	,,	৩৪৭	,,	,,
,,	,,	৩৪৭	,,	,,	,,	৩৪৮	,,	,,
২০৯	,,	৩৪৮	,,	,,	,,	৩৪৯	,,	,,
,,	,,	৩৪৯	,,	,,	,,	৩৫০	,,	,,
,,	,,	৩৫০	,,	,,	,,	৩৫১	,,	,,
,,	,,	৩৫১	,,	,,	,,	৩৫২	,,	,,
,,	,,	৩৫২	,,	,,	,,	৩৫৩	,,	,,
,,	,,	৩৫৩	,,	,,	,,	৩৫৪	,,	,,
২১০	,,	৩৫৪	,,	,,	,,	৩৫৫	,,	,,
,,	,,	৩৫৫	,,	,,	,,	৩৫৬	,,	,,
২১১	,,	৩৫৬	,,	,,	,,	৩৫৭	,,	,,
,,	,,	৩৫৭	,,	,,	,,	৩৫৮	,,	,,
,,	,,	৩৫৮	,,	,,	,,	৩৫৯	,,	,,
,,	,,	৩৫৯	,,	,,	,,	৩৬০	,,	,,
২১৩	,,	৩৬০	,,	,,	,,	৩৬১	,,	,,

২১৩	পৃষ্ঠায়	৩৬১	নম্বর	এর	স্থলে	৩৬২	নম্বর	হবে।
”	”	৩৬২	”	”	,	৩৬৩	”	”
”	”	৩৬৩	”	”	”	৩৬৪	”	”
”	”	৩৬৪	”	”	”	৩৬৫	”	”
২১৪	”	৩৬৫	”	”	”	৩৬৬	”	”
”	”	৩৬৬	”	”	”	৩৬৭	”	”
২১৫	”	৩৬৭	”	”	”	৩৬৮	”	”
”	”	৩৬৮	”	”	”	৩৬৯	”	”
”	”	৩৬৯	”	”	”	৩৭০	”	”
২১৯	”	৩৭০	”	”	”	৩৭১	”	”
”	”	৩৭১	”	”	”	৩৭২	”	”
২২০	”	৩৭২	”	”	”	৩৭৩	”	”
”	”	৩৭৩	”	”	”	৩৭৪	”	”
”	”	৩৭৪	”	”	”	৩৭৫	”	”
২২১	”	৩৭৫	”	”	”	৩৭৬	”	”
”	”	৩৭৬	”	”	”	৩৭৭	”	”
২২৩	”	৩৭৭	”	”	”	৩৭৮	”	”
”	”	৩৭৮	”	”	”	৩৭৯	”	”
৩১৪	”	৫৩৪	”	”	”	৫৩৫	”	”

নির্ঘন্ট ৪২৫ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা ভুলক্রমে ৪১৭ থেকে ৪৩২ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। এছাড়া দুইজনেব অনুবাদ হিসাবে ১৮১ পৃষ্ঠার পূর্বাংশে পরিচ্ছেদ এবং পরবর্তী অংশে অধ্যায় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রচ্ছদ পরিচিতি—নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কর্ডোভা
মসজিদের বাইরের একটি দরজা, স্পেন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২